একক্তান গবেষণা পত্র

আবেদকর স্মারক সংস্থা

শান্তিনিকেতন ■ ১৯৯২

CENTRAL LIBRARY

আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়নের জন্য পশ্চিমবাংলার আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে গড়ে তোলা হয়েছে বৃহদাকার বহুমুখী সমবায় সমিতি (**ল্যাম্পস্**)। পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত ১১৩টি ল্যাম্পস-এর বহুমুখী কর্মধারার মাধ্যমে আদিবাসী ভাই বোনদের কাছে স্বনির্ভরতার আলোকবার্ত্তা পৌঁছে দিতে আমরা সচেষ্ট।

- ★ সুলভে ভোগ্যপণ্য সরবরাহ
- ★ দুসময়ে পরিপূরক ঋণ
- ★ ১০০ শতাংশ অনুদানে ধূমহীন চুলা বিতরণ
- ★ উৎপাদন তথা আয়প্রকল্প রূপায়ণ
- ★ পরিচালন সহায়তা
- ★ ক্ষুদ্র বনজসম্পদ সংগ্রহ ও বিপণন
- ★ স্বল্প সুদে বিভিন্ন প্রকার ঋণ দান
- ★ বিভিন্ন শ্রম ভিত্তিক প্রকল্প
- ★ গোবর গ্যাস প্রকল্প
- ★ ছোট ও মাঝারি দোকান প্রতিষ্ঠা
- ★ রিক্সা ভ্যান ও অন্যান্যপরিবার ভিত্তিক কর্মসূচীরূপায়ণ
- ★ আদিবাসী শ্রমিকদের সহায়তায় বন বিভাগীয় কাষ্ঠ আহরণ
- ★ ল্যাম্পস্ ও ব্যাংকের মাধ্যমে কৃষি ঋণের ব্যবস্থা।

ল্যাম্প সমিতিগুলির উপর অর্পিত এই উত্তরণের গুরুদায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য এবং সমিতিগুলিকে আর্থিক, ব্যবসায়িক ও প্রশাসনিক সাহায্য ও পরামর্শদানের জন্য শীর্ষ প্রতিষ্ঠান হিসাবে একনিষ্ঠ কর্ত্তব্যে ব্রতী :

পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী উন্নয়ন সমবায় নিগম
১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, (৪র্থ ও ৫ম তল), কলিকাতা-৭০০০৬৯
দূরভাষ—২৮-৪৬২০, ২৮-১২৬৬
আঞ্চলিক কার্যালয় :—ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, জলপাইগুড়ি
শাখা কার্যালয় :—মালদহ, শিউড়ী

CENTRAL LIBRARY

AIKATAN * CALCUTTA * 1986

॥ শতফুল বিকশিত হোক ॥

মুক্ত চিন্তা, সুস্থ সংস্কৃতি ও জীবনের জন্য শিল্প সৃজনে দায়বদ্ধ সমবেত মানুষের ঐকতান।

- ঐকতান প্রবীণের প্রজ্ঞা আর নবীনের শ্রমে সতত প্রয়াসী। প্রয়াসী নবতম সৃজনশীল চিন্তার বিকাশে।
- 'ঐকতান গবেষণা সংসদ' মূলত একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গবেষণা কেন্দ্র। মানুষের কল্যাণে নিবেদিত-এর সমস্ত সমীক্ষা ও সৃজন মূলক কাজকর্ম।
- 'ঐকতান গবেষণা পত্র' তরুণ লেখক ও গবেষকদের নিজস্ব মুখপত্র।
- ঐকতানের বই মূলত সাধারণ মানুষের জন্য অথচ গবেষণা ধর্মী, মননশীল এবং মহত্তম এক আদর্শে নিবেদিত।

॥ ঐকতান সতত আপনার সহযোগিতা কামনা করে ॥

ঐকতান গবেষণা পত্র

মুকুলেশ বিশ্বাস / গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী
৪ / ৪ ফাল্গুনী আবাসন। সল্টলেক
কলিকাতা-৭০০ ০৯১।

ঐকতান গবেষণা সংসদ

নীতীশ বিশ্বাস / প্রমোদ বিশ্বাস
জি-২, ক্লস্টার-৩, পূর্বাচল, সল্টলেক
কলিকাতা-৯১, ফোন-২১-৭২৮০

শহর দপ্তর □ ঐকতান, প্রযত্নে ঃ নীলিমা বিশ্বাস (ফোন—৪৪-৮৪০২) ৭৭ /২ লেনিন সরণী (তেতলা)। কলিকাতা—১৩। এই ঠিকানায় **পথ সংকেত দপ্তরে** যোগাযোগ করতে পারেন।
(প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬ থেকে ৮টার মধ্যে)

সাহিত্যিক সোমেন চন্দের

জন্মের সাত দশক পরে এবং শহীদানের পাঁচ দশক পরে প্রকাশিত হল তার বিপ্লবী জীবন ও মহান সৃষ্টির এক সমৃদ্ধ মূল্যায়ন। যাঁরা লিখেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন অন্নদাশংকর রায়, সতীশ পাকড়াশী ভবতোষ দত্ত, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, জ্ঞান চক্রবর্তী নারায়ণ চৌধুরী, নেপাল মজুমদার, ক্ষুদিরাম দাস, রনেশ দাশগুপ্ত, সর্দার ফজলুল করিম, কিরণশংকর সেনগুপ্ত থেকে তরুণতম সমালোচক পর্যন্ত। সঙ্গে সংকলিত হয়েছে সোমেনচন্দকে নিবেদিত পাঁচ দশকের বিভিন্ন কবির কবিতা।

আগুনের অক্ষর

নামে সুসম্পাদিত এ সংকলনের

সম্পাদক ঃ কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, পবিত্র সরকার

বহু বিরল আলোকচিত্রসহ এ সমৃদ্ধ গ্রন্থের

মূল্য মাত্র ষাট টাকা।

পাবেন ঃ—ন্যাশনাল বুক এজেন্সী ও মনীষা গ্রন্থালয়ে।

নব-সাক্ষরদের উপযোগী

আমাদের প্রকাশনার দু'খানি মূল্যবান গ্রন্থ ঃ

সুদর্শন রায়চৌধুরীর ঃ **আমাদের সংবিধান**—৬·০০

মইনুল হাসানের ঃ **সাম্প্রদায়িকতা ঃ এ বিপদ রুখতে হবে**—৫·০০

এডুকেশন ফোরাম

এ ৬৫, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-৭

ক্ষুদ্র পত্রিকা আন্দোলনের অন্যতম শরিক

সাহিত্য কল্প

পত্রিকার বিশ বছরে **'ঐকতানের'** অভিনন্দন।

সম্পাদক—অসিত বরণ হালদার।

সাইপালা। ডাক ঃ বসিরহাট। উত্তর ২৪পরগনা।

একটি ঐকতান সৌজন্য বিজ্ঞাপন

বাঙালী জাতিসত্তার সম্যক বিকাশে, জাতীয়
চেতনার উদ্বোধনে; ঋদ্ধ বর্তমান এবং
সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ নির্মাণে 'শব্দরূপ'—এর
'ঐতিহ্যের অঙ্গীকার প্রকল্প' থেকে জাতির
চিৎপ্রকর্ষময় জীবনবাদী ধ্যানকে ধ্বনিরূপ
প্রদান করা হয়েছে

'ঐতিহ্যের অঙ্গীকার—১'

(চর্যাপদ থেকে মেঘনাদবধ কাব্য পর্যন্ত হাজার বছরের কবিতার ক্যাসেট।)

'ঐতিহ্যের অঙ্গীকার—২'

(চারশত বছরের পুরোনো বাঙলা গদ্যের ক্যাসেট।)

'ঐতিহ্যের অঙ্গীকার—৩'

(লেবেদেফ থেকে দীনবন্ধু মিত্র পর্যন্ত ৫টি নাটকের অংশ বিশেষ।)

'ঐতিহ্যের অঙ্গীকার—৪'

(নীলদর্পণ ও কৃষ্ণকুমারী নাটকের অংশ বিশেষ) এর মাধ্যমে।

'শব্দরূপ'—এর বিশেষ প্রযোজনা

বাঙলা উচ্চারণ সূত্র'—এর ক্যাসেট।

প্রয়োগ প্রধান ঃ অধ্যাপক নরেন বিশ্বাস

প্রাপ্তিস্থান ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থসংস্থা ও
প্রতিবছর একুশে মেলায় শব্দরূপ-এর স্টলে।

॥ ভারতে যোগাযোগ ঃ কলকাতা শহরে 'ঐকতান দপ্তরে ॥

প্রকাশিত হয়েছে বিরল নাট্য সংকলন

সায়ক নাট্যপত্র-১

যাঁদের লেখা ও যাঁদের সম্পর্কে লেখা প্রকাশিত হয়েছে—

হেমাঙ্গ বিশ্বাস □ অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় □ উৎপল দত্ত
□ তাপস সেন অরুণ মুখোপাধ্যায় □ মনোজ মিত্র
□ ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদক : মেঘনাদ ভট্টাচার্য

সহযোগী সম্পাদক : প্রদীপ মৌলিক, পিনাকী গোস্বামী

মূল্য : পনের টাকা।

প্রাপ্তিস্থান : সায়কের পক্ষে দীপঙ্কর সেনগুপ্ত
বিজন থিয়েটার : ৫এ রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

* মুক্ত চিন্তার প্রকাশ
* সুস্থ সংস্কৃতির প্রসার
* জীবনের জন্য শিল্প সৃষ্টির প্রয়াসে নিবেদিত
গবেষক, লেখক, শিল্পী ও সংগঠক যাঁরা
তাঁদের সবার জন্য—

ইষ্টার্ন ক্যাটারার
১, খেলাৎ বাবু লেন, কলিকাতা-৩৭

অ-৪ □ ঐকতান : আম্বেদকর স্মারক সংখ্যা

গ্রুপ থিয়েটার

সগৌরবে পঞ্চদশ বর্ষে পদার্পণ করল।

সম্পাদক ◻ রমণ মহেশ্বরী

যোগাযোগ :

৬৬ আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলকাতা-৯

দূরভাষ ◻ ৫০-৭২২৮

সি, এফ ২০৪ ● সল্টলেক ● কলকাতা-৬৪

দূরভাষ ◻ ৩৭-৪০৫১

ঐকতানের বই-এর জন্যও **গ্রুপ থিয়েটার** দপ্তরে সলিল সরকারের কাছে খোঁজ নিন

ঐকতান গবেষণা পত্রের মহান উদ্দেশ্য সার্থক হোক।

যারা অবহেলিত তাদের মাথা উচু হোক।

অভিনন্দন সহ

ডাঃ সাজাহান হাফিজ—উপ-প্রধান **সদানন্দ বৈদ্য—প্রধান**

ধর্মপুর ২নং গ্রাম পঞ্চায়েত, উত্তর ২৪ পরগণা

ঐকতান : আম্বেদকর স্মারক সংখ্যা ◻ অ-৫

* পশ্চিমবঙ্গ সার্টিফায়েড আলুবীজ উৎপাদনে পথিকৃৎ।
* উন্নত মানের ধান, আলু, সব্জিবীজ প্রভৃতি বীজের উৎপাদক ও পরিবেশক।

যোগাযোগ করুন :

সভাপতি — ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

বৈঁচি সি এ ডি পি ফারমারস সার্ভিস
কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ
পোঃ বৈঁচি জেলাঃ হুগলী

কৃষি ও কৃষকের সমৃদ্ধি আমাদের লক্ষ্য

★ উন্নত বীজ
★ উপযুক্ত সার ও
★ হীমঘরে সংরক্ষণের জন্য

যোগাযোগ করুন ঃ

কৃষির সার্বিক উন্নয়নে নিবেদিত

বহরমপুর ফার্মার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড

বহরমপুর □ মুর্শিদাবাদ

আমাদের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ :

[illegible]

কাজী নজরুল ইসলামের পূর্ণাঙ্গ জীবনী গ্রন্থ।

মজহারুল ইসলামের : আমার কেন ফাঁসি—৩০·০০

৫ থেকে ১২ বছরের ছেলে-মেয়েদের উপযোগী বিভিন্ন
দেশের বিচিত্র স্বাদের ১০০টি গল্পের সংকলন

ড. দিলীপ মজুমদারের : সাত সমুদ্র তেরো নদী—৩০·০০

লেনিনবাদীর দৃষ্টিভঙ্গিতে গান্ধীবাদের রূপ ও স্বরূপ বিচার

সৈয়দ শাহেদুল্লাহের : লেনিনবাদীর চোখে গান্ধীবাদ—৩৫·০০

সংগ্রামী মানুষের সংগ্রামের পটভূমিকায় সাড়া জাগানো উপন্যাস

তপোবিজয় ঘোষের : সামনে লড়াই—৫০·০০

ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের পথিকৃত কমরেড মুজফ্‌ফর
আহমদের দুষ্প্রাপ্য ছবিসহ পূর্ণাঙ্গ জীবনী গ্রন্থ,

মজহারুল ইসলামের : মানুষ গড়ার কারিগর—৫০·০০

কমরেড সরোজ মুখোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক জীবনের চড়াই-
উৎরাই বাস্তবতা নিয়ে একটি তথ্যপূর্ণ দলিল

মজহারুল ইসলামের : কমরেড সরোজ মুখোপাধ্যায়—২৫·০০

ড. দিলীপ মজুমদারের : বাংলা সাহিত্যে প্রগতি চিন্তা—৪৫·০০

ভিয়েতনাম গেরিলা যুদ্ধের নায়ক জেনারেল গিয়াপের
'People's war people's army' গ্রন্থের অনুবাদ

জেনারেল গিয়াপের : জনযুদ্ধ ও গণফৌজ—২৫·০০

রুশ বিপ্লবের অন্যতম নায়ক, লেনিনের উত্তরাধিকারী
জে. ভি. স্তালিনের সমগ্র রচনাবলী

স্তালিন রচনাবলী : জীবনীসহ ১৫ খণ্ডে সম্পূর্ণ—৫১৫·০০

নবজাতক প্রকাশন

এ ৬৪, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-৭

ঐকতান : আম্বেদকর স্মারক সংখ্যা □ অ-৭

NEW ADDITION TO OUR LIST OF PUBLICATIONS

দেবেন্দ্রনাথ সেন : জীবনী ও কাব্যবিচার—অধীশচন্দ্র সাহা ৩০ টাকা ; **সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : কবি ও কাব্য**—কেকা ঘটক ৭০ টাকা ; **আঞ্চলিক দেবতা : লোক সংস্কৃতি**—মিহির চৌধুরী কামিল্যা ৮০ টাকা ; **অস্তিত্ববাদ ও মানবতাবাদ**—মৃণালকান্তি ভদ্র ৩০ টাকা ; **নীতিবিদ্যা**—মৃণালকান্তি ভদ্র ৪০ টাকা ; **অস্তিত্ববাদ : জঁ্যা-পল সার্ত্রের দর্শন সাহিত্য** (২য় সংস্করণ)—মৃণালকান্তি ভদ্র ৫০ টাকা ; **উপনিষদ্ প্রসঙ্গ (কৌষিতকী পর্ব)**—শ্রীমৎ অনির্বাণ ৪০ টাকা।

The University of Burdwan (Publications Unit)
Rajbati, Burdwan-713 104 (W. B.)

'চর্মজ'

চর্মজ সুরুচি ও ব্যক্তিত্বসম্পন্নদের জন্য—আকর্ষণীয় রং ও ডিজাইনে চর্মজ-র জুতা, চপ্পল, স্লিং বা ক্লাচ ব্যাগ, পার্স ওয়ালেট আপনাকে দেয় সুবেশ হওয়ার সুযোগ। মজবুত ট্রাভেল ব্যাগ, কেতাদুরস্ত বেল্ট, জ্যাকেট, ফুটবল সমস্তই সুন্দর, দীর্ঘস্থায়ী ও সুলভ।

টেকসই ও ন্যায্য দাম
'চর্মজ'র তাই সুনাম।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য চর্মশিল্প উন্নয়ন নিগম

(পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী সংস্থা)

'শিল্প ভবন'

২ এবং ৩, ব্ল্যাক বার্ণ লেন (৫ম তল) কলিকাতা-১২

‘রেখাচিত্রম’

“ভাবি কত দেব দুর্লভ গুণ
আমাদের দেশের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে,
অথচ তার খবর রাখি না”

—হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

“শিল্পী রেখা চক্রবর্তী,
কারুশিল্পকে শিল্প মাধ্যম করে
বিস্ময়কর প্রতিভা ও শিল্প চেতনার স্বাক্ষর রেখেছেন।
তিনি দুর্লভ প্রতিভার শিল্পীদের একজন।”

—নেপাল মজুমদার

কবি কারো দাস নয়

কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার বই। পড়ুন, অসঙ্গতির বিচিত্র, জটিল ধারা।

প্রকাশক ঃ দীপায়ণ ঃ ২০ কেশব সেন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৯

বোধ নয়।। আসলে, নিন্দুকের অক্ষম জটলা

ভাল—
ভদ্রস্থ ভাবে ফিসফাস করুন পিছনে
অহংকারে ঘা-লাগছে বুঝি ?

বাবুরা—ও কিছু নয়
চাষীরা তুলছে মাথা
গলায় ঠেকছে বুঝি—ভয় পাচ্ছেন ?

না, ও কিছু নয়
ওটা—একজন শ্রমিকের বাড়ি
ঢুকে গেছে সল্টলেকে কখন
অবাক হচ্ছেন খুব—জ্বলছে—
কলমটা কাঁপছে বুঝি—ঘেমে যাচ্ছেন ?

ঘেমে গেলে কি করে চলে বলুন—ছিঃ

জাতীয় সংহতি [illegible]
এজন্যে চাই 'জাতীয় ভাষা-নীতি।'

'ঐকতান গবেষণা পত্র'
কৃষকের মুখপত্র হিসেবেও কাজ করুক এটাই আমাদের আশা।

সাহারজোড় সি. এ. ডি. পি ফার্মার্স সার্ভিস
কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড
বেগুন কোদর। পুরুলিয়া

SPACE DONATED BY :

DEBASHIS CHOWDHURY
Architect
1, British Indian Street (7 th Floor)
Room – 711, Calcutta—700069

ঐকতান গবেষণা পত্রিকা ঃ ৬

॥ অনিমেষ নিরানব্বই ॥ শারদ সংখ্যা ॥ তেরশো নিরানব্বই ॥

মুখ্য উপদেষ্টা ঃ
কুদিরাম দাস

সভাপতি ঃ
অনুনয় চট্টোপাধ্যায়

মুখ্য গবেষণা নির্দেশক ঃ
নেপাল মজুমদার

এই সংখ্যার সম্পাদনা উপদেশক ঃ
কান্তি বিশ্বাস

সম্পাদক ঃ
নিতীশ বিশ্বাস

সম্পাদক মণ্ডলী ঃ
মুকুলেশ বিশ্বাস (সংযোজক) কল্যাণ রায়, গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী, দিব্য-জ্যোতি মজুমদার, চিত্ত পান, জ্যোতি দত্ত, জীবন ঘোষ মানস মজুমদার, রবীন ব্যানার্জী, লৎফুল আলম সন্দীপ বিশ্বাস ও সলিল সরকার ।

অফিস সম্পাদক ঃ প্রমোদ বিশ্বাস, প্রদীপ দত্ত, বীথিকা বিশ্বাস ।

সহকারী ঃ বরুণ রানা, অনল বিশ্বাস, নিমাই বিশ্বাস ।

ঐকতান গবেষণা সংসদ ঃ কলকাতা

ঐকতান নিয়ম ও নিবেদন

- ঐকতানের সদস্য-চাঁদা বছরে পঞ্চাশ টাকা ; পৃষ্ঠপোষক, সন্মানীয় সদস্য ও শিক্ষক সদস্য অনুদান বছরে একশ টাকা। এখন গ্রাহক করা হচ্ছে না।
- স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটি, গবেষণা প্রতিষ্ঠানে সংযুক্ত শিক্ষক, গবেষক ও সম্ভাবনাময় ছাত্র-ছাত্রীদের লেখা প্রকাশে আগ্রহী ঐকতান।
- **কলকাতায় পত্রিকা পাবেন :পাতিরাম** (কলেজ স্ট্রীট গান্ধী রোডের ক্রশিং)
- কলেজ স্ট্রীট মার্কেটে **নবজাতক** ও **ইণ্ডিয়ান বুক সিণ্ডিকেটে**।
- **গল্পগুচ্ছ দপ্তরে** সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটে। বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীটে— **কথাও কাহিনী**, নিউ বিশ্বাস **বুক স্টল**, ক্রান্তিক, **জয়গুরু পুস্তকালয়**, **পুস্তক** বিপনি ও **শ্যামলের স্টলে** এবং C. U.-গেটে **বি. পি. স্টলে**।

প্রধান পরিবেশক : ন্যাশনাল বুক এজেন্সী

১২ নং বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট। কলি-৭৩ ☐ ২নং সূর্যসেন স্ট্রীট। কলি-১২ সুপার মার্কেট, হলদিয়া ☐ শিলিগুড়ি ☐ বেনাচিতি, দুর্গাপুর।

বর্তমান সংখ্যার দাম—পনের টাকা। ছাত্রদের বিশেষ কমিশন।
ছাত্র-কমিশন কেবল ঐকতান দপ্তরে ও ঐকতান প্রতিনিধিদের কাছে পাওয়া যাবে।

লেখা ও টাকা পাঠাবার ঠিকানা (১) **ঐকতান গবেষণা সংসদ**—নীতীশ বিশ্বাস প্রযত্নে : প্রমোদ বিশ্বাস। পূর্বাচল, জি-২। ক্লস্টার-৩। সল্টলেক। কলকাতা-৭০০০৯১। ফোন—২১৭২৮০। (২) **সম্পাদকীয় দপ্তর** : গঙ্গা নারায়ণ চক্রবর্তী ও মুকুলেশ বিশ্বাস, ৪/৪, ফাল্গুনীআবাসন, কলি-৭০০৯১। (৩) শহর দপ্তরে—**নীলিমা বিশ্বাস**, ৭৭/২, লেনিন সরণী (তিন তলা), কলকাতা—৭০০০১৩। **পথসংকেত দপ্তরে** (প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ৬—৮ টা।) যেগোযোগ, পি-সি রায়ের সঙ্গে।

ঐকতানের সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্নতা বিরোধী বিশেষ সংখ্যা শীঘ্রই প্রস্তুত হবে। লেখক গবেষকেরা উপরের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

123343

CENTRAL LIBRARY

॥ ঐকতান ● ৬ ● শারদ সংখ্যা ● ১৩৯৯ ॥

সূচীপত্র

জ্যোতিবসু ॥ আম্বেদকর ছিলেন এক আপোষহীন যোদ্ধা ॥ ১
দীনেশ ডাকুয়া ॥ অস্পৃশ্যতা দূরীকরণে একটি পদক্ষেপ ॥ ৫
উপেন কিস্কু ॥ শতাব্দীর আলোকে ড. আম্বেদকর ॥ ১৪
কান্তি বিশ্বাস ॥ ড. আম্বেদকরের প্রাসঙ্গিকতা ॥ ৮
বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ॥ আম্বেদকর চিরকাল আমাদের শ্রদ্ধার আসনে ছিলেন এবং থাকবেন ॥ ১৬
বিমান বসু ॥ ড. আম্বেদকর ও সংরক্ষণ সম্পর্কে কয়েকটি কথা ॥ ৫০
মনোরঞ্জন বড়াল ॥ নেহরু মন্ত্রীসভায় আম্বেদকর ॥ ২৬
সুনীলকুমার লাহিড়ী ॥ বর্ণভেদ, ভারতীয় সংবিধান ও আম্বেদকর ॥ ১৮
নেপাল মজুমদার ॥ আম্বেদকর ও অবনত শ্রেণীগুলির রাজনৈতিক অধিকার ॥৬৮
হার্মাদ বে ॥ ব্রাত্যজনের শ্রেষ্ঠ বন্ধু ড. আম্বেদকর ॥ ৩৩
জোয়াখিম পিউকে ॥ ড. আম্বেদকর ও তাঁর আন্দোলন ॥ ৪১
নৈরাঞ্জনা রায়চৌধুরী ॥ মহাত্মাজ্যোতিরাও ফুলে ড. আম্বেদকর, জাতপাত ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা ॥ ৫৮
প্রতিবেদন ঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আম্বেদকর শতবর্ষ সেমিনার।

বাবা সাহেব ড. বি. আর আম্বেদকরের জীবনী বিষয়ক

॥ ক্রোড়পত্র ॥

□ জীবনের প্রস্তুতি পর্ব বা শিক্ষা জীবন—ই ১ থেকে ১২।
□ জীবনের বিশিষ্ট ঘটনা বা জীবন পঞ্জী □ ক ১—১৬।
□ ড. আম্বেদকরের গ্রন্থ-পরিচিতি □ খ ১—১৩।

রচনা ও সংকলন—নীতীশ বিশ্বাস
জীবন পঞ্জী সহায়তা—বীথিকা বিশ্বাস
গ্রন্থপরিচিতি সহায়তা—নরেন্দ্রনাথ মণ্ডল, শিশির মুখার্জী

প্রচ্ছদ ঃ সমীর দেবশর্মা
প্রচ্ছদ চিত্র ঃ মহারাষ্ট্র সরকারের সৌজন্যে।

'ঐকতান পত্রিকা'

সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন আইনের ৮নং ধারা অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি

১। প্রকাশের স্থান : ৭৭/২ লেনিন সরণী (দ্বিতল)। কলকাতা-১৩

২। প্রকাশের কাল : ত্রৈমাসিক। (ভাষা : বাংলা)।

৩। প্রকাশকের নাম : নীতীশ বিশ্বাস, ভারতীয়

ঠিকানা : ৪/৪, ফাল্গুনী আবাসন। সল্টলেক। কলকাতা-৯১

৪। মুদ্রকের নাম ও ঠিকানা : ঐ

৫। সম্পাদকের নাম ও ঠিকানা : ঐ

৬। স্বত্বাধিকারীর নাম ও ঠিকানা : ঐ। ঐকতানের পক্ষে।

আমি, নীতীশ বিশ্বাস ঘোষণা করছি যে উপরে উল্লিখিত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

রেজি : নং—

৪৪০৮৬/৮৭ (আর. এন. আই.)

(স্বাক্ষর) **নীতীশ বিশ্বাস**

প্রকাশক ও মুদ্রক

ঐকতানের বিজ্ঞাপণের হার

দ্বিতীয় ও চতুর্থ কভার—দু হাজার টাকা

তৃতীয় কভার—পনের শো টাকা ▫ স্পেশাল ফুলপেজ—এক হাজার টাকা

ফুল পেজ—পাঁচশো টাকা ▫ হাফ্ পেজ—তিনশো টাকা

★ পত্রিকার যে কোন চেক বা ড্রাফ্ট কেবল 'AIKATAN' নামে দিতে হবে।

ঐকতানে কেন বিজ্ঞাপন দেবেন—

ঐকতান স্বদেশে বিদেশে তার পরিধি বিস্তার করেছে। যেখানে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণা-চর্চা হয়, সে-সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও সংস্কৃতি কেন্দ্রে **ঐকতান**। বাংলা ভাষায় পঠন-পাঠনকারী বিপুল শিক্ষাঙ্গনে ও গ্রন্থাগারে **ঐকতান**। **ঐকতানের** ভাষামাধ্যম বাংলা কিন্তু বিষয় তার সার্বিক। তাই **ঐকতানে** বিজ্ঞাপন দিলে ; **ঐকতান** আপনার বার্তা এক বিশাল পরিধিতে পৌঁছে দেবে। পৌঁছে দেবে দীর্ঘ দিনের জন্যে কারণ তার প্রতিটি সংখ্যাই অনন্য ও সংগ্রহ যোগ্য। **ঐকতানে বিজ্ঞাপন দিন।**

সম্পাদকীয় প্রতিবেদন

ড. বি. আর আম্বেদকরের একশত দুইতম জন্ম বর্ষ অতিক্রান্ত। আজ ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এক চরম দুর্যোগ পূর্ণ সময়ের মুখোমুখি আমরা। এই সময়ের সবচেয়ে বড় দাবি সংহতি ও সার্বভৌমত্ব। ভারতীয় সমাজের সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা এমন জটিল ও গভীর যে তাকে পাশ্চাত্যের কোন দেশ বা সময়ের সঙ্গে সরাসরি তুলনা করা যায় না। যায় না সে বিষয়ে হাল্কা কোন মন্তব্য করা। তাই আজ সংহতির স্বার্থেই সকলকে যথাযথ ভাবে জানতে হবে বুঝতে হবে আমাদের দেশকে—বৃহত্তর ভারতকে। সে কেবল শহর-নগর নয় জানতে হবে সত্যিকার ভারত তথা গ্রাম ভারতকে। যারা আজও রয়েছে সবার নীচে সবার পিছে—সেই ৭০ ভাগ দলিত, দরিদ্র সবহারা মানুষকে। তারা অধিকাংশই অর্থনৈতিক ভাবে পশ্চাদপদ। আবার এক বড় অংশ সামাজিক ভাবেও পশ্চাদ্‌পদ। এই যে দুটি বৃত্ত, ভারতের শোষণ ব্যবস্থার এহ'ল দুটি চাকা। যা অনন্তকাল ধরে নিপীড়িত মানুষের বুকের উপর দিয়ে চালিত হয়েছে। রক্তাক্ত ক্লেদাক্ত সেই সরণি বেয়েই গিয়েছে—রাজা মহারাজা থেকে আজকের মালিক প্রভুদের রথ, শকট, মোটর গাড়ী।

সমাজের এ পংকিলতা ঘোচাতে সমাজ সংস্কারক যারা এসেছিলেন, তারা সকলেই সেই বেদনার বহ্নিদাহের অভিজ্ঞতা থেকেই যে তা করেছেন, তা নয়। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ—এরা মানবিক মহত্বে তাদের চেতনার আলোজ্বলা পথে চলেছেন, পথ রচনাও করেছেন। কিন্তু আম্বেদকর আসলে ঐ নিষ্পেষিত মানুষের ভিতর থেকে এসে সংগ্রামের পথে মাথা তুলেছেন। রবীন্দ্রনাথের ঐকতান কবিতায় সেই 'কিষানের জীবনের শরিক যে জন কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন'—এযেন তেমনি এক সংগ্রামী মানুষ, যিনি লড়েছেন বহুজনের জন্য অথচ নিজেই নিঃসঙ্গ। নিঃসঙ্গ কিন্তু অবিচল। যেন বেদনার বৃন্ত থেকে ফুটে ওঠা এক রক্ত কমল।

আজ যখন ভারতে জাত ভিত্তিক হীন রাজনীতির ষড়যন্ত্র চারিদিকে। অস্পৃশ্যতা, অবিশ্বাসের জালে জড়িয়ে যাচ্ছে সমাজ, দেশের নাগরিকদের গণতান্ত্রিক অধিকার, সার্বভৌমত্ব তথা স্বাধীনতাই ভ্রান্ত অর্থনীতির বেনো জলে যখন ডুবু ডুবু, তখন আমাদের স্বদেশ প্রেমের গভীর থেকেই তাকে প্রতিরোধ করতে হবে। এবং করতে হবে গভীরতর সত্যের অন্তস্থল থেকে। তারই জন্য আজ মানুষের বৃহত্তর কল্যাণে নিবেদিত যে সব অসমাপ্ত সংগ্রাম, যে সব ভারত পথিকের সাধনা—তাকে জানতে হবে, বুঝতে হবে। ইতিহাসের পাঠ থেকেই গ্রহণ করতে হবে বর্তমানের পথ চলার শিক্ষা আর সংগ্রহ করতে হবে, ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনার উপাদান।

এই সব সত্যের কাছাকাছি হতে গিয়েই আমাদের আম্বেদকর স্মারক সংকলণের আয়োজন। আমরা দেখেছি আম্বেদকর চর্চা যারা করেন তাদের অনেকেই অন্ধ আম্বেদকর ভক্ত—আবার অনেকেই অন্ধ-আম্বেদকর বিরোধী।' এ দুটিই যে সঠিক পথ নয় তা বলা বাহুল্য। আমরা সঠিক কোনো পথের সন্ধান দিয়েছি-এ সংকলনে এ দাবি নিশ্চয়ই করছি না। কেবল বলতে চাই—আমাদের চোখে আম্বেদকর ভারতের এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষা, এক দৃপ্ত সংগ্রামী। যিনি মানুষের প্রতি গভীর ভালোবাসা নিয়ে এবং তার সময়ের সীমা-বদ্ধতার মধ্যেই সাধ্যমত সংগ্রাম করেছেন সারা জীবন ধরে। তাঁর মত, পথ, ধর্মমত ইত্যাদি নিয়ে সকলে একমত নিশ্চয়ই হবেন না, কিন্তু তার বিরল পাণ্ডিত্য, গভীর অধ্যয়ন, তীক্ষ্ন-দৃষ্টি, নিরলস প্রয়াস কে—সব মানুষ নিশ্চয়ই শ্রদ্ধার চোখে দেখবেন।

শতবর্ষ পরে আমরা আমাদের সীমাবদ্ধতার মধ্যেই এই সংকলনে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের বিশিষ্ট নেতৃত্ব এবং বামপন্থী বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের কয়েকটি মূল্যবান লেখা সংকলিত করেছি। সঙ্গে সঙ্গে পাঠকদের জন্য আম্বেদকর পরিচিতি মূলক একটি ক্রোড় পত্রের সংযোজন করাও হয়েছে—যাতে সাধারণ পাঠকদের আম্বেদকরের বিপুল অবদান বিষয়ে সামান্যতমও একটা ধারণার সৃষ্টি হতে পারে। যা জাতীয় সংহতির মহান সেতু রচনার সমবেত উদ্যোগে একটি ক্ষুদ্র নুড়ির কাজ অন্তত করবে।

সংকলন প্রসঙ্গে একটি কথা নিবেদন করি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য কয়েকটি লেখা টেপকরা বক্তব্য থেকে তোলা হয়েছে। সে জন্য ভাষণের স্টাইল অনুসারে কোথাও কোথাও বানান বিন্যাস একটু আলাদা হয়েছে। যেমন 'আপোষহীন' এর লেখ্য রূপ হওয়া উচিত আপসহীন। কিন্তু এখানে অপোষহীনই আছে।

তথ্যাদি সংকলনের ক্ষেত্রে মতান্তর থাকায় দু এক জায়গায় একটু পার্থক্য চোখে পড়তে পারে। তবে মারাত্মক কোন ত্রুটি চোখে পড়লে,—সহৃয় পাঠকদের প্রতি নিবেদন, অনুগ্রহ করে যে কোন ত্রুটি জানালে আমরা বাধিত হবো, সমৃদ্ধ হবো।

—বিনীত সম্পাদক।

জ্যোতি বসু □

আম্বেদকর ছিলেন আপোষহীন এক যোদ্ধা

সভাপতি ও বন্ধুগণ ! * আজকে ড. আম্বেদকরের জন্মদিবসে আমি তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি ; আমার নিজের পক্ষ থেকে এবং বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষ থেকে। আম্বেদকরের জন্ম শতবর্ষে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে যে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছিল—আমরাও সেই সময়ে এবং তার সঙ্গে সংগতি রেখে একটি কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলাম। তার মধ্যে যেগুলো আমরা আয়োজন করেছি—আপনারা তার কথা জানেন—কেউ কেউ নিশ্চয়ই সে-সব প্রোগ্রামে অংশও নিয়েছিলেন। আমরা পশ্চিম বাংলায় তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে, তাঁর কথা, তাঁর বক্তব্য, তাঁর জীবনী মানুষের কাছে পরিবেশন করবার জন্য চেষ্টা করেছি। কতক-গুলো ইতিমধ্যে রূপায়িতও করেছি আপনারা তা দেখেছেন বা জানেন।

আজ আমি শুধু তাঁকে স্মরণ করে কয়েকটা কথা বলতে চাই। উনি যে আন্দোলন, সংগ্রাম করেছিলেন—প্রথমত তা তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতায় অনুভব করেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন অস্পৃশ্যতা কাকে বলে এবং হিন্দু সমাজ মানুষকে কি চোখে দেখে ! তিনি যখন লেখা পড়া শিখেছেন—তাঁকে অনেক বাধা বিপত্তি অতিক্রম করতে হয়েছে—কিন্তু তিনি কখনো পেছ'পা হননি। দেশ বিদেশ থেকে উচ্চসম্মান তিনি লাভ করেছেন। অতিশিক্ষিত মানুষ ছিলেন তিনি। শিক্ষার সু-উচ্চ শিখরে উঠেছিলেন। বিদেশ থেকে ফিরে এসেও তিনি ভুলে যাননি সেই মানুষদেরকে যাঁদের মধ্য থেকে তিনি এসেছিলেন—আর তাঁদের জন্যই তিনি সারা জীবন ধরে লড়াই করেছেন। লড়াই করেছেন তাঁদের অধিকারের জন্য—সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক বিভিন্ন অধিকারের জন্য। অনেক সময় অনেকের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। আসলে এটা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে মানুষ কাউকে অনেক পরে বুঝতে পারে—কখনোবা মৃত্যুর পর সমস্ত দিক থেকে তাঁর ভূমিকা ভালো করে দেখা যায়—বোঝা যায়। আম্বেদকরের প্রসঙ্গেও এমন হয়েছিল। কারণ তিনি যখন তাঁর সমস্ত কাজকে এমনভাবে নিয়োজিত করেছিলেন যাতে অস্পৃশ্যতা দূর হয় এবং সামাজিক ক্ষেত্রে তাদের প্রতিষ্ঠিত করা যায়। তখন কংগ্রেস এ দিকটা নজর দিতো না। তাদের কথা ছিল ওসব স্বাধীনতার পরে হবে, এখন সবাই মিলে আমরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করি। কিন্তু আম্বেদকর বলেছিলেন,—তিনিও দেশপ্রেমিক, তিনিও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, স্বাধীনতার পরেও অনেক কাজ হয়তো থাকবে—কিন্তু স্বাধীনতার আগেও এসব প্রসঙ্গে অনেক কিছু করার আছে। আর তখনতো স্বাধীনতা লাভের কোন নির্দিষ্ট সময় ছিলো না—যে কবে আমরা স্বাধীন হবো। তাই তখন নিপীড়িত মানুষ গুলোর প্রতি নজর দেওয়া দরকার ছিলো। আর এ কেবল মুখের বুলি মাত্র নয়, যে তাদের

ভালো করবো—অমুক করবো—তমুক করবো। আসলে যে অপমান তাদের করা হোত, যে অবমাননা হোত—হিন্দু সমাজের এসব লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে তিনি রুখে দাঁড়িয়েছিলেন, সংগ্রাম করেছিলেন। অনেক সময় তাই পৃথকভাবে তাদের দাবি-দাওয়ার কথা তাঁকে বলতে হয়েছিল। তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাকে সোচ্চার হতে হয়েছিল। দাবি জানাতে হয়েছিল। বিশেষ করে রাজনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রে তথা নির্বাচন ইত্যাদির ব্যাপারে। এ নিয়ে সে সময় ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে যে—এতে করে ব্রিটিশের সুবিধে হবে কিন্তু পরবর্তীকালে এটা দেখা গেছে তাঁর এই যে মত ছিলো—সেটা আমাদের অসংখ্য মানুষকে প্রভাবিত করেছিল। তিনি জোরের সঙ্গে বলতেন 'হ্যাঁ এখন থেকেই ভাবতে হবে এদের অধিকারের কথা। এদের অধিকারের কথা সামাজিক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের যে তখনই ভাবতে হবে—এই কথাটা উনি মানুষের সম্মুখে এনেছিলেন—এজন্য আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

আমরা যে অর্থনীতি, রাজনীতি তথা দর্শনে বিশ্বাসী—আমরা এটা বলি যে শ্রেণীগত লড়াইয়ে সবাইকে একত্রে লড়তে হবে। আমাদের দেশে যারা নিপীড়িত শোষিত মানুষ তাদের মধ্যে নানা ধর্মের মানুষ আছেন—হিন্দুধর্মের যে জাত-পাত আছে, সে সব ও সেখানে আছে। আর দেশ যতো শিল্পোন্নত হবে—সেখানে যারা কাজ করবেন—দু'হাজার—দশহাজার—পনের হাজার—যাই হোকনা কেন সেই সব লোক আসবেন নানা জাত গোত্র থেকে। সেখানে থাকবে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী, তথা-কথিত উঁচুগোত্রের—নীচুগোত্রের সবই থাকবে। তাদের জীবনের অভিজ্ঞতায় এটা বুঝতে হবে—যদি লড়াই করতে হয়—মুক্তির জন্য, শোষণের বিরুদ্ধে লড়তে হয় তাহলে সবাইকে এক হয়ে দাঁড়াতে হবে। কে কোন্ গ্রাম থেকে কোন্ জাত থেকে এসেছে—তা মনে রাখলে চলবে না। আমরা এই ভাবে শ্রেণীসংগ্রামকে সংগঠিত করতে চেষ্টা করেছি—মানুষের চেতনা আমরা বাড়িয়েছি—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এটাও আমরা অভিজ্ঞতায় দেখেছি, শুধু এই লড়াই করলেই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে যে লড়াই—সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে যে লড়াই—তা সম্পন্ন হয় না। হয়তো ট্রেড ইউনিয়নের লড়াইয়ে তারা এক, কিন্তু গ্রামে ফিরে গিয়ে আবার সেই জাত-পাত। এসব ভুল ধারণা কাটিয়ে মানবতার যে ধারা তা আমাদের নিজেদের মনে আনতে হবে—এবং অন্যকেও বোঝাতে হবে। এটা ভালো ভাবে করতে পারলে অনেকক্ষেত্রে সফলও হওয়া যায়।

ভারতে তফসিলী জাতির লোক আছেন, পাঁচ ভাগের এক ভাগ—আছেন তফসিলী উপজাতির লোকও। এদের কথা স্বাধীনতার আগে থেকেই দেশের সামনে তিনি তুলে ধরেন। এবং সে সময় জওহরলাল নেহরুর কেবিনেটেও আম্বেদকর ছিলেন। পরে—স্বাধীনতার পর সরকার এদের দাবি কিছু কিছু মেনে নেন। অবশ্য আগেই গান্ধীজীর সঙ্গে তার নানা বিষয়ে মিল ছিলনা—সে সব আপনারা জানেন—আমি সে বিষয়ে যাবো না। শুধু বলতে পারি তিনি তাঁর নিজের পথে

চলেছেন—যেটা একটা মহৎ পথ। একটা বড় লক্ষ্য। আমরা একাজ অবশ্যই সমর্থন করছি। যত বেশী তাঁকে আমরা বুঝতে চেষ্টা করছি—তত মনে হচ্ছে এ বিষয়ে আমাদের অনেক করণীয় কাজ আছে। এবং তাঁর যে অসম্পূর্ণ কাজ তা আমাদের পূর্ণ করতে হবে।

ভারতের সংবিধান রচনায় বিশিষ্ট ভূমিকা তিনি গ্রহণ করেছেন। সে সময়ে আমি জানি নানা আলোচনায় পর তফসিলী জাতি উপজাতি বিষয় ঢোকানো গিয়েছিল সংবিধানে। তবে এই সুযোগ যে চিরকালের জন্য প্রয়োজন হবে তা কেউ মনে করেননি। তাঁদের যদি মূল সারিতে নিয়ে আসতে হয় তো তাদের প্রতি বিশেষ নজর দিতে হবে—বিশেষ সুবিধা দিতে হবে। তাই সংবিধানে তা স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাদের প্রতি একপেশে মনোভাব থাকার জন্য এবং ভুল দৃষ্টিভঙ্গি থাকার জন্য সেটা হয়নি। তাই দশবছর পর পর সংবিধানের সুযোগ বাড়াতে হয়েছে। আজও সেই ভুল দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব আছে। কিন্তু বার বার আমরা বলছি—যেটা করা লক্ষ্য আমাদের তা করতে হলে সর্বতোভাবে আমাদের এগিয়ে আসতে হবে। যেখানে এরা কাজ করেন—যেখানে এরা বাস করেন—কৃষি বা অন্য যে ক্ষেত্রেই হোক—সেখানে বিশেষ প্রোগ্রাম নিয়ে এগোতে হবে। সার্বিক ভাবে এগিয়ে আসতে হবে। নাহলে কিছু লোকসভা, বিধান সভার আসন—কিছু চাকুরীর সংরক্ষণ—শুধু এটা করে কিছু হবে না! আমাদের প্রধান কাজ এই নিপীড়িত শোষিত মানুষদের—সে যে জাত বা ধর্মেরই হোন—তাদের ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। সংগ্রামে সামিল করতে হবে। পাশাপাশি এঁদের সামাজিক অর্থনৈতিক যে অসুবিধা—এমনকি হিন্দুধর্মে যাঁরা উচ্চপর্যায়ে আছেন তাঁরা যে এঁদের মানুষ মনে করেন না—তার বিরুদ্ধেও দাঁড়াতে হবে।

আবার একথাটাও মনে রাখা দরকার আম্বেদকর তাঁর জীবন সংগ্রামে এই তথাকথিত কিছু বর্ণ হিন্দুদেরও কিছু সাহায্য পেয়েছিলেন। কিন্তু শেষ অবধি উনি যে সংস্কার করতে চেয়েছিলেন—তা হল না। তাই বোধ করি হতাশ হয়ে আর কোন উপায় না দেখে বৌদ্ধ ধর্মমতে দীক্ষিত হয়েছিলেন। তবে ধর্মান্তর হলেই সব-সমস্যার সমাধান হয় না। স্বাধীনতার চুয়াল্লিশ বছর পরে এখনও অস্পৃশ্যতা আছে—এখনও মেলামেশা সেভাবে হয় না। দেশে কলকারখানা অনেক বাড়লেও অনেক কাজ বাকী আছে। তাই সংবিধানে বছরের পর বছর সব বাড়াতে হচ্ছে।

বামফ্রন্ট সরকার নিশ্চয়ই এসব দিকে নজর দিচ্ছেন। আর সেজন্যই আমরা যে কর্মসূচী গ্রহণ করি তখন এসব ভুলি না। আমাদের রাজ্যে যে ভূমি-সংস্কার করা হয়েছে—তার উদ্বৃত্ত জমি বণ্টনের সময় দেখা যাচ্ছে তপসিলীজাতি-উপজাতির লোকেরাই সবচেয়ে বেশী জমি পাচ্ছেন। পাচ্ছেন তো পাবেন, এটাইতো জাসটিস—বিচার—সুবিচার।

এভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা ব্যবস্থা করেছি। যেমন মাথায় করে মলমূত্র পরিস্কার করার বিষয়টি। এসব এখনও আছে। ষাট হাজার মতো হবে। দেশে

এখন ও বহু আছে। আমরা আলোচনা করেছি—দিল্লীতেও আলোচনা হয়েছে। আমরা অনেক পাকা পায়খানার ব্যবস্থা করেছি। অনেকটা কাজ হয়েছেও এটাকে আরো জোরদার ভাবে করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে দেখতে হবে যাতে মানুষের চেতনাও বাড়ে। না হলে অস্পৃশ্যতার এসব সমস্যা কাটবে না। কারণ অনেক রাজ্যে এটা আছে ; যা দূর করতে সময় লাগবে। সৌভাগ্যের কথা পশ্চিম বাংলায় এসবের জায়গা নেই। কারণ ঊনবিংশ শতাব্দীর বহু মনীষীর জন্য আমরা এগিয়ে গেছি। কিন্তু আত্মতুষ্টির কোন জায়গা নেই। এসব বিবেচনা করেই আমাদের আগামী দিনের কর্মসূচী রূপায়িত করবার চেষ্টা করতে হবে। এটাও সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে হবে ধর্মের নামে যে এসব হচ্ছে—এটা অনেকেই লিখেছেন—এসব ধর্ম নয়—ধর্মের বিকৃতি।

আমার মনে আছে একবার ড. আম্বেদকরের স্ত্রীর সাথে দেখা হয়েছিল। কথা-বার্তা বলার সময় তিনি আমাকে বলেন—গান্ধীজী এই যে হরিজন আখ্যা দিয়েছিলেন তিনি এদের মধ্যে গিয়ে বাসও করেছিলেন। কিন্তু এভাবে বলা আমাদের বিশেষ পছন্দ নয়। আমি তাঁর কথা শুনলাম। তাঁর কথা তো ঠিকই।

আমার একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলি—অনেক আগের অবশ্য—সেটা হচ্ছে আমার দাদার যখন বিয়ে হয়। জলপাইগুড়ির রাজার মেয়ে—তা'রা তফসিলী জাতিভুক্ত ছিলেন। আমাদের বাড়িতে বিয়ে হল। ঐ বিয়ের নিমন্ত্রণ পেয়ে আমাদের এক আত্মীয়—শিক্ষিত লোক, বাবাকে চিঠি লিখেছিলেন যে আমরা যেতে পারবো না—কারণ ওরা জল-চল নয়। আমি স্কুলে পড়ি—এসব বিষয়ে খুবই অজ্ঞ ছিলাম—বাবা-মাকে জিজ্ঞেস করলাম', 'জল-চল মানেটা কি ?' তাঁরা বল্লেন—যাদের অচ্ছুত বলা হয় তারা জলস্পর্শ করলে—অন্যরা জলপান করবেন না।' কি অদ্ভূত ব্যাপার ! খেতে দিতো ঠিকই, আলাদা করে বসতে হত। এ কত বড় অপমান—অবমাননা ! আজকাল আর এসব হয় না। হতে পারে না। এজন্য—তাই আমরা বলি—আমাদের মনীষীদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। কারণ ওঁরা আমাদের মানুষের চেতনার মধ্যে এসব আনবার চেষ্টা করেছেন। শুধু আইন করে হয় না—মানুষের চেতনা বাড়াতে হবে। অন্য কোন পথ নেই। আমি আশা করবো যে এখনকার সমাজে অল্পবয়সী যাঁরা আছেন—যুব সম্প্রদায়, বিশেষ করে তাঁদের মধ্যে কাজটি করতে হবে। এ কেবল যারা রাজনীতি করেন তাদের কাজ নয়। বিভিন্ন যে সব গণ সংগঠন আছে—ছাত্র-যুব, মহিলা, ট্রেড ইউনিয়ন, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যাঁরা আছেন—তাঁদের এসব বিষয়ে কর্মসূচী নিতে হবে—আলোচনা করতে হবে। মানুষকে বোঝাতে হবে। বুঝতে হবে। নইলে পৃথক পৃথক হয়েই আমরা থাকবো। সত্যিকার লক্ষ্যে আমাদের পৌঁছন খুব কঠিন ও সুদূর পরাহত হয়ে যাবে। কিন্তু আমরা বদ্ধ পরিকর যে এটা আমাদের করতে হবে। করতে হবে দেশের জন্য, ভারতবর্ষকে দুনিয়ার প্রথম সারিতে আনবার জন্য।

★ পশ্চিমবঙ্গ সরকার আয়োজিত সেমিনারে (১১-৪-৯২, শিশির মঞ্চে) প্রদত্ত ভাষণ।

দীনেশ চন্দ্র ডাকুয়া ◻

অস্পৃশ্যতা দূরীকরণে একটি পদক্ষেপ

ড. আম্বেদকরের আজকে ১০২ তম জন্ম বার্ষিকী আমরা পালন করছি। কিছুদিন আগে ১৪ই এপ্রিল তারিখে নির্দিষ্ট যে দিনটিতে তাঁর জন্মদিবস পালিত হয় সেদিন ১লা বৈশাখ ছিল। তাঁর প্রতিমূর্তিতে সেদিন সরকারের পক্ষ থেকে আমরা মাল্যদান করেছি। মুখ্যমন্ত্রীও উপস্থিত ছিলেন। আমরা অন্যান্যরাও উপস্থিত ছিলাম। কিন্তু সে উপলক্ষ্যে সেদিন সভা করা হয়ে ওঠেনি। আজকে আমরা সেই উপলক্ষ্যে সভা করছি।

আম্বেদকর মারা গেছেন ১৯৫৬ সালে। তারপর বহুদিন হয়ে গেল। ভারতের সংবিধান রচয়িতা বলে তিনি বর্ণিত হন। অন্ততঃ তিনি সংবিধান প্রণয়ন কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। সেই সংবিধান ও তার প্রয়োগ কয়েক দশক ধরে ভারতবর্ষে হয়েছে কিন্তু আজও আম্বেদকরের জীবন ও কর্ম প্রাসঙ্গিক হয়ে রয়েছে। অন্যদিকে না গেলেও যেটা নিয়ে তাঁর জীবনের সংগ্রাম শুরু এবং বলতে গেলে সংগ্রাম মূলতঃ ঐ ধাঁচেই বা ঐ সুরেই প্রবাহিত হয়েছে এবং যার জন্য তিনি গোটা জীবন ধরে সংগ্রাম করেছেন সেটা হচ্ছে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম। তখন সেই—অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে উনি বর্ণবৈষম্য দূর করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। তার লেখালেখির মধ্যে বিশেষ করে সংবিধানে যতদূর সম্ভব তিনি চেষ্টা করেছেন যাতে ; হিন্দুসমাজটা একাকার হয় এবং পরবর্তী সময়ে হিন্দুকোর্ট বিল তিনি পাশ করাতে পারেননি। যেজন্য তিনি মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেছিলেন বলে পরবর্তীকালে জানতে পেরেছি। প্রশ্নটা থেকে যাচ্ছে এই যে, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের জন্য তিনি যে সংগ্রাম করেছিলেন এতদিন পরে সেই অস্পৃশ্যতা কতখানি দূর হল। এবং তা হলে, তার রচিত সংবিধান এই কয়েকদশক ধরে প্রয়োগ হ'ল কিন্তু কতটা ফলপ্রসূ হল তাও জানতে ইচ্ছে করে। কিছুদিন আগে দিল্লীতে একটা মিটিং হয়েছিল তাতে জানতে পেরেছিলাম তিনি যে পুকুরের জল খাবারের জন্য লড়াই করেছিলেন, যেখানে তিনি সংগ্রাম শুরু করেছিলেন সেই মাহাদ মিউনিসিপ্যালিটিতে এখনও অস্পৃশ্যতা চলেছে—এখনও সেই পুকুরের জল সবাই খেতে পারে না। পশ্চিম বাংলায় অবশ্য আবহাওয়া অন্যধরনের। এখানে রেনেসাঁস হয়ে গেছে, তার প্রভাব আছে। যার জন্য নীচু-জাত বলে ব্যাপারটা এখানে প্রকট নয়। কোন কালে ছিল না, এখনও নয়। কিন্তু সমগ্র ভারতবর্ষে এ জিনিস রয়েছে। এই জন্য আম্বেদকরের প্রসঙ্গ আজও প্রাসঙ্গিক।

অস্পৃশ্যতা (Untouchability) কম বেশী ভারতবর্ষের অনেক জায়গায় আছে। আইন অনুসারে এটা একটা দণ্ডনীয় অপরাধ। আম্বেদকর যে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন সেই অস্পৃশতা অবশ্য পশ্চিমবাংলায় সেভাবে নেই। কিন্তু আমরা তবুও জানি—এখানেএকটা শব্দ—একটা Term আছে যেটা আমাদের সরকারী কথা। যে মানুষগুলোকে সরকারী ভাষায় বলা হয় Person engaged in Unclean Occupation ; এর মধ্যে ভারতবর্ষের কিছু মানুষ আছেযারা মুচি যারা নালা নর্দমা পরিস্কার করে, যারা পশুপাখির শবদেহ কিংবা মানুষের মল পরিস্কার করে। এদের বিভিন্ন ধরণ আছে। বিভিন্ন রাজ্যে এদের বিভিন্ন নাম আছে। আমাদের এখানে এই মানুষগুলো ডোম, মেথর প্রভৃতি নামে পরিচিত। যদিও আইনের ভাষায় অস্পৃশ্যতা উঠে গেছে ; কিন্তু এই অস্পৃশ্যতার সঙ্গে ভারতবর্ষে কতকগুলি সামাজিক উপাদান যুক্ত আছে, সে উপাদানগুলি যতদিন থাকবে ততদিন অস্পৃশ্যতাকে সমাজ লালন করতে থাকবে। অস্পৃশ্যতাকে আইনে উঠিয়ে দেওয়া যায় কিন্তু যদি ঐ আমাদের Nightsoil Carrying থাকে ; যদি ঐ মলমূত্র পরিস্কার করা এটা যে পদ্ধতিতে আগে হত এই পদ্ধতিই হতে থাকে,—যদি খোঁজ করা যায় তাহলে দেখা যায় এই মানুষগুলো অন্য পাঁচ জনের তুলনায় অবহেলিত এবং মানুষের কাছে এরা নীচের দিকে থেকে যায়। বিশেষ করে বংশানুক্রমে যারা মলমূত্র পরিস্কার করে, তারা তো প্রকারন্তরে অস্পৃশ্যই থেকে যায়। এবং আজকাল বিজ্ঞানের আশীর্বাদে Unclean occupation করতে গেলে নিজেরাও যে Unclean হতে হবে এমন কোন কথা নেই অর্থাৎ আজকাল পুরনো পায়খানার পরিবর্তে Sanitary Latrine ইত্যাদি নানাভাবে নানা মেকানিজম হয়েছে। যাহোক Unclean occupation বলে সরকারী যে শব্দ ব্যবহার করা হয় প্লানিং করে সমগ্র ভারতবর্ষ থেকে সেই Unclean Occupation দূর করা যায়। নিজেদের জীবন থেকে Uncleaness টা যদি দূর করা যায় তাহলে Unclean Occupation-এ যুক্ত থেকেও লোকগুলো কিন্তু clea n হতে পারে। এবং কিছুদিন পরে দেখা যাবে এটা আর অস্পৃশ্যতা বলে গণ্য হবে না। অন্ততঃ সামাজিকভাবে ওগুলো উঠে যাবে। আসল কথা হ'ল এই যে এটা একটা সংগ্রাম। ভারতবর্ষের অন্য জায়গায় না হলেও পশ্চিমবাংলা এ ব্যাপারে যথেষ্ট প্রোগ্রাম নিয়েছে। আমরা জানি এই মলমূত্র মানুষ দিয়ে পরিস্কার করানো আর ঠিক নয়। যদি খাটা পায়খানা ইত্যাদিকে আস্তে আস্তে আমরা সেনিটারি পায়খানায় রূপান্তরিত করতে পারি। তবে মানুষ জীবিকার এই অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবে। এই মল-মূত্র Carrying থেকে মুক্তি পাবে। এই পরিকল্পনার ফলে একদিন দেখা যাবে যে আর সেভাবে তার পাড়াপড়শীর কাছে আর অস্পৃশ্য বলে পরিচিতি থাকবে না। ওদের মনে পড়বে না। কিন্তু এটা একটা বড় প্রোগ্রাম। ভারত সরকারও নিয়েছে, পশ্চিম বাংলায় আমরা seriously নিয়েছি। আম্বেদকরের যে স্বপ্ন ছিল, সেটা ছিল মানুষকে অস্পৃশ্যতা থেকে মুক্ত করা—তার জন্য একাজগুলি করতে হবে।

মুখে বললে তো চলবে না যে—হাঁড়ি, মুচি, মেথর ডোম আমার ভাই আমার রক্ত। আসলে ঐ লোকগুলোকে Unclean Occupation থেকে তুলে এনে জীবনের পরিচ্ছন্নতায়, তাদের আরও পাঁচজন মানুষের সংগে সমাজে একাকার করা এটা একটা বড় সংগ্রামের কাজ।

আম্বেদকরের আরও বহুদিক আছে সেকথা অন্যরা আলোচনা করবেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে যে লড়াই সেই লড়াই-এ অপরিচ্ছন্ন পেশায় নিযুক্ত যে মানুষ আছে এই মানুষগুলোকে একত্র করতে হবে। কিন্তু পেশাটাই মেকানাইজড হবে এবং এই মানুষগুলো Cultured হবে Educated হবে। যদি পাঁচজনের সঙ্গে এদের অন্যান্যভাবে উন্নত করা যায় তখন তা হলে দেখা যাবে পশ্চিম বাংলায় যে অস্পৃশ্যতা আছে সেটা ভবিষ্যতে থাকবে না।

এটাও ঠিক যে গান্ধীজী অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। তিনি অন্যদিক থেকে লড়াই করেছেন আর আম্বেদকর নিজে অস্পৃশ্যদের মধ্যে থেকে, নিজে অস্পৃশ্যদের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। কিন্তু শুধু সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করলেই অস্পৃশ্যতা দূর হয় না। এটা আম্বেদকর দেখতে পেতেন যদি তিনি আজ বেঁচে থাকতেন। অর্থনৈতিক বৈষম্যের সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক বৈষম্য আছে। সাংস্কৃতিক বৈষম্য আছে। অর্থনৈতিক বৈষম্য বিশেষ করে আমাদের জমিজমা, অর্থনৈতিক বৈষম্যের মধ্যে এটা প্রধান। কারণ জমির মালিকানা যদি প্রকটভাবে থাকে শুধু আইন করে, কিছু বক্তৃতা প্রচার করে, অস্পৃশ্যতাকে দূর করা যায় না। সুতরাং আমাদের একদিকে যেমন এই অপরিচ্ছন্ন মানুষগুলোকে বিশেষ ভাবে অস্পৃশ্যতার লেবেল থেকে উন্মুক্ত করা হবে। সুতরাং সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে একটা লড়াই শুরু হয়েছে যা আম্বেদকরের জীবনে চলেছিল, আজও চলছে সেই লড়াই। আমাদের মধ্যে সেই লড়াই চালাচ্ছি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের সব জায়গায় আমাদের এই অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই সঠিকভাবে শুরু হয়নি। কিন্তু আমরা যদি একটা Package Deal না করি—অর্থনৈতিক বৈষম্য, সামাজিক বৈষম্য এই সমস্ত রকম বৈষম্যকে যদি এক সঙ্গে দেখতে চেষ্টা না করি—অর্থাৎ একটা দূর না করলে আর একটা দূর হয় না। একটা রেখে অন্যটা দূর করা যায় না।

আমি আশা করব আমরা যাতে আম্বেদকরের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে পারি। তিনি যে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন এবং লড়াই করেছিলেন এবং সেই বৈষম্য দূরীকরণে আমরা যেন এগিয়ে যেতে পারি।

□ কান্তি বিশ্বাস

ড. আম্বেদকরের প্রাসঙ্গিকতা

গত দু-বছর ধরে ড. ভীমরাও রামজী আম্বদকরের জীবনাদর্শকে কেন্দ্র করে ক-খানা পত্রিকায় ও ক'টি প্রবন্ধ সংকলনে কতগুলি প্রবন্ধ লিখেছি—এই মুহূর্তে তা মনে করতে পারছি না। জনৈক কংগ্রেস (আই) নেতার লিখিত অনুরোধ এবং দূরভাষ যোগের উপরোধ অনুসারে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। তার মুখে শুনেছিলাম লেখাটি নাকি যথেষ্ট গবেষণামূলক ও খুবই সুখপাঠ্য হয়েছে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের অর্থানুকূল্যে তিনি তাঁর প্রবন্ধ-সংকলন খানি প্রকাশও করেছেন। যদিও আমার লেখাটিকে তিনি তার মধ্যে স্থান দেন নি। আমার শ্রমসাধ্য লেখাটি তিনি অনুগ্রহ করে ফেরতও পাঠান নি। আমার অবশিষ্ট সকল লেখাগুলি আগ্রহী-পত্রিকা বা গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। তার বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ পাঠক-দের নিকট থেকে বেশ কিছু চিঠি-পত্র পেয়েছি। ঐ সমালোচক-মণ্ডলীর কোনো কোনো সুহৃদ কিছু প্রশ্ন বাণ আমার দিকে ছুঁড়ে দিয়েছেন। ড. আম্বেদকরের চরিত্র মূল্যায়ণে আমি কি পক্ষপাত দোষে দুষ্ট হই নি? তাঁর গুণপনা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমি কি পরিমিতি বোধের সীমা অজান্তে অতিক্রম করি নি? তাঁর সম্পর্কে আমার কিছু অতিশয়োক্তি কি বস্তুনিষ্ঠ আলোচনার ব্যত্যয় ঘটায় নি? ইত্যাকার কিছু জিজ্ঞাসা পেয়েছি। সেগুলির কোন উত্তর দেওয়ার সুযোগ এখানে নেই। কিন্তু সে উপলব্ধির উপর দাঁড়িয়ে আলোচ্য নিবন্ধগুলি রচনা করেছি—তার থেকে বিন্দু মাত্র স্থানচ্যুত নাহয়েই বর্তমানে আমার প্রাসঙ্গিক অভিমত প্রকাশ করতে চাইছি।

ড. আম্বদকরের উপর কোন দেবত্ব আরোপকারে তাঁর প্রতি সুবিচার করা যায় বলে মনে করি না। মুণি-ঋষির আসনে বসিয়ে কিংবা সমস্ত বিতর্কের উর্ধে কোন ধর্মীয় গুরুর মর্যাদায় ভূষিত করে তাঁকে যথার্থ ভাবে বোঝা যাবে বলেও মনে করি না। দোষ-গুণ, ভুল-ভ্রান্তি, সবলতা-দুর্বলতা এবং নমনীয়তা—কঠোরতা নিয়েই তিনি ছিলেন একজন নিবেদিত রাজনৈতিক নেতা, সমাজ সংস্কারক, আইনজ্ঞ, শিক্ষা-পিপাসু, অর্থনীতিবিদ—এককথায় একজন স্মরণীয় মনীষী। অনেক বৈপরীত্যের মিশ্রণ যেমন তাঁর মধ্যে ছিল—আবার আমাদের মত অনেকের সমর্থন-যোগ্য নয় এমন মতবাদেরও তিনি প্রবক্তা ছিলেন। তবে আজকে যে আর্থ-সামাজিক-রাজনীতিক অবস্থা বিরাজ করছে নিছক তার আলোকে অতীতের কোন কর্মযোগীকে যেমন সঠিকভাবে বিচার করা যায় না—আম্বেদকরের চিন্তাধারাকেও এখনকার মাপ কাঠিতে পরিমাপ করা যায় না। তদানীন্তন সমাজ-দর্পণেই তাঁকে দর্শন করার চেষ্টা করতে হবে। আবার সেই সাথে তাঁর কিছু মৌলিক ধারণার

প্রাসঙ্গিকতা বর্তমান কালের নিরিখেও বিচার করতে হবে। 'নবযুগ' পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে গ্রেট-ব্রিটেন থেকেও বেশি বিপজ্জনক শত্রু বলে উল্লেখ করেছিলেন। তার বিশাল ধন সম্পদের বলে বলীয়ান হয়ে বিশ্বকে বিশেষ করে ভারতকে দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ করার বিপদ সম্পর্কে হুশিয়ারী দিয়েছিলেন। সেই সাথে ভারতের জোট-নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রীয় নীতিকে প্রচণ্ড ভাবে আক্রমণ করেছিলেন। সুয়েজখাল জাতীয়করণের সময় মিশরের প্রেসিডেণ্ট নাসেরকে সমর্থন করায় পণ্ডিত নেহরুর তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। সোভিয়েতের বিরোধিতা করে তিনি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার চুক্তির সাথে যুক্ত হতে ভারত সরকারকে পরামর্শ দিয়েছিলেন। তাঁর এই সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল বলে মনে করি না। মুহম্মদ আলী জিন্নার নেতৃত্বে মুসলীম লীগের কার্যকলাপ সম্পর্কে তাঁর কোনো কোনো অভিমত যেমন সমর্থন যোগ্য নয়—তেমনি কাশ্মীর সম্পর্কে তাঁর ধ্যান ধারণাও যথার্থ ছিল বলে মনে করা যায় না। সংবিধানে যা-ই প্রতিফলিত হোক—কিন্তু তিনি ব্যক্তিগত ভাবে এক-কেন্দ্রিক সরকার গঠনের প্রবক্তা ছিলেন। হিন্দীকে একমাত্র রাষ্ট্রীয় ভাষা করার জন্য তাঁর চেষ্টার কোনো ঘাটতি ছিল না। তাঁর প্রবল আপত্তি থাকা সত্ত্বেও পঞ্চায়েতী-রাজ গঠনের কথা তিনি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করতে সম্মত হয়েছিলেন। ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার দিকপাল অর্থবিজ্ঞানী কিন্‌স্‌-এর অনেক তত্ত্বকে তিনি যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করার চেষ্টা করেছিলেন বটে—কিন্তু ভারতের অর্থ-ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর চিন্তা-ভাবনাকে এ দেশের অর্থবিজ্ঞানীরা সমর্থন করতে পারেন নি। শোষিত-নিপীড়িত মানুষের মুক্তি দিতে পারে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা—সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েতের সাফল্য এই সত্যকে যখন তর্কাতীত ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে—তখন তিনি তাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের উচ্চ-গগনে বিরাজ করতে ছিলেন। ভারতের নির্যাতীত-অবহেলিত মানুষের প্রতি সীমাহীন দরদী আম্বেদকর দু-একটি ক্ষেত্র ছাড়া সোভিয়েতের এই অতুলনীয় সাফল্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, এমন কোন প্রমাণ মেলে না। সোভিয়েত সম্পর্কে প্রথমে বিরূপ ধারণা থাকা সত্ত্বেও ঐ দেশ ভ্রমণ করে বিশ্বকবি যখন পুলকিত—আহ্লাদিত হয়ে **'তীর্থ দর্শন'** করেছেন বলে অভিমত প্রকাশ করলেন—মানুষের জয়যাত্রা দেখে মুগ্ধ হয়ে তার প্রসংশা করলেন—তখনও সংবেদনশীল আম্বেদকরের হৃদয়-তন্ত্রীতে তার কোন ঝঙ্কার উঠলো না কেন—এ প্রশ্নের জবাব এখনও খুঁজে বের করার অপেক্ষা রাখে। আম্বেদকরের জীবনাদর্শ নিয়ে যাঁরা গবেষণা করবেন—এ-জাতীয় রহস্যের সন্ধান তাঁরাই দিতে পারবেন।

কিন্তু এতৎ সত্ত্বেও আম্বেদকর ছিলেন অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে মূর্ত-প্রতিবাদ. আপোষহীন সংগ্রামী। হিন্দু সমাজের মধ্যযুগীয় সীমাহীন বর্বর আচরণের ; বিরুদ্ধ জেহাদ ঘোষণার অনন্য সেনাধ্যক্ষ। তাঁর পূর্বে কবীর, শ্রীচৈতন্য, ফুলে, রামমোহন সহ বহু মনীষী ও ধর্মীয় গুরু হিন্দু সমাজের অস্পৃশ্যতা সহ অন্যান্য

অমানবিক প্রথার বিরুদ্ধে দৃঢ় মত প্রকাশ করেছেন এবং তা বন্ধ করতে কায়মনবাক্যে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু অন্ততঃ এ ব্যাপারে তাঁদের সকলের মধ্যে আম্বেদকরের অনন্যত্ব, হয়ত শ্রেষ্ঠত্বও অনস্বীকার্য। শৈশব থেকে মৃত্যু পর্যন্ত পলে পলে এই নিষ্ঠুর আচরণে তাঁর বিবেক, তাঁর আত্ম-সম্মান বোধ, তাঁর মনুষ্যত্ব ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে—ব্যক্তি জীবনে অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারে এই অপমানের জ্বালা সঞ্চিত হয়ে পাহাড়ের আকার ধারণ করেছে। আর কোনো সমাজ সংস্কারকের ভাগ্যে তা জোটে নি। শিশু বয়সে বিদ্যালয়ের ছাত্র হয়েও শ্রেণী কক্ষে প্রবেশ করার অধিকার ছিল না—অধিকার ছিল না শিক্ষকের কাছে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার। অস্পৃশ্য কুলে জন্মগ্রহণ করেছেন—এই ভয়ঙ্কর অপরাধে গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানের কাছ থেকে নির্দয়ভাবে প্রহৃত হয়ে কিশোর আম্বেদকর গাড়ী থেকে দৈহিক ভাবে অপসারিত হয়েছেন। অধ্যাপনা করার সময়ে পানীয় জলাধার যাতে অসতর্ক মুহূর্তেও স্পর্শ করে না ফেলেন—সে জন্য সহ-কর্মীদের হুঁশিয়ারী শুনেছেন। বরোদা-মহারাজার সেরেস্তায় কাজ করার সময়ে নিজ আর্দালীর কাছ থেকে দিব্য-জ্ঞান লাভ করার সুযোগ পেয়েছেন—তিনি অস্পৃশ্য অবহেলিত সেই কারণে আর্দালী নিজ পবিত্রতা রক্ষা করার জন্য নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে কাগজপত্র আম্বেদকরের দিকে ছুঁড়ে দিতেন। ১৯৪২-৪৬-এ তিনি ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিও কাউন্সিলের শ্রম বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্য—অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রম-মন্ত্রীর সম মর্যদাপূর্ণ পদে নিযুক্ত ছিলেন। সেই সুবাদে ১৯৪৫ এর জানুয়ারীতে কলকাতায় এসেছিলেন। রেলের কনসাইলেসন অফিসার ডিজি যাধবের বাড়ীতে নৈশ ভোজে আপ্যায়িত হয়েছিলেন। তার পরের দিনই বেচারা যাধবের ঠাকুর-চাকর ঘৃণাভার চাকুরী থেকে ইস্তাফা দিয়ে চলে গিয়েছিলেন। এ-করুণ কাহিনীর কথা আম্বেদকরকে শুনতে হয়েছিল। তিনি মহারাষ্ট্র পৌরসভা ও পরে বিধান সভায় সদস্য ছিলেন। ঐ রাজ্য থেকেই স্বাধীনতার পর রাজ্য সভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন। কেন্দ্রে মন্ত্রী সভা গঠিত হওয়ার পর কংগ্রেস পরিচালিত বোম্বাই পৌরসভা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের এক মহতী সম্বর্ধনা সভায় আয়োজন করে। পণ্ডিত নেহরু, সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সহ সকলে নিমন্ত্রিত হয়ে সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। নিমন্ত্রণ পান নি শুধু স্বাধীন ভারতের আইন মন্ত্রী সংবিধান রচনা কমিটির চেয়ারম্যান নিচু জাতির সন্তান ড. আম্বেদকর। অনেক পরে সমালোচিত হয়ে পৌরসভার চেয়ারম্যান আম্বেদকরকে একক ভাবে সম্বর্ধনা জানানোর ইচ্ছা প্রকাশ করে একখানি চিঠি দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর জবানীতে লিখেছেন, তিনি ঐ চিঠির উত্তর দিতে পর্যন্ত ঘৃণা বোধ করেছিলেন—নীরবে এই অপমানের প্রতিবাদ করেছিলেন। আমাদের দেশের কোনো সমাজ সংস্কারকের সহ্য করতে হয়েছে এ-হেন হৃদয়হীন মনুষ্যত্বহীন বিদ্বেষ জনিত আচার আচারণ? পত্র-পত্রিকায় সমালোচনা হয়েছিল জীবিত কালে যা তিনি পেয়েছিলেন—মৃত্যুর পরেও তার কোন ব্যতিক্রম হয়নি। প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু নিজে যে প্রথা গড়ে তুলেছিলেন—নিজে তা ভঙ্গ করে আম্বেদকরের শেষকৃত্য

অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত ছিলেন। তাই আম্বেদকরের সংগ্রামী জীবন আর অন্য সমাজ সংস্কারকের জীবনের মধ্যে একটা মৌলিক ব্যবধান আছে। আমেরিকার নিগ্রো মনীষী মার্টিন লুথার কিং এর মধ্যে হয়ত আম্বেদকরকে কিছুটা খুঁজে পাওয়া যাবে।

১৯৩১ সালে মণি ভবনে গান্ধীজি তাঁর সাথে একান্তে দীর্ঘ আলোচনা করেন। গান্ধীজি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন বৃটিশের কবল থেকে মাতৃভূমিকে মুক্ত করতে তিনি কেন সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন না। দেশ স্বাধীন হলে সমস্ত সামাজিক অন্যায় অবিচার দূর হয়ে যাবে—এই সত্য কেন আম্বেদকর বুঝতে পারছেন না। গান্ধীজি বেঁচে থাকলে দেখতে পেতেন—তাঁর ধারণা কত অসার—তাঁর হিসাবে কত ফাঁকি—তাঁর মূল্যায়ন কত অবাস্তব ও অবৈজ্ঞানিক। এখন সে কথা থাক। আম্বেদকর বেদনামিশ্রিত উপহাসের হাসিতে মুখমণ্ডল কঠিন করে বলেছিলেন কুকুর-বিড়াল থেকে ঘৃণ্য আচার-ব্যবহার যে দেশে যে সম্প্রদায়ের ভাগ্যে নিয়মিত জোটে—সেই দেশকে মাতৃভূমি বলে ভক্তি করার সুযোগ তাদের কতটুকু থাকে? ১৯৪০ সালের ২২শে জুলাই বোম্বাইয়ে গভীর আলোচনার সময় এই প্রশ্নের জবাব পান নি আম্বেদকর নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর কাছ থেকে—যেমন পান নি মাণিভবনে গান্ধীজির নিকট হতে। সুপণ্ডিত প্রধানমন্ত্রী নেহরু ১৯৫২ সালে নাগপুরে হরিজন সমাবেশে তার দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করে বলেছিলেন—অস্পৃশ্যতার মত সামাজিক ব্যাধি দূর করার জন্য কোন স্বতন্ত্র ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই—অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতা অপসারিত হলেই এই রোগ থেকে সমাজ নিষ্কৃতি পাবে। বলতে দুঃখ হয় চিন্তার কী অসচ্ছলতা, ভাবনায় কী দীনতা, জ্ঞানের কী স্থূলতা, পরিস্থিতি মূল্যায়নের কী অসারতা, এত বড় দানবীয় সমস্যার গভীরে যাওয়ার আগ্রহের কী অভাবগ্রস্ততা! দক্ষ চিকিৎসকের সূক্ষ্ম দৃষ্টি ব্যতীত বোঝা যাবে না—এ ব্যাধি শুধু সমাজের অঙ্গে নয়—মানুষের ধমণিতে-শিরায়-উপশিরায়, অস্থি-মজ্জায়। তাই সামাজিক, আর্থিক, রাজনৈতিক ব্যবস্থাপত্রের সাথে অনিবার্যভাবে চাই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নয়—সাংস্কৃতিক দাওয়াই। এই উপলব্ধি কংগ্রেসের কস্মিন কালেও ছিল না। ১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেস ১৯১৭ সালে প্রথম অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করে। ১৯২২ সালে ওয়াকিং কমিটি প্রস্তাব গ্রহণ ক'রে এই কাজ সমাধা করার জন্য হিন্দু মহাসভাকে অনুরোধ করে।

কোনো কোনো মহল তাঁকে সংবিধানের জনক—কেউ বা রূপকার—কেউ বা স্থপতি বলে অভিহিত করেন। এর থেকে বড় রকমের আত্ম-প্রবঞ্চনা আর কিছু হতে পারে না। সংসদীয় ব্যবস্থায় কোনো ব্যক্তির ইচ্ছার সংবিধান হয় না—তা হয় শাসক রাজনৈতিক দলের সিদ্ধান্ত অনুসারে। আম্বেদকর তো ছিলেন আজীবন কংগ্রেস বিরোধী ব্যক্তি। তিনি নিজে তো রাজ্যসভায় কক্ষে দাঁড়িয়ে ১৯৫৩ সালের ২রা সেপ্টেম্বর তারিখে এই সংবিধানকে পুড়িয়ে ভস্মীভূত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর মেধাকে ব্যবহার করার জন্য তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই সংবিধানের মৌল বিষয়গুলি তাঁর উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল বলে তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় ক্ষোভ

প্রকাশ করেছিলেন। তবে একথাও অনস্বীকার্য সংবিধান রচনায় ও তার বিতর্কে তিনি যে পাণ্ডিত্য ও দক্ষতার পরিচয় রেখেছিলেন তার তুলনা মেলা ভার।

ধর্মত্যাগী হিসাবে তাঁর বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগও বিভিন্ন সময় ওঠে। ধর্মের দোহাই দিয়ে যারা সমাজে অনাচার ও ব্যভিচার চালিয়ে যাচ্ছিলেন—তাদের স্বরূপ উদঘাটিত করতে একদিকে যেমন তিনি হিন্দুধর্মের অসংখ্য শাস্ত্ররাজি অধ্যয়ন করেছেন—অন্যদিকে দেশ-বিদেশের ঐতিহাসিক তথ্যাবলী থেকে ধর্মের নামে কায়েমী স্বার্থের ভিত্তিহীন প্রচারের অন্তঃসারশূণ্যতা খুঁজে বের করেছেন। বিদ্যাসাগর ব্যতীত এত শাস্ত্র-চর্চা আর কোন দেশীয় সমাজ সংস্কারক করেছেন বলে জানা নেই। যে ধর্মীয় কুহকের মায়াজাল ছিন্ন-ভিন্ন করার জন্য আম্বেদকর সারাটা জীবন ধরে যুদ্ধ করে গেছেন—সেই ধর্মীয় গোঁড়ামিকে সম্বল করে রাজনীতির দাবা খেলায় নেমেছে বি জে পি। আজকের বিজেপির আদি সংগঠন ভারতীয় জনসংঘের প্রতিষ্ঠাতা ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী একই সালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সভায় থেকেও চরম শত্রুতা করেছেন আম্বেদকরের সাথে—এমন কি এই শত্রুতা প্রচলিত প্রথার গণ্ডিকে অনেক সময় অতিক্রম করে গেছে—তাজ্জব ব্যাপার সেই বিজেপির মুখে আজ আম্বেদকর ভজনার কথা শোনা যায়। আম্বেদকরের হিন্দু ধর্ম ত্যাগ কোন যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত ছিল কিনা সে আলোচনায় না গিয়ে বলা যায় হিন্দু-নারীর সামান্য ন্যায়সঙ্গত অধিকার দেওয়ার জন্য মন্ত্রী সভায় অনুমোদন নিয়ে 'হিন্দু কোড বিল' পাশ করার চেষ্টা করতে গিয়ে যেভাবে তাকে নাকানি-চুবানি খেতে হয়েছিল এবং অবশেষে মন্ত্রীসভা থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল—তার পর যদি সেই ধর্মের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মায় সেটা কতখানি অন্যায়—তা বিচারের বিষয়। ছাত্রজীবনে অনন্য-সাধারণ মেধাবী, রাজনৈতিক জীবন মধ্যাহ্নে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভাপতি এবং বার্ধক্যের দ্বারপ্রান্তে এসে স্বাধীন ভারতের প্রথম নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্র প্রসাদকে যদি কম বয়সের নিরক্ষর প্রায় ব্রাহ্মণ যুবকের পা ধুয়ে দিয়ে পুণ্য সঞ্চয় করার কাজে মগ্ন হতে দেখা যায়—তখন সেই ধর্মের ভবিষ্যত সম্পর্কে যদি কারো মনে কোনো হতাশার সৃষ্টি হয়—তা কতখানি অন্যায় তা বলা কি এত সহজ ?

১৮৯৩ সাল থেকে সুদীর্ঘ ২১ বছর ধরে নির্মম বর্ণবিদ্বেষবাদের বিরুদ্ধে অসম সাহসিকতার সাথে দক্ষিণ আফ্রিকায় আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন গান্ধিজি। অস্পৃশ্যদের প্রতি দরদী হয়ে তাদের নাম দিয়েছিলেন 'হরিজন'। হরিজন পত্রিকা বের করেছিলেন। বিহারে ভয়াবহ ভূমিকম্পের পরে গান্ধিজি কারণ বিশ্লেষণ করে বললেন হরিজনদের প্রতি অমানুষিক কাজের পরিণতিতে ভূমিকম্প হয়েছে। ১৯৩৮ সালে মধ্যপ্রদেশে (তখনকার সেণ্ট্রাল প্রভিন্স) ড. খাড়ের নেতৃত্বে কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। জনসংখ্যার ৩০ শতাংশ হরিজন-আদিবাসী—সেই কথা ভেবে বিশাল মন্ত্রী সভায় একজন বি. এ. পাশ হরিজন যুবককে মন্ত্রী হিসাবে স্থান দেওয়া হয়। সৌম্য মূর্তির গান্ধিজি হয়ে গেলেন ক্ষিপ্ত। (কোনো মাড়োয়ারীকে

মন্ত্রী না করায় ১৯৪৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে ড. প্রফুল্ল ঘোষ মন্ত্রী সভার বিরুদ্ধে যেমন কুপিত হয়েছিলেন তিনি)। তাঁর রোষানল প্রশমিত করতে পরের দিনই মন্ত্রী সভা পদত্যাগ করে। পরে সেই অভাগা হরিজন যুবককে বাদ দিয়ে পুনরায় মন্ত্রী সভা গঠিত হয়। গান্ধিজির কাছে এই রহস্যের কারণ জিজ্ঞাসা করলে আকারে বুঝিয়ে দিলেন তিনি মৌনব্রত পালন করছেন—কথা বলতে পারবেন না। পরের দিন মধ্যপ্রদেশ থেকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে পাড়ি দিলেন। তখন বামপন্থী আন্দোলন কয়েকটি স্থানে মাত্র সীমিত, গণতান্ত্রিক আন্দোলন অত্যন্ত দুর্বল—কংগ্রেস এবং গান্ধিজির এই পরিচয়ে মরমী আম্বেদকর বিচলিত—তাই কখনও এখানে—কখনও ওখানে—বিচার করতে হবে সবকিছু মাথায় নিয়ে।

আম্বেদকরের বহু মুখী প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গেছে বহুক্ষেত্রে। আজকের কর্ম-বিনিয়োগ কেন্দ্র, শিল্পে ত্রি-পাক্ষিক আলোচনার ব্যবস্থা, মহিলা শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রসূতি-কালীন ছুটির ব্যবস্থা প্রভৃতি অনেক কিছু তারই শ্রমবিভাগের দায়িত্ব পালন করার সময়কার সিদ্ধান্তের ফসল। অর্থনীতিবিদ ও শিক্ষাবিদ হিসাবে নিজস্ব মৌলিক চিন্তার উজ্বল চিহ্ন রেখে গেছেন তাঁর কর্মময় জীবনের বিভিন্ন অধ্যায়ে।

আজ সমস্যা কণ্টকাকীর্ণ ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় আম্বেদকরের প্রাসঙ্গিকতা বিদ্যমান। অন্ধ-ভাবে তাঁর গুণ-কীর্তন নয়—আবার সংকীর্ণ মনা একদেশ দর্শিতায় অভিযোগে অভিযুক্ত করে তাঁকে নস্যাৎ করার মত আত্ম-হননের পথ পরিক্রমাও নয়। তাঁর জীবনাদর্শের মূল সূত্রগুলি গভীর ভাবে অধ্যয়ণ করা প্রয়োজন। তারথেকে শিক্ষা গ্রহণ করা প্রয়োজন। যত বেশি বেশি এই চর্চা হবে ততই সমাজের মঙ্গলের দিক উন্মুক্ত হবে। এই মানসিকতা নিয়ে তাঁকে দেখার তাঁকে বোঝার চেষ্টা যদি হয় তবেই তাঁর প্রতি সুবিচার করা হবে। এতদিন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও কেন সোভিয়েতের অঙ্গ রাজ্যগুলি হতে, যুগোশ্লাভিয়া হতে বর্ণ-বিদ্বেষের বিষ দূর করা যায় নি ? কেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এত উন্নতি সত্ত্বেও বর্ণ-বিভেদের ভয়াবহতা নির্মূল করা যায় নি ? কেন এখনও দক্ষিণ আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়া থেকে এই মধ্যযুগীয় আর্তনাদ গোটা বিশ্বমানবতাকে সচকিত করে তোলে ? ভাবতে হবে সকলকে।

প্রবন্ধে প্রখ্যাত আম্বেদকর বিশেষজ্ঞ ধনঞ্জয় কীর ও ডাব্লউ এন কুবের রচিত আম্বেদকর জীবনীও পর্যালোচনা, রাজ্যসভার প্রোসেডিং স ও আম্বেদকরের মূল রচনাবলীর সাহায্য নেওয়া হয়েছে।—লেখক

□ উপেন কিসকু

শতবর্ষের আলোকে ড. আম্বেদকর

আজকে আমরা রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ড. বি আর আম্বেদকরের ১০২ তম জন্ম-বার্ষিকী এখানে পালনের উদ্যোগ নিয়েছি। এখানে আমি ব্যক্তিগতভাবে ড. বি. আর. আম্বেদকরের কর্মময় জীবন,—যে সংগ্রামী জীবন, তিনি যার জন্য আজীবন লড়াই করে গেছেন—সেই অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের জন্য তাঁর লড়াইকে স্মরণ করে দু-এক কথা বলতে চাই। আপনারা সকলেই জানেন ড. বি. আর. আম্বেদকর সমাজের যে সম্প্রদায়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেই মাহার সম্প্রদায়কে অস্পৃশ্য বলে গণ্য করা হোত। স্বাভাবিকভাবেই তিনি বাল্য জীবনে, স্কুল জীবনে তথা শিক্ষাজীবনে এই অস্পৃশ্যতার অপমানকর অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে শিক্ষা-লাভ করেছেন। আমরা বিভিন্ন লেখায় দেখেছি তাঁকে স্কুলে একই বেঞ্চে বসতে পর্যন্ত দেওয়া হোত না। স্বাভাবিকভাবেই শৈশব থেকেই অস্পৃশ্যতার যে যন্ত্রণা, যে জ্বালা, যে অপমানকর অবস্থা এর বিরুদ্ধে তাঁর মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এবং তিনি বিভিন্নভাবে উচ্চশিক্ষালাভের সুযোগ পেয়েছিলেন। সমাজের অন্যান্য স্তরের বা সম্প্রদায়ের মানুষের সহযোগিতাও তিনি পেয়েছিলেন। কিন্তু শিক্ষা লাভ করার পরে তাঁর জীবনের ব্রতই হয় সমাজ জীবন থেকে এই কলঙ্কময় যে ব্যবস্থা—অপমান-কর যে ব্যবস্থা—তাকে কিভাবে দূর করা যায় তারজন্য বিভিন্ন পন্থা-পদ্ধতি অব-লম্বন করা। পুকুরের জল ছোঁয়ার আন্দোলন ইত্যাদি থেকে শুরু করে বিভিন্ন পন্থা তিনি গ্রহণ করেছিলেন সমাজের মানুষের মধ্যে সচেতনতা জাগ্রত করার জন্য।

পরবর্তীকালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমরা আম্বেদকরকে সংবিধান প্রণয়ন কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দেখি এবং সেজন্য অনেকে আমরা বলে থাকি তিনি সংবিধানের রচয়িতা। এটি হয়তো অনেকাংশে সত্য কিন্তু এটাও আমরা দেখতে পাই সংবিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে সেখানে গণপরিষদের অন্যান্য যাঁরা সদস্য তাঁদের সাথে তাঁর বিতর্ক হয়েছে। আজকে সংবিধানের নির্দেশাত্মক নীতিতে যে সমস্ত অধিকারের কথা বলা আছে ড. আম্বেদকরের বিভিন্ন লেখার মধ্যে থেকে আমরা দেখতে পাই তিনি এসব প্রশ্নে একমত ছিলেন না। তাঁর মত গৃহীত হলে সে নির্দেশাত্মক নীতির অনেকগুলিই হয়তো মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত হোত। আজকের সমাজজীবনে আমরা যে সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত তার অনেকগুলিই মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি পেতে পারতো। এছাড়া তাঁর জীবন, তাঁর কর্ম, তাঁর লেখার মধ্যে অনেক বিতর্কিত বিষয় আমরা দেখতে পাই। ড. বি. আর. আম্বেদকরের যে স্বপ্ন ছিল, যে লক্ষ্য ছিল সেগুলি দেশের সমস্ত মানুষকে জানাবার প্রয়োজন আছে।

আমরা বি. আর. আম্বেদকরের কর্ম এবং জীবন সম্বন্ধে কতটুকু জানি ! বিভিন্ন তার সব লেখা আমাদের সামনে সহজলভ্যভাবে উপস্থিত করা হয়নি এবং যাদের জন্য তিনি সংগ্রাম করেছিলেন সেই সমস্ত মানুষেব কাছে এই সব লেখা খুব কম পেঁাছেছে। স্বাভাবিকভাবেই বি. আর. আম্বেদকরের সমস্ত লেখাগুলিই যদি সমাজের কাছে পেঁাছাত, সহজলভ্য করে পেঁাছে দেবার ব্যবস্থা থাকত তাহলে পরে আজকের জাতপাতের যে দ্বন্দ্ব, যে লড়াই গোটা ভারতবর্ষ ব্যাপী চলছে,—বিশেষ করে তাঁর কর্ম, তাঁর লেখা এই সবের মধ্য থেকে এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের আমরা একটা হাতিয়ার পেতে পারতাম। আমাদের সমগ্র দেশে আজও ড. আম্বেদকরের স্বপ্ন সফল হওয়ার পথে অনেক বাঁধা এবং প্রতিনিয়ত এই অবমাননাকর জীবন সমাজের একটা অংশের মানুষকে ভোগ করতে হচ্ছে। আমরা সকলে মিলে অর্থনৈতিক বৈষম্য—অসাম্য—ইত্যাদির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সাথে সাথে ড. আম্বেদকরের লেখা,—আম্বেদকরের রচনা এগুলিকে সামনে নিয়ে তাঁর স্বপ্ন সফল করার জন্য যদি এগিয়ে যেতে না পারি, তাহলে ভারতবর্ষ আগামীদিনে এগিয়ে যেতে যে পারবে না এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। সংরক্ষণের বিষয়ে তপসিলী জাতি এবং আদিবাসী মানুষদের জন্য সংবিধানে অনেক অধিকার দেওয়া আছে। কিন্তু আমরা সত্যিকারে যদি দেখি সমাজের যাদের সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন সে হ'ল তফসিলী সমাজের মধ্যেও যারা সব চেয়ে বেশী পিছনে পড়ে আছে সেই আদিবাসী সমাজের। আবার তাদের মধ্যে যারা সব থেকে পিছনে পড়ে আছে তাদের কাছে কি এই সংবিধানের সুযোগ সুবিধাগুলো সঠিকভাবে পেঁাছাচ্ছে—এ প্রশ্ন উঠতেই পারে !

আমাদের ভাবতে হবে এইভাবে যদি চলতে থাকে তাহলে এই অস্পৃশ্যতা, অসাম্য, সামাজিক বৈষম্যগুলি আমরা কতটা দূর করতে পারব ? গভীরভাবে বিচার বিশ্লেষণ করার মধ্য দিয়ে আমাদের আগামী দিনে ভাবতে হবে যে আমাদের কোন কোন জায়গায় পরিবর্তন করা প্রয়োজন এবং নীচুতলার মানুষকে সত্যিকারের মর্যাদার আসনে আমরা কিভাবে প্রতিষ্ঠিত করবো। ড. আম্বেদকরের শিক্ষাকে সামনে রেখে এই বিষয়গুলিকে আমাদের ভাবতে হবে। আজকে ড. আম্বেদকরের ১০২তম জন্মদিনে আমাদের এই শপথই নিতে হবে যে আমাদের সমাজের বুকে অস্পৃশ্যতাকে জীইয়ে রেখে যে কায়েমী স্বার্থের মানুষ নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করার চেষ্টা করছে তাদের বিরুদ্ধে সকলকে সমবেতভাবে সংগ্রাম করতে হবে। নিশ্চিতভাবে আমরা সকলে আজকে সেই শপথ নেব।

CENTRAL LIBRARY

□ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

আম্বেদকর চিরকাল আমাদের শ্রদ্ধার আসনে ছিলেন এবং থাকবেন

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই, তিনি আমাদের এই কর্মসূচীতে নিজে উপস্থিত থেকে সামগ্রিক ভাবে আমাদের উৎসাহিত করেছেন এবং তাঁর বক্তব্য, আমাদের সমৃদ্ধ করেছে। আমার দুই সহকর্মী মন্ত্রী তাঁরা বক্তব্য রেখেছেন এবং আমাদের এখানে আজকের বিশেষ অতিথি শ্রী কান্তি বিশ্বাস আমাদের কাছে সুচিন্চিত বক্তব্য রেখেছেন। আমি আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই। আপনারা জানেন আমাদের সারা দেশে দুবছর ধরে আম্বেদকর-শতবর্ষ পালিত হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার ও করছেন। তারা আমাদের কাছেও বিভিন্নভাবে বলেছেন এবং আমরাও রাজ্যসরকারের পক্ষ থেকে ড. আম্বেদকরের জন্মশতবার্ষিকীতে বিশেষ কয়েকটি কর্মসূচী নিয়েছি। কিন্তু আমাদের রাজ্যে, আমাদের যে সরকার এবং তার যে কর্মসূচী, এবং আমাদের যে দৃষ্টিকোণ—তাতে আম্বেদকর কে স্মরণ করা আমাদের কাছে কোন প্রতীকী ব্যাপার নয় বা কোন মৌসুমী কর্মসূচী মাত্রও নয়। কারণ আমাদের সুনির্দ্দিষ্ট কর্মসূচীর রূপায়ণের মাধ্যমেই আমরা তা করে চলেছি। আপনারা জানেন ইতিমধ্যে আমাদের মুখমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন আমরা বিধানসভার প্রাঙ্গনের মধ্যে আম্বেদকরের মূর্তি স্থাপন করতে চলেছি। আমাদের রাজ্যে গত বৎসর আমরা সুচিন্তিত একটি সেমিনার করেছিলাম, **'আম্বেদকরের চিন্তা ও বর্তমান ভারতীয় সমাজের প্রেক্ষাপট''** বিষয়ে। সেই সেমিনারের সমস্ত বক্তব্যগুলি আমরা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চাই ; তাই খুব অল্পদিনের মধ্যে সেই পুস্তকটি আমরা বের করব। এছাড়া আজকে আমাদের অন্যতম একজন বক্তা আমাদের সহকর্মী তফসিলী জাতি উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বলেছেন ড. আম্বেদকরের জীবনী এবং তাঁর চিন্তার উপর একটি বইও আমরা অল্পকিছু দিনের মধ্যে প্রকাশ করব। এই কাজগুলি আমরা করছি। কিন্তু আমরা জানি যে এটা কয়েক মাস বা একটা বছরের কর্মসূচী মাত্র নয়, আমাদের সংশ্লিষ্ট অনেকগুলি বিভাগকে নিয়ে আমরা একটি কমিটি গঠন করেছি। যেখানে আছে আমাদের পঞ্চায়েত দপ্তর, ভূমিসংস্কার দপ্তর, নগর উন্নয়ন দপ্তর, সংস্কৃতি দপ্তর, শিক্ষা দপ্তর, এবং সর্বোপরি তফসীলী জাতি উপজাতি কল্যাণ দপ্তর।

আম্বেদকর ভারতবর্ষের রাজনীতিতে, সমাজচিন্তায় তথা সমাজ দর্শনে একটি দ্বন্দ্বের কথা, একটা বৈপরীত্যের কথা সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে দেখিয়ে গিয়েছিলেন। এটা হচ্ছে আমাদের জাতীয় নেতাদের মধ্যে তাঁর বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তিনি দেখিয়ে গিয়েছিলেন সমাজের পশ্চাদপদ-অংশের মানুষের সামনে যে সমস্যা রয়েছে তা শুধু

তাঁদের জন্য ক্ষমতা সংরক্ষণ করে কিংবা চাকরী সংরক্ষণ বা নির্বাচনী কেন্দ্র সংরক্ষণ করে সমাধান করা যাবেনা। এটা হচ্ছে সামগ্রিকভাবে আর্থিক, সামাজিক, শিক্ষাগত তথা সংস্কৃতিগত একটা সংগ্রাম। সামগ্রিক একটা দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের ফলাফল ছাড়া আমরা এই দ্বন্দ্বের ; এই বৈষম্যের সমাধান করতে পারবোনা। সেই কারণে আমাদের সামনে বড় প্রশ্ন আমাদের রাজ্যে যখন ভূমি সংস্কার হবে—জমি যখন আমরা বিতরণ করবো ; কার হাতে সেই জমি যাবে ? পঞ্চায়েতে যখন উন্নয়ন কর্মসূচী রূপায়িত হবে, সেই উন্নয়ন কর্মসূচীর সুযোগ কারা পাবেন ? যখন আমরা গ্রাম অঞ্চলে বা শহরাঞ্চলে গরিব মানুষের জন্য কিছু বাড়ী করতে পারবো তখন সেই সুযোগ কারা পাবেন ? শিক্ষার ক্ষেত্রে যে ছাত্ররা অনেক পিছিয়ে আছে—তারা একটু অতিরিক্ত সুযোগ পাবে কিনা ; তারা অতিরিক্ত বৃত্তি পাবে কিনা ? অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে এই কর্মসূচী গুলিই হচ্ছে আসল কর্মসূচী। আমরা সেই দিকেই নজর রাখার চেষ্টা করেছি। আমাদের রাজ্যে সেই কারণে সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলি গ্রাম উন্নয়নের প্রশ্নে, পঞ্চায়েতের বা গ্রামের কাজের প্রশ্নে, জমি বিলির প্রশ্নে আমাদের তফসিলী জাতি এবং উপজাতিদের প্রতি দায় দায়িত্ব সম্পর্কে আমরা সতর্ক। এই সব কর্মসূচী গ্রহণ, রূপায়ণ ও তার সাফল্যের উপর দাঁড়িয়ে থাকবে আমাদের দৃষ্টিকোণ। আমাদের শহরে এবং গ্রামাঞ্চলে বাস্তুভিটা তৈরী করার জন্য যে কর্মসূচী সেই কর্মসূচীর ও সাফল্য নির্ভর করছে এই সব প্রশ্নের যথাযথ উত্তরের মধ্যে। এছাড়া শিক্ষাক্ষেত্রে, সংস্কৃতি ক্ষেত্রে আমরা যা করতে চাইছি তাও এমনি একটা জনকল্যাণমুখী দৃষ্টিকোণে। আমরা জানি যে আজকের পশ্চিমবাংলায় নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে একটা সংগ্রাম আমরা করতে চাইছি, যে মানুষ স্কুলের সুযোগ পাননি আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ পাননি সেই মানুষের কাছে আমরা যদি শিক্ষার এই সুযোগ পৌঁছে দিতে পারি তবে এটাই হচ্ছে আসল কাজ। আমরা জানি যে সাংস্কৃতিক যেসব কর্মসূচী বা উৎসবাদি আমরা কলকাতা শহরে করি অর্থাৎ এইসব যে নাগরিক সংস্কৃতি তার পাশাপাশি আমরা যদি গ্রামীণ লোক-সংস্কৃতির বিশেষ ধারাগুলিকে একইভাবে গুরুত্ব না দিতে পারি তাহলে সত্যিকারের আম্বেদকরের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার ঘাটতি থেকে যাবে। এই হচ্ছে আমাদের কর্মসূচী এবং এই বছর বা বিগত বছরগুলিতেও যেমন চেষ্টা করেছি সেইভাবে আগামী-দিনেও আমাদের এইসব কর্মসূচী নির্দিষ্ট থাকবে। আমরা বামপন্থীরা যে নীতি ও যে কর্মসূচীর উপর ভিত্তি করে এগোতে চাইছি, সেইখানে আম্বেদকর চিরকাল আমাদের সামনে শ্রদ্ধার আসনে ছিলেন এবং শ্রদ্ধার আসনে থাকবেন।

---

১১ মে, ৯২' শিশির মঞ্চ। পশ্চিমবঙ্গ সরকার আয়োজিত ড. বি, আর আম্বেদকরের ১০২ তম জন্ম বার্ষিকী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ভাষণ।

□ সুনীলকুমার লাহিড়ী

বর্ণভেদ, ভারতীয় সংবিধান ও আম্বেদকর

যে মানুষটিকে নিয়ে এই নিবন্ধ, আজ থেকে চল্লিশ বছর আগেও তিনি সনাতন হিন্দু সমাজের শোষণ পিষ্ট এক বিরাট জনতার মুক্তির জন্য তীব্র, তির্যক গতিতে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছেন। তাঁর দৃপ্ত স্বপ্ন ছিল স্বাধীন ভারতবর্ষে তিনি এমন এক সংবিধান প্রবর্তন করে যাবেন, যার ফলে দীর্ঘদিনের অধিকার-বঞ্চিত সর্ব-শ্রেণীর মানুষ কায়, মন ও বাক্যের স্বাধীনতা ভোগ করবে, যেখানে প্রতিটি মানুষের প্রধান পরিচয় হবে ভারতবাসী হিসাবে।

আম্বেদকরের সেই স্বপ্ন সফল হয়নি, সংবিধানে তাঁর সমস্ত ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি, সমাজতন্ত্রের যেটুকু ধারণা সংবিধানে ছিল তা মরীচিকার মত ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে। আজ তাঁর মৃত্যুর মাত্র পঁয়ত্রিশ বৎসরের মধ্যে তাঁর কাজের মূল্যায়ন কতটা নিরপেক্ষ হবে তা বলা শক্ত, তবু ভবিষৎকালের জন্যও সেই মূল্যায়ণের প্রয়াস করা উচিত। এই নিবন্ধে সেই মানবিক আম্বেদকরের কথা বলা হচ্ছে।

আম্বেদকর যে সময়ে ও যে অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেই সময়ে সেই মহারাষ্ট্রীয় ভারতবর্ষে হিন্দুদের মধ্যে বর্ণভেদ প্রথা অত্যন্ত নগ্ন ও প্রবল ছিল। আম্বেদকরের চেষ্টায় রচিত ভারতীয় সংবিধানে অস্পৃশ্যতার চর্চা ও প্রচারণা দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হয়েছে, ফলে বর্ণভেদের নগ্নতা কিছুটা প্রশমিত হয়েছে, এবং শিল্পপ্রসারের ফলস্বরূপ তার প্রাবল্যও কিছুটা কমেছে, কিন্তু কোনটাই একেবারে অদৃশ্য হয় নি। যে মহারাষ্ট্রে শিবসেনাদল মহারাষ্ট্রের হিন্দু অধিবাসীদের জন্য কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করে, সেই মহারাষ্ট্রেই সাচ্চা মারাঠীদের মধ্যেই যারা সর্বনিম্নবর্ণের হিন্দু, তারা অনেক জায়গাতেই উচ্চবর্ণের জন্য নির্দিষ্ট কূপ থেকে জল তুলতে পারে না, উচ্চবর্ণের সঙ্গে একই অঞ্চলে বাস করতে পারে না, বা পঞ্চায়েতে প্রতিনিধির আসনে বসতে পারে না।

ভারতীয় সংবিধানে হিন্দুদের বর্ণবিভেদকে মোটা দাগে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে, উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণ। সিডিউল্ড কাষ্ট ও সিডিউল্ড ট্রাইব সংজ্ঞা দিয়ে আমরা নিম্নবর্ণদের সেই সংজ্ঞার গণ্ডীতে আবদ্ধ করে ফেলেছি। অবশ্য ও. বি. সি. (other backword classes) বলে মাঝামাঝি এক শ্রেণী গড়বার ব্যবস্থাও আছে।

কিন্তু সিডিউল্ড কাষ্ট ও ট্রাইবের ভিতরেও আছে অজস্র স্তর বিন্যাস। এমনকি যে অস্পৃশ্য মাহার সম্প্রদায়ে আম্বেদকরের জন্ম, তার মধ্যেও ভিন্ন ভিন্ন স্তর আছে, সেখানে জল-চল, জল-অচলের ব্যাপার আছে, বিভিন্ন স্তরের মধ্যে বিবাহ চলে না।

বাবা সেনাবাহিনীর সুবেদার (অর্থাৎ তখন দেশজ সৈন্যদের সর্বোচ্চ পদ)

হওয়ার সুবাদে আম্বেদকর বিদ্যালয়ে পাঠের সুযোগ পেলেন, কিন্তু শ্রেণীকক্ষে তাঁর ঠাঁই মিলল না, অধিকার জুটল না শিক্ষককে প্রশ্ন করবার। পড়াশুনা করে সর্বোচ্চ ডিগ্রী পেয়ে তিনি যখন কলেজে অধ্যাপনা করতে গেলেন, তখন তাঁর জল রাখা হ'ল অন্য কলসীতে, অন্যান্য শিক্ষকদের জলের কলসী তাঁর স্পর্শের অধিকার ছিল না। অস্পৃশ্যতার এই যে লাঞ্ছনা অপমানের স্মৃতি তাঁকে সারা জীবন তাড়া করে ফিরেছে। এই অপমান আবার তাঁকে দৃঢ়তাও দিয়েছে।

বিখ্যাত ব্যক্তিদের জীবনীর আকর-গ্রন্থ "who's who"-তে তাঁর জীবনী পাঠানোর অনুরোধে তিনি যে রচনা পাঠান তার শুরু হয় এই ভাবে—আম্বেদকর, বি. আর. জাতিতে অস্পৃশ্য। স্ত্রীর পরিচয় তিনি দিলেন এইভাবে,—ড. সারদা কবীর, জাতিতে ব্রাহ্মণ।

ধর্মের নামে মনুষ্যত্বের এই অপমান কিন্তু আম্বেদকরকে ধর্মদ্বেষী করে নি, তীব্র ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী করেছিল।

নিম্নবর্ণের উদ্ভবের কারণ সম্বন্ধে যে তত্ত্ব প্রচলিত ছিল ও এখনও আছে, তাতে বলা হয় নিম্নবর্ণের উৎপত্তি ব্রহ্মার পাদদেশ থেকে। এটি যে গল্প কথা মাত্র তা' অতি মূর্খও জানে, কিন্তু অসত্য বলে সবাই স্বীকার করেনা। বিভিন্ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করে আম্বেদকর যে তত্ত্ব প্রচার করেন তাতে বলেন যে বর্ণবাদের উৎপত্তি মাত্র পঞ্চম শতকে। ভারতে আগন্তুক বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষে যে সমস্ত গোষ্ঠী পরাস্ত ও বিধ্বস্ত হয়েছিল তারা ইতি-উতি ঘুরে বেড়াতে থাকে, খণ্ড খণ্ডে বিভক্ত হয়ে। বিজয়ী গোষ্ঠীগুলি যখন স্থিতিশীল হয়ে বসল তখন এই খণ্ড বিখণ্ড পরাভূত মানুষগুলি তাদের সমাজে ঠাঁই পেল না, তারাই শূদ্র হয়ে গেল। মোটা-দাগে আম্বেদকর সমস্ত হিন্দু ভারতবাসীকে তিন ভাগে ভাগ করলেন, ব্রাহ্মণ, অব্রাহ্মণ ও অস্পৃশ্য। বর্ণভেদের ভিত্তি প্রোথিত আছে শোষণের মধ্যে, সেখানে এক শ্রেণী বুদ্ধি, রচনা, প্রবচন, শ্লোক, ইত্যাদি দিয়ে পুজার্চনার মধ্য দিয়ে একটা ভয়ের ঘেরাটোপ সৃষ্টি করে সেই ব্যবস্থাকে বজায় রাখতেন। এই ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতদের বিরুদ্ধে আম্বেদকরের বিরূপতা ছিল প্রচণ্ড, কারণ এদের ব্যবহারকে তিনি সাধারণ মানব-ধর্ম (ধম্ম) বিরোধী বলে বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি যখন ভারতবর্ষের আইন-মন্ত্রী, তখন তাঁর এক মার্কিন বন্ধু ভিনসেণ্ট শীনকে (Vincent Shean) বলেছিলেন, ভারত সরকার ব্রাহ্মণদের সরকার। এই ব্রাহ্মণ বলতে তিনি অবশ্য উপবীতধারী ব্রাহ্মণদের কথাই শুধু বলেন নি, যে সমস্ত রক্ষণশীল হিন্দু লোকসভায় এবং মন্ত্রীসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন তাদের দিকেই লক্ষ্য ছিল তাঁর। ভারত-সরকারের প্রশংসা করায় তিনি শীনকে বলেন যে শীন এই ব্রাহ্মণ সরকারকে খোল-নলচে সমেত আমেরিকায় নিয়ে চলে যেতে পারেন।

ভারতবর্ষের অধিকাংশ মানুষ যে হিন্দু, অতএব হিন্দুধর্মকে সরাসরি আক্রমণ করলে তা হবে আত্মহত্যারই নামান্তর, তাতে মানুষে মানুষে বিভেদ বাড়বে, ভারতবর্ষ ভেঙে শতধা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, এটি আম্বেদকরের উপলব্ধিতে ছিল।

তিনি বিভেদ কমাতে চেয়েছিলেন, ঐক্যকে দৃঢ়মূল করতে চেয়েছিলেন। মিলনের সেতুবন্ধনে তাঁর কতকগুলি ধ্যান-ধারণা ছিল, হয়তো সেগুলি আজও অনেকের কাছে অবাস্তব মনে হতে পারে, তবু এগুলি তাঁর আন্তরিক প্রত্যয় থেকেই এসেছিল। তিনি অসবর্ণ বিবাহ, একত্রে আহার এবং সর্বশ্রেণী থেকে পুরোহিত নিয়োগ ও পুরোহিতদের যোগ্যতার লাইসেন্সের পদ্ধতি প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন। এটা সত্য যে তাঁর প্রস্তাবে শুধু বর্ণ হিন্দুরাই নয়, নিম্নবর্ণের হিন্দুরাও রাজী হন নি। যুগ-যুগান্তের শৃঙ্খলিত মন এত বিপ্লবী চিন্তাকে গ্রহণ করে নি।

আম্বেদকরকে আজও নিম্নবর্ণের হিন্দুদের নেতা মাত্র বলে অনেকে জানেন। একথাও ঠিক যে তিনি তাঁর রাজনীতির জীবন শুরু করেছিলেন নিম্নবর্ণের হিন্দুদের বর্ণ-ভেদ মুক্তির আন্দোলনের মধ্য দিয়ে, এবং শেষও করেছিলেন সেখানেই। সেই আমলে কংগ্রেসের নেতৃত্বে স্বাধীনতা আন্দোলন নিত্য নূতন রূপ নিচ্ছে। কিন্তু সেই আন্দোলনের নেতৃত্ব ছিল বর্ণহিন্দুদের হাতে, তাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ছিলেন, কিন্তু সেই স্তরের কোন নিম্নবর্ণের হিন্দু ছিলেন না। আন্দোলনের সংগঠকেরা নিশ্চয় চেষ্টা করেছেন ও আন্দোলনকে সর্ববর্ণের সর্বধর্মের মুক্তির আন্দোলনে পরিণত করতে, কিন্তু যুগ যুগ ধরে নিম্নবর্ণের মানুষগুলির অপমানের প্রত্যক্ষ জ্বালা তাঁদের সহ্য করতে হয়নি। কাজেই তার প্রতিক্ষণের অভিজ্ঞতায় তাঁদের ঘাটতি ছিল। গান্ধীজী নিম্নবর্ণের মানুষদের মানুষ হিসাবে ভাবতে পেরেছিলেন, কিন্তু তিনিও উচ্চবর্ণের মানুষ ছিলেন, এবং যুগ-যুগান্তরের ধর্ম, সংস্কারে রক্ষণশীল বিশ্বাস তাঁকে এই ধারণা দিয়েছিল যে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা নিম্নবর্ণের হিন্দুদের রক্ষক হিসাবে কাজ করবেন যতদিন না সমাজের হৃদয়ের পরিবর্তন আসে। আম্বেদকর এদের থেকে ভিন্ন। তিনি নিজস্ব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় বর্ণভেদের অমানবিক অপমানের জ্বালার গভীরতা জানতেন। স্বাধীনতা পাওয়া পর্যন্ত বর্ণভেদের সমস্যাকে চাপা দিয়ে রেখে, স্বাধীনতা পেলে সব ঠিক করে ফেলা যাবে—এবিশ্বাস তাঁর ছিল না। গান্ধীজীর সৃষ্ট 'হরিজন' শব্দটি আম্বেদকর ও তাঁর অনুবর্তীদের কাছে অপমানকর মনে হয়েছিল। যে ধর্মের নামে এক শ্রেণীর হিন্দুকে পদপিষ্ট রাখা হয়েছে, যত নোংরা, অপমানকর কাজের দায়িত্ব তাদের মাথার উপরে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ছিল তীব্র। হরি-র জন হিসাবে নিম্নশ্রেণীর মানুষকে ঘোষণা করার অর্থ দাঁড়িয়েছিল অপমানকে আরও সুপ্রতিষ্ঠিত করা, ধর্মের দাক্ষিণ্যের দান হিসাবে। তাই বোম্বাই বিধানসভায় আম্বেদকরের অনুবর্তী এক বিধায়ক বলেছিলেন, আমরা যদি হরিজন, তবে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা কি 'শয়তানের জন ?' স্বাধীনতা আন্দোলনের দর্শনে ও চিন্তনে এই যে এক বিরাট ফাঁকি তা ধরা পড়ে গিয়েছিল বলেই আম্বেদকর বর্ণভেদ বিরোধী আন্দোলনকে এত অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন ; তাঁর অর্থনৈতিক অবস্থা সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক ভাল হলেও সেটা তাঁর সংগঠন গড়ার পথে যে মানুষগুলির জন্য তিনি কাজ করতে চেয়েছিলেন তাদের মনে কোন সন্দেহের সৃষ্টি করেনি, যদিও বহু নিবেদিত প্রাণ

কংগ্রেসের কাছে তিনি সেই সন্দেহের শিকার হয়েছেন। স্বয়ং গান্ধীজী আম্বেদকরের ভূমিকার বিরোধিতা করে হরিজন পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখেছিলেন। অনেকে তাঁকে স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধী বলে অভিহিত করেছিলেন। আরও অনেকে তাঁকে আক্রমণ করেছিলেন তিনি হিন্দুদের সমাজকে বহুধা বিভক্ত করে দিচ্ছেন বলে। তবু আম্বেদকর নিজের বিশ্বাসে অটুট থেকেছেন ও এক বিপুল সংখ্যক নিম্নবর্ণীয় মানুষ তাঁর উপরে নিজেদের বিশ্বাসকে অটল রেখেছেন।

আম্বেদকর ইতিহাস, ধর্মশাস্ত্র, অর্থনীতি, আইন, সবই আগ্রাসী হয়ে পড়েছিলেন তার ফলে তাঁর সমৃদ্ধ চেতনা কিন্তু বর্ণভেদের আড়ালে শোষণের রূপটাকে বুঝতে পেরেছিল। তিনি বর্ণভেদের সঙ্গে কৃষিজীবনের, জমির মালিকানার যে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক তা বিজ্ঞানসম্মত ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তাঁর বহু দাবীর মধ্যে একটি দাবী ছিল যে সমস্ত-জমি রাষ্ট্রের হাতে বর্তাবে (অবশ্যই মালিকদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে), এবং সেই জমি সমবায়ের মাধ্যমে কৃষকদের কাছে বিলি করা হবে। পাশ্চাত্য উদারনীতির এই ভাবধারা পাশ্চাত্যশিক্ষায় শিক্ষিত আম্বেদকরকে আজীবন প্রভাবিত করেছে। কিন্তু এটি যে শিল্পোন্নয়নের একটি মূল শর্ত, এটি তিনি তুলে ধরেননি। এছাড়া, যুগযুগের শোষণের বলির মধ্যে যে বহু বর্ণহিন্দুও আছে এই তথ্যও তিনি সর্বত্র বলেন নি।

গান্ধীজীর সঙ্গে আম্বেদকরের সম্পর্কের সংজ্ঞা নির্ণয় করা শক্ত। আম্বেদকরের পাণ্ডিত্যে গান্ধী শ্রদ্ধাবান ছিলেন কিন্তু নিম্নবর্ণের মানুষের হৃদয় জয়ের ব্যাপারে তিনি আম্বেদকরকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করতেন। আম্বেদকর গান্ধীজীকে প্রতিক্রিয়াশীল এবং বর্ণহিন্দুদের মুখপাত্র বলতে ছাড়েননি, কিন্তু তবু গান্ধীর নিষ্ঠাকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের গোলটেবিল বৈঠকের আগে গান্ধীজী কংগ্রেসকে সমস্ত ভারতীয়ের প্রতিনিধি হিসাবে দাবী করেছিলেন। জিন্না কংগ্রেসকে মুসলমানদের প্রতিনিধি হিসাবে স্বীকার করলেন না। এবং আম্বেদকরও স্বীকার করলেন না যে কংগ্রেস তফসিলী জাতির প্রতিনিধিত্ব করে। গোলটেবিল বৈঠকে যখন জাতি ও বর্ণের ভিত্তিতে নির্বাচক মণ্ডলীকে ভাগ করার সিদ্ধান্ত হ'ল, তখন গান্ধীজী অনশন করলেন। আম্বেদকর প্রথমদিকে তাতে সাড়া না দিলেও যখন দেশব্যাপী আলোড়ন শুরু হ'ল তখন সেই চাপের কাছে মাথা নীচু করলেন, কিন্তু মাথা মুড়ালেন না। তিনি পৃথক নির্বাচক মণ্ডলীর দাবী তুলে নিলেন বটে কিন্তু তপসিলী জাতি ও উপজাতির জন্য সংরক্ষিত আসন আদায় করলেন। এই ঘটনাকে ক্ষুব্ধ আম্বেদকর তাঁর রাজনৈতিক পরাজয় বলে স্বীকার করেছেন অথচ বিশের দশকে তিনি নিজেই পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর বিরোধী ছিলেন। গোলটেবিল বৈঠকের সময়ে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল যে তিনি জিন্নার সঙ্গে হাত মিলিয়ে ছিলেন ; নিশ্চয় মিলিয়ে ছিলেন। কিন্তু তাঁর নিজের মূল্যবোধ ও ভাবনার সঙ্গে কাজে অসঙ্গতি ছিল কিনা সেটা চিন্তনীয়। উদারনৈতিক মানবতাবাদী আম্বেদকর মনে করতেন মানুষের মূল্য সবার উপরে, কাজেই যদি মুসলমানেরা হিন্দুদের সঙ্গে একত্র না থাকতে চায়, তবে

P2-3343

তাদের জোর করে ধরে-রাখলে লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশী হবে এই উপলব্ধি থেকেই তিনি পাকিস্তানকে সমর্থন করেন।

কালো মানুষদের ক্রীতদাসত্বের বিরুদ্ধে আন্দোলনের নেতা আব্রাহাম লিঙ্কন কালো মানুষদের মনের কথা সুন্দর করে বলেছিলেন, "আমাদের প্রভু হওয়াটা তোমাদের স্বার্থ হতে পারে কিন্তু তোমাদের ক্রীতদাস হওয়াটা যে আমাদের স্বার্থে—এটা কি করে সম্ভব।" আম্বেদকরও এই ভাবনাকেই ভারতবর্ষের জাতপাত ধর্মের আবহাওয়াতে বারবার সোচ্চারে বলেছেন। অথচ, ঐক্যবদ্ধ ভারতের ধারণা যে তাঁর কি গভীর ছিল তা বুঝতে পারা যায় যখন দেখা যায় যে জিন্না নিম্নবর্ণের হিন্দুদের সহানুভূতি পাওয়ার জন্য পাকিস্তান, শিখিস্তানের সঙ্গে অচ্ছুৎস্তান বলে এক অঞ্চলের দাবির কথা যখন আম্বেদকরকে বলেন, আম্বেদকর তাকে পাত্তা দেননি। সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ আম্বেদকরকে খাঁটি দেশপ্রেমিক বলেছেন এই কারণেই। আম্বেদকরের কাছে, হিন্দু, মুসলিম, সিন্ধী, মাদ্রাজী (তখন এই অভিধা বহুল প্রচলিত) সকলেই তাদের বৃহত্তর পরিচয়ে ভারতবাসী।

এই ভারতবাসীদের মধ্যে অস্পৃশ্য-ইতরদের অবস্থিতি স্থান ও কালের মানচিত্রে কোথায় তা-ও আম্বেদকরের গবেষণায় আছে। পূর্বেই বলা হয়েছে, আম্বেদকররের মতে গোষ্ঠী সংঘর্ষে পরাভূত, বিধ্বস্ত খণ্ড বিখণ্ড গোষ্ঠীর—অবশেষ গুলি, নিরাপদ আশ্রয় ও খাদ্যের সন্ধানে ইতস্ততঃ পরিব্রাজন করে বেড়াত। তারাই বৌদ্ধ হয়ে মূল হিন্দুসমাজ থেকে বহিষ্কৃত, নিম্ন, অন্ত্য শ্রেণী হয়ে যায় এবং তারা ভারতবর্ষের আদি ভারতবাসীদের মধ্যে অন্যতম। ক্রমে ধর্মের বিভিন্নতা যখন যুগ-পরিবর্তনের স্রোতে শিথিল হয়ে যায়। বুদ্ধও যখন হিন্দু অবতারকুলে ঠাঁই পান, তখন এরাও হিন্দু সমাজেই সমাজ-বিচ্যুত অথচ সমাজের কাছে অতীব প্রয়োজনীয় একটি অঙ্গ হিসাবে প্রবিষ্ট হয়—এরা মেথর, মুচি, মুর্দাফরাস ইত্যাদি ; হিন্দু বর্ণাশ্রমের চতুর্বর্ণেরও বাইরে এরা পঞ্চম। আম্বেদকরের সংগ্রাম এদের মানুষ হিসাবে প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। এই সংগ্রামের পরিণতি কিন্তু এক বৃহত্তর সংগ্রামে—ভারতবর্ষের প্রতিটি মানুষের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার ব্রতে। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের এক ভাষণে তিনি বলেন, "এই দেশ জাতি-বর্ণে বহুবিভক্ত, এবং সংবিধানে যদি সংখ্যালঘুদের রক্ষামূলক ব্যবস্থা না থাকে তবে এই দেশ একটি ঐক্যবদ্ধ স্বরাজ হতে পারবে না এই তত্ত্ব বিতর্কের অপেক্ষা করে না। কিন্তু সংখ্যালঘুদেরও মনে রাখতে হবে যে আমাদের যত বিভেদ বিচ্ছিন্নতাই থাকুক, ঐক্যবদ্ধ ভারতই আমাদের আদর্শ। কাজেই সংখ্যালঘুদের রক্ষণাত্মক যে ধারা আমরা রাখব তা ভারতবর্ষের ঐক্যের আদর্শের বিরোধী হবে না।" অর্থাৎ সমাজ বিভাগের বিশ্লেষণে তিনি ধর্ম-বর্ণ-জাতিকে যে গুরুত্ব দিয়েছেন শোষক ও শোষিতের অর্থনৈতিক বিভেদের বড় পটভূমিকে তিনি ততটা গুরুত্ব দেননি।

এই ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষ প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি জোর দিয়েছিলেন মানুষের মূল্যের উপরে। তাঁর গণতান্ত্রিক-সমাজতন্ত্রের ধারণার ভিত্তি এখানেই। তাঁর বিশ্বাস মত একটি মানুষের জন্য একটি ভোট (one man one vote) গণতন্ত্রের মূল, কিন্তু ভারতবর্ষের সংস্কার জীর্ণ-সমাজে এই অধিকার যথেষ্ট নয়, কারণ আতঙ্কের

অন্ধকারে দেওয়া ভোট, ভোটদাতার ইচ্ছার সঠিক নির্দেশিকা না-ও হতে পারে, যা আজ আমরা দেখছি। তাই, এর উপরে যা প্রয়োজন তা হল প্রতিটি মানুষের সমান মূল্য (one man one value), যা হচ্ছে সমাজতন্ত্রের নীতি। এই দুই মিলিয়েই সৃষ্টি হতে পারে এক গণতান্ত্রিক-সমাজতন্ত্র। এই অধিকার দেবার জন্য তাঁর মতে রাষ্ট্র হবে একটি সংগঠন, বা (১) প্রতিটি নাগরিকের প্রাণ, স্বাধীনতা, সুখের অনুসরণ, বাক্যের স্বাধীনতা ও ধর্মচারণের স্বাধীনতা নিশ্চিত করবে ; (২) নিম্নবর্গীয় মানুষকে বাড়তি সুযোগ দিয়ে সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য দূর করবে, এবং (৩) প্রতিটি নাগরিকের জন্য সুনিশ্চিত করবে অভাব থেকে মুক্তি ও ভয় থেকে মুক্তি। তাঁর দৃষ্টিতে আইনের ভূমিকা হবে সাম্য ও স্বাধীনতাকে রক্ষা করা। মূল দায়িত্ব কিন্তু সমাজের বা সমাজের সংখ্যাগুরু অংশের ; আইন তাদের সঠিক পথ দেখাবে মাত্র। এইখানে তাঁর মার্কস্‌বাদের সঙ্গে বিরোধ। তিনি হৃদয়ের পরিবর্তনে বিশ্বাসী ছিলেন—বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনে নয়। তাঁর বিশ্বাস ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। তাছাড়া সমাজের এই হৃদয়ের পরিবর্তনের জন্য আম্বেদকর বৃথাই অপেক্ষা করে গেছেন। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি তাঁর অনুগামীদের নিয়ে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করবেন। কারণ তাঁর মতে সেখানে বর্ণ-ভেদ নেই, নেই মিথ্যা শতকোটি পরস্পর বিরোধী শাস্ত্র, স্মৃতি, শ্রুতির প্রভাব, নেই তেত্রিশ কোটি দেবতার নামে নিষেধাজ্ঞা আর শোষণ। কিন্তু মানবধর্মে বিশ্বাসের প্রবক্তা আম্বেদকর তা করেন নি, অপেক্ষা করে থেকেছেন।

অবশেষে সুযোগ এল। কথিত আছে যে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল সংবিধানের মুসাবিদ কমিটি (drafting Commitee)-তে আম্বেদকরের নাম সদস্য হিসাবে প্রস্তাব করেন। সর্দার প্যাটেল বোম্বাই-গুজরাটে কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, ফলে তিনি আম্বেদকরের পাণ্ডিত্য ও দক্ষতা সম্বন্ধে জানতেন। আম্বেদকর কমিটির সভাপতি হলেন। কিন্তু প্রথম থেকেই তিনি সচেতন ছিলেন যে গণপরিষদে যারা সভ্য হয়ে এসেছিলেন তাদের অধিকাংশই ছিলেন রক্ষণশীল হিন্দুধর্মের চিন্তাধারায় পরিপুষ্ট মানুষ, কাজেই প্রগতিশীল ধারাগুলিকে পাস করাতে গেলে বাধা আসবে। তার প্রমাণও তিনি পেলেন।

যখন তিনি আইন-প্রণয়নের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত আইনের সুযোগ-সুবিধা তুলে দিয়ে জাতি-ধর্ম, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সব ভারতীয়ের জন্য একই দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন প্রণয়নের প্রস্তাব করলেন, সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য হ'ল। আম্বেদকরের এই প্রস্তাব গৃহীত হ'লে আজ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের স্ত্রীজাতির প্রতি বৈষম্য অবলুপ্তির একটা পন্থা থাকত। কিন্তু পুরুষপ্রধান সমাজের প্রতিনিধিরা স্ত্রীলোককে সেই অধিকার দিল না।

বিভিন্ন সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর জন্য তিনি প্রস্তাব করলেন দীর্ঘ-মেয়াদী সুবিধা-দানের জন্য, যাতে নিম্নবর্গীয় মানুষ ক্রমে ক্রমে উচ্চবর্গীয়দের স্তরে পৌঁছাতে পারে, এবং তার পরে এই বিশেষ সুবিধাগুলি লোপ করা যায়। কিন্তু সংখ্যাধিক্যের প্রভাবে এই অধিকার মাত্র দশ বৎসরের জন্য লিপিবদ্ধ হ'ল।

আইনের পাতায় যা লেখা থাকুক, প্রশাসনের সদিচ্ছা না থাকলে তা বলবৎ হয় না, এটা আম্বেদকর উপলব্ধি করেছিলেন, এবং সরকার যে সমস্ত মানুষকে নিয়ে গঠিত তাদের চরিত্র সম্বন্ধেও তিনি সচেতন ছিলেন। গান্ধীজী চেয়েছিলেন যে লোকসভায় রাজন্যদের মনোনীত প্রতিনিধি থাকবেন; আম্বেদকর এর তীব্র বিরোধিতা করে দাবী করেন সেখান থেকেও জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই আসবেন। পরে অবশ্য রাজ্যগুলি বিলুপ্ত হয়। অন্তবর্তী সরকারের সময়ে যখন মুসলীম লীগ সরকার ও পরিষদকে বয়কট করেছে, দেশীয় রাজ্যগুলি যখন স্বাধীন হবার স্বপ্ন দেখছে সেই সময়ে জওহরলাল নেহরু তাড়াতাড়ি সংবিধান রচনার কাজ শেষ করতে বলেছিলেন। প্রথমে জয়াকর, পরে আম্বেদকর, তার বিরোধিতা করে বলেছিলেন, সমস্ত ভারতীয়ের জন্য সংবিধান সমস্ত ভারতীয়ের প্রতিনিধিরা মিলে রচনার দায়িত্ব নেবেন, একটি খণ্ডিত অংশের প্রতিনিধিরা মাত্র নন।

আবার একদল যখন বিরোধিতা করে বলেন যে গণপরিষদ যা সমস্ত মানুষের প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত হয়নি, তার সংবিধান রচনার অধিকার আছে কিনা তখন আম্বেদকর উদাহরণ স্বরূপ বললেন যে আমেরিকা যুক্তরাজ্যের সংবিধান গ্রহণের সময় যুক্তরাজ্যের মধ্যে মাত্র তেরোটি রাজ্য ছিল, সেখানে সারা ভারতের ২৯২ জন প্রতিনিধি একাজ করতে সক্ষম।

তবু তাঁর সন্দেহ যায় নি। সংবিধান পেশ করবার সময়ে তিনি বললেন, ভারতবর্ষের মানুষকে আমরা রাজনৈতিক অধিকার দিলাম কিন্তু সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার দিলাম না, আমাদের এ সম্বন্ধে সচেতন থাকা দরকার।

গণপরিষদ দেশের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে অনেকগুলি কমিটি গঠন করেছিল, সেই কমিটিগুলি তাদের উপদেশ প্রত্যাদেশের চাপে মুসাবিদা কমিটিকে ভারাক্রান্ত করেছিল। তবু আম্বেদকর সংবিধানের রচনাতে নিজের মূল লক্ষ্য—সমান মানবিক অধিকার, সেটি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন।

তাঁর সংবিধান সম্মত ভারতবর্ষে ধর্মকে প্রশাসন থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে, প্রতিটি মানুষের সমানাধিকারের কথা (ব্যক্তিগত আইনের বাধা সাপেক্ষে) বলা হয়েছে, সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজের কথা, পরিকল্পিত উন্নয়নের কথা বলা হয়েছে। তাঁর রচিত সংবিধানে সার্বজনীন শিক্ষার কথা বলা হয়েছে, তাকে কার্যকরী করবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে বাধ্য করার কোন আইন করা যায়নি বরং শিক্ষাকে বিভিন্ন ভাষা ও আঞ্চলিক গোষ্ঠীর উপযুক্ত করবার প্রয়োজন রাজ্যের হাতে সে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। অর্থ দেওয়া হয়নি। এককেন্দ্রিক শাসনের বদলে ফেডারেল শাসনব্যবস্থায় প্রত্যেক অঞ্চলের জনগণের নিজ-নিজ প্রত্যাশাকে রূপ দেবার জন্য রাজ্যগুলিকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কেন্দ্রের হাতে অতিরিক্ত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, প্রয়োজনে জনগণের ভোটে নির্বাচিত রাজ্যের সরকারকে বরখাস্ত করার ক্ষমতাও আছে। তবে সংবিধানকে ও তার থেকে প্রসূত আইনগুলিকে যারা প্রয়োগ করবে, মূলতঃ সেই শাসক-গোষ্ঠীর সদিচ্ছার উপরে শাসনের উপযুক্ত পরিবেশ রচনা নির্ভর

করে। এখানে আম্বেদকর আশা করেছিলেন যে দেশ-শাসনের গুরুদায়িত্ব যাদের উপরে বর্তাবে, তারাই সেই দায়িত্বের নৈতিক দিকটা চিন্তা করবেন।

এটা হয়নি, এবং এটা যে হবেনা না তা আম্বেদকর উপলব্ধি করেছিলেন। স্বাধীনতার এক বৎসরের মধ্যে কমিউনিষ্ট পার্টিকে বেআইনী করা হল মূলতঃ নিজামের অপশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের জন্য। ভূমি-সংস্কার আইন, যার প্রণয়নে কংগ্রেস প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল, পিছিয়ে দেওয়া হ'ল।

একটা কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে, যে তাঁকে সংবিধানের জনক বলাটা সঙ্গত নয়, কারণ, রক্ষণশীল কমিটি ও গণপরিষদে যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা সকলেই জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধি ছিলেন না, ফলে আম্বেদকরের বহু স্বপ্নকেই তাঁরা রূপায়িত করতে দেন নি। তাঁর ভাষায় তিনি ভাড়াটিয়া সংবিধান লেখক মাত্র ছিলেন।

আইন মন্ত্রী হিসাবে আম্বেদকর হিন্দু কোড বিল প্রণয়ন করলেন। এতে হিন্দু সমাজের ব্যক্তিগত অধিকার প্রমুখ বিভিন্ন অসঙ্গতি দূর করবার প্রয়াস ছিল। সংবিধানে আম্বেদকর যখন ব্যক্তিগত আইন লোপের ধারা আনবার চেষ্টা করেছিলেন তখন যদি তিনি কৃতকার্য হতেন তবে হিন্দু কোড বিল প্রণয়নের প্রয়োজন হোত না। যাই হোক শুধু হিন্দুমহাসভার সদস্যরা নন, লোকসভার কংগ্রেস দলের এক বিরাট গোষ্ঠী এই বিলের বিরোধিতা করলেন। ক্ষোভে দুঃখে আম্বেদকর পদত্যাগ করলেন। বুঝলেন, হিন্দুধর্মের আওতায় থাকলে নিম্নবর্ণের মানুষের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা নেই। প্রথম ঘোষণার প্রায় দুইদশক পরে এবার আম্বেদকর সদলে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করলেন। বুদ্ধকে তিনি কিন্তু দেবতার আসনে বসান নি। আদর্শ শক্তিতে ভরপুর আম্বেদকর কিন্তু থেমে থাকতে শেখেন নি। তাঁর প্রতিষ্ঠিত পিপল্‌স এডুকেশনে সোসাইটি বোম্বাই ও ঔরঙ্গাবাদে দুটি কলেজ পরিচালনা করেছিল। আম্বেদকর ভারতীয় বৌদ্ধ সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করলেন প্রায় বিস্মৃত বৌদ্ধ দর্শন ও শাস্ত্রাবলীর পুনরুদ্ধারের ও আলোচনার জন্য। এর পর তিনি সারা বিশ্বের বৌদ্ধদের একই সংগঠনের আওতায় আনবার কাজে মনোনিবেশ করলেন। এর উপরে পড়া লেখা, বক্তৃতার কাজ তো চলছিল-ই।

১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে তিনি নেপালে এক বৌদ্ধ সম্মেলনে যোগ দিতে গেলেন—সেটিই তাঁর শেষ বড় কাজ। ফিরবার কিছুদিনের মধ্যেই, ৬ই ডিসেম্বর তাঁর মৃত্যু। ধর্মান্ধতার বলি নিম্নবর্ণের মানুষকে মনুষ্যত্বের আলোতে নিয়ে আসবার চেষ্টায় আজীবন সংগ্রামরত একটি জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটল।

সহায়ক পুস্তক, প্রবন্ধ ইত্যাদি

(১) বি কে আলুওয়ালিয়া ও শশী আলুওয়ালিয়া—B. R. Ambedkor and Human Rights.—Manas Publications, Delhi 1990

(২) Who's who, 1951.

(৩) Current Biography, whos news and why, 1951.

CENTRAL LIBRARY

□ মনোরঞ্জন বড়াল

নেহরু মন্ত্রীসভায় ড. আম্বেদকর

ভারতের ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন ১৯৪৭ সালের ৩রা জুন বৃটিশ ভারতে দুটি সরকার, দুটি গণপরিষদ এবং শ্রীহট্ট ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে গণ-ভোটের কথা ঘোষণা করেন। ১৪ই আগস্ট বৃটিশ সরকার ভারতের দুই সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত যথাসময়ে জানিয়ে দিয়েছিল। পূর্ব ঘোষণানুসারে ঐ তারিখেই বৃটিশ কর্তৃপক্ষ ক্ষমতা হস্তান্তর করে এবং ভারত উপমহাদেশ খণ্ডিত হয়ে ১৫ই আগস্ট দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়—'ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র' ও 'পাকিস্তান'।

জওহরলাল নেহরু তার মন্ত্রীসভায় যোগদানের জন্য ড. আম্বেদকরকে আহ্বান জানান। ৩রা আগস্ট শ্রীনেহরুর নেতৃত্বে নতুন মন্ত্রীসভার নাম ঘোষণা করা হয়। ড. আম্বেদকর সেই মন্ত্রীসভায় যোগদান করেন। হিন্দু মহাসভার নেতা ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিও নেহরুর আহ্বানে মন্ত্রীসভায় যোগদান করেছিলেন। স্বাধীন ভারত যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম মন্ত্রীসভা একক কংগ্রেস দলের মন্ত্রীসভা ছিল না—ছিল ব্রড বেসড্ ক্যাবিনেট।

১৯৪৭ সালের অক্টোবরে বোম্বাই তফসিলী যুব সংস্থা ড. আম্বেদকরকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করে। সেই সভার ভাষণে তিনি জানান: "কংগ্রেসী মন্ত্রীসভায় নয়, বিনা শর্তে আমি নেহরু মন্ত্রীসভায় যোগদান করেছি এবং তফসিলীদের স্বার্থের দিক বিবেচনা করেই একাজ করেছি।" যদিও ড. আম্বেদকরের নেহরু-মন্ত্রীসভায় যোগদানের ফলে তার অনুগামীদের মধ্যে যে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন উঠেছিল তাতে সন্দেহ নেই। বিভিন্ন স্থানের ভাষণে তিনি তার অনুগামীদের প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করেছেন। ১৯৪৭ সালের অক্টোবরে বোম্বাইয়ে তফসিলী যুবসংস্থা আয়োজিত অভ্যর্থনা সভায় ড. আম্বেদকরের ভাষণের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯৪৮ সালে এপ্রিলে বোম্বাই প্রাদেশিক তফসিলী সম্মেলনে ড. আম্বেদকর তার ভাষণে বলেন: রাজনৈতিক ক্ষমতাই সমস্ত সুযোগ সুবিধার চাবিকাঠি। একমাত্র এই ক্ষমতা দ্বারাই সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব। রাজনৈতিক ক্ষমতালাভ ব্যতীত বঞ্চনা থেকে তফসিলীদের মুক্তির অন্য কোন পথ নেই। তফসিলী ফেডারেশনকে এমন সংগঠিতভাবে গড়ে তোলা প্রয়োজন যাতে ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই সংস্থা তৃতীয় শক্তিতে পরিণত হয় এবং রাজনৈতিক ভারসাম্যের নিয়ামক হয়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় কংগ্রেসী মন্ত্রী হিসাবে যাই নি। কংগ্রেস তো একটা জ্বলন্ত বাড়ীর মতো, আমার মতে অবিলম্বে তা ভস্মীভূত হয়ে যাবে। কংগ্রেসীদের সঙ্গে মিলে মিশে চলছি—তাতে কিছু যায় আসে না। কারণ, আমার রাজনৈতিক আদর্শ কঠিন প্রস্তরের ন্যায়। কংগ্রেসী

সলিলে তার বিন্দুমাত্র ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। ফেডারেশনের কর্মীদের কিন্তু কংগ্রেস থেকে দূরে থাকতে হবে, কারণ তারা মৃত্তিকাপিণ্ডের ন্যায় কংগ্রেসী সলিলে বিগলিত হয়ে পড়তে পারেন। তফসিলী ফেডারেশনকে সম্পূর্ণভাবে অক্ষত রেখে তাকে শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে হবে—এটাই বিশেষ অনুরোধ।

১৯৪৬ সালে বৃটিশ ভারতে মূল গণপরিষদ গঠিত হয়েছিল তৎকালীন সারা ভারতের জন্য। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের পর ভারত যুক্তরাষ্ট্রের গণপরিষদ স্বাধীন দেশের সার্বভৌম ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। দ্বিধা বিভক্ত করাতে বঙ্গপ্রদেশ দ্বিখণ্ডিত হওয়ায় ড. আম্বেদকর আর গণপরিষদের সদস্য থাকতে পারলেন না। ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে ড. এম. আর. জয়াকর গণপরিষদ থেকে পদত্যাগ করেন। তখন কংগ্রেসের সমর্থনেই ড. আম্বেদকর তৎকালীন বোম্বাই প্রদেশ থেকে নতুন করে গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন।

নেহরুর মন্ত্রীসভায় যোগদানের পর ড. আম্বেদকরের উপর প্রধান দায়িত্ব পড়ে স্বাধীন ভারতের খসড়া সংবিধান রচনার। ১৯৪৭ সালের ২৯শে আগষ্ট গণপরিষদের কনষ্টিটিউশন ড্রাফটিং কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন ড. আম্বেদকর। কমিটির সদস্যদের মধ্যে ছিলেন কৃষ্ণস্বামী আয়ার ; এন. ধাবরাও ; স্যার বি এন রাও ; এস এন মুখার্জী ; মুগলকিশোর খান্না, কেবল কৃষ্ণ, সৈয়দ সাদুল্লা প্রমুখ ব্যক্তিরা। খসড়া সংবিধান কমিটি গঠিত হবার পর তারা তাদের কাজ শুরু করে দেন।

খসড়া সংবিধান কমিটির পক্ষ থেকে ড. আম্বেদকর ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারীর শেষ সপ্তাহে খসড়া সংবিধান গণপরিষদের সভাপতি ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদের কাছে পেশ করেন। এই বিষয়ে মতামত গ্রহণের জন্য ছয় মাস সময় দেওয়া হয়। ১৯৪৮ সলের নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে কমিটির সভাপতি হিসাবে ড. আম্বেদকর গণপরিষদে খসড়া সংবিধান পেশ করেন। তখন খসড়ায় মোট ধারা ছিল ৩১৫টি এবং সংযোজিত তালিকা ছিল আটটি। তিনি সংবিধানের মূল চরিত্রটি ব্যাখ্যা করেন।

ভারতকে যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র বলে ঘোষণা করা হলেও ড. আম্বেদকর ভারতকে যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র না বলে ভারত রাষ্ট্র নাম দেবার পক্ষপাতী ছিলেন। কারণ. খসড়া সংবিধান কোন প্রজাতন্ত্রের সংবিধান হবার উপযুক্ত ছিল না। পূর্ণাঙ্গও ছিল না। কিন্তু গণপরিষদ ড. আম্বেদকরের অভিমত গ্রহণ করে নি।

এই প্রসঙ্গে খসড়া সংবিধান কমিটির অন্যতম সদস্য এস সাদুল্লা গণপরিষদেই অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন যে, খসড়া সংবিধান কমিটি সব সময়ে নিজেদের অভিমত ও বিবেচনা অনুসারে কাজ করতে পারেননি। কংগ্রেসের প্রভাবশালী নেতাদের সঙ্গে প্রায়ই পরামর্শ করে খসড়া কমিটিকে কাজ চালাতে হয়েছে। প্রশ্নোত্তরে তিনি স্বীকার করেন যে, গণতান্ত্রিক নীতি বিরোধী কোন কোন ধারা কংগ্রেস দলের হাইকমান্ডের প্রস্তাবে খসড়া সংবিধানে সংযোজন করতে হয়েছে।

খসড়া সংবিধানের তৃতীয় বারের পাঠের অধিবেশনে বিভিন্ন তর্ক-বিতর্কের উত্তর

দিতে গিয়ে ড· আম্বেদকর বলেছিলেন ঃ আমি গণপরিষদে এসেছিলাম সংবিধানে শুধুমাত্র তফসিলীদের স্বার্থরক্ষার খাতিরে। আমাকে যখন খসড়া সংবিধান কমিটির সদস্য নির্বাচিত করা হয় তখন অবাকই হয়েছিলাম। এ জন্য গণপরিষদের কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। আরও বেশী অবাক হয়েছিলাম যখন আমাকে খসড়া সংবিধান কমিটির সভাপতি (চেয়ারম্যান) নির্বাচিত করা হয়। খসড়া সংবিধান কমিটির সদস্যদের নিকটও আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।....আমরা এই সংবিধান দ্বারা দেশবাসীকে শুধু রাজনৈতিক গণতান্ত্রিক অধিকার মাত্র দিলাম। কিন্তু অর্থনৈতিক ও সামাজিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হলে এই রাজনৈতিক অধিকারও ব্যর্থ হতে বাধ্য।....১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী আমরা রাজনৈতিক অধিকার পাব এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে আমরা কিন্তু পাব অসমতা। যথাসম্ভব দ্রুত এই স্ববিরোধিতা আমাদের দূর করতে হবে, নতুবা যারা অসমতার দুঃখকষ্টে ভুগছেন তারা রাজনৈতিক অধিকারের কাঠামো চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেবেন।"

১৯৪৯ সালের ২৬শে নভেম্বর গণপরিষদে খসড়া সংবিধান স্বাধীন ভারতের সংবিধান হিসাবে গৃহীত হয়। গণপরিষদের সভাপতি, ডা· রাজেন্দ্রপ্রসাদ সেদিন 'ঈশ্বরকে' পর্যন্ত টেনে এনে সভাপতির ভাষণে বলেছিলেন ঃ ড· আম্বেদকরকে খসড়া কমিটির সদস্য ও সভাপতি করে আমরা যে নির্ভুল সিদ্ধান্ত সেদিন গ্রহণ করেছিলাম তার জন্য আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই। আমি সভাপতি হিসাবে একথা বলতে চাই যে, আমরা ভারতের সবচেয়ে যোগ্যতম ব্যক্তির হাতেই আমাদের ভবিষ্যৎ সংবিধান রচনার ভার অর্পণ করেছিলাম।"

প্রসঙ্গত কয়েকটি কথা উল্লেখ্য—খসড়া সংবিধান কমিটি কংগ্রেস হাইকমাণ্ডের প্রভাবে সংবিধানে কিছু কিছু ধারা সংযোজন করেছে বলে খসড়া সংবিধান রচনা কমিটির সদস্য এস· সাদুল্লা গণপরিষদের অধিবেশনেই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ড· আম্বেদকর কিংবা কমিটির অন্য কোন সদস্য সাদুল্লার বক্তব্যের কোন প্রতিবাদ করেছেন এমন কোন তথ্য নেই। ড· আম্বেদকর নিজেই মন্তব্য করেছেন—তিনি খসড়া সংবিধান কমিটির সদস্য ও সভাপতি হতে রাজী হয়েছেন, "শুধুমাত্র তফসিলীদের স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখার জন্য"। তিনি তার সহকর্মীদের নিয়ে যে-খসড়া সংবিধান রচনা করেছিলেন তা কোন প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সংবিধান হবার মত উপযুক্ত নয় বলে অভিমতও ব্যক্ত করেছেন। তিনি সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসমতা অক্ষুন্ন রেখেই রাজনৈতিক গণতান্ত্রিক অধিকার সংবিধানে পাওয়া যাবে বলে মন্তব্য করেছেন। অবশ্য অতি দ্রুত সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসমতা দূর করা সম্বন্ধে তিনি হুঁশিয়ারী দিয়েছিলেন।

স্বাধীন ভারতের সংবিধান গৃহীত হবার চার দশকের বেশী সময় অতীত হয়েছে। অভিজ্ঞতায় কি বলে যে, গত চার দশকে তফসিলী জাতি-উপজাতির লোক সহ ভারতের ব্যাপক জনসাধারণ রাজনৈতিক গণতান্ত্রিক অধিকার লাভ করেছে? সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমান অধিকার পাওয়া তো দূরের কথা। পূর্বোক্ত

তিনটি অধিকার তো একেবারে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। ভারতের জাতি-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে মেহনতী মানুষেরা গত চার দশকে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার যতটুকু আদায় করেছে তা তো সংগঠিত সংগ্রামী শক্তির জোরে। মেহনতী মানুষদের অধিকার আদায়ের সংগ্রামকে বাধা দেওয়ার জন্যই তো ১৯৫০ সালে গৃহীত সংবিধান ও তার পরবর্তী সংশোধনীগুলি ব্যবহৃত হয়েছে। স্বাধীন ভারতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত বৃহৎ পুঁজিবাদী ও জমিদাররা এবং দেশী বিদেশী অন্য কায়েমী স্বার্থবাদীরাই তো নিজেদের স্বার্থে এই সংবিধান ব্যবহার করে চলেছে।

ড. আম্বেদকর বেশীদিন নেহরু-মন্ত্রীসভায় থাকতে পারলেন না। কায়েমী স্বার্থবাদীদের স্বার্থে সংবিধান রচনা করিয়ে নিয়ে নেহরু সরকার আর একটি দায়িত্ব দিয়েছিলেন ড. আম্বেদকরকে। সে হ'ল 'হিন্দু কোড বিল' রচনার দায়িত্ব। হিন্দু কোড বিলের সূত্রপাত হয়েছিল বৃটিশ শাসনকালেই। ১৯৪১ সালে বি. এন. রাও-এর সভাপতিত্বে হিন্দু আইন সংস্কারের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মতো ভয়ংকর পরিস্থিতির মধ্যেও রাও কমিটি দীর্ঘদিন ধরে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে হিন্দু কোড বিলের একটা খসড়া তৈরী করেছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ—ভারতের স্বাধীনতা লাভ প্রভৃতি ঘটনার মধ্যে একটা খসড়া তৈরী করা ছাড়া হিন্দু আইন সংস্কারের আর বেশী কিছু এগোয়নি। স্বাধীন ভারতে প্রধানমন্ত্রী নেহরু উদ্যোগ নিয়ে হিন্দু কোড বিলের আইন রচনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন ড. আম্বেদকরকে। তিনি বিল রচনায় কয়েকটি প্রগতিশীল ধারা যোগ করেছিলেন—যেমন হিন্দুসমাজের যৌথ পরিবারের ক্ষতিকর দিক, মেয়েদের সম্পত্তিতে অধিকার, বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার প্রভৃতি। কংগ্রেস দলের ও অন্য রাজনৈতিক দলের প্রতিক্রিয়াশীল অংশ এই বিলের ঘোরতর বিরোধিতা করতে শুরু করে। হিন্দুসমাজের দুরবস্থা সম্বন্ধে যারা কিছুটা সচেতন তারা অবশ্য বিলের প্রগতিশীল ধারাগুলির প্রতি সমর্থন জানান। গণপরিষদের সদস্যদের মধ্যে বিলের সমর্থক সংখ্যা বেশী ছিল না। স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনার প্রধান হিসেবে ড. আম্বেদকর ইতিমধ্যে সাড়ম্বর অভিনন্দন পেতে থাকেন। ১৯৫০ সালের ১১ই জানুয়ারী বোম্বাই'র তফসিলী ফেডারেশন প্যারল অঞ্চলে এক সম্বর্ধনা সভায় ড. আম্বেদকরকে একটি সোনার পাত্রে ভারতের সংবিধান উপহার দেন। সেই সম্বর্ধনা সভায় তিনি ভাষণে বলেন: **ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তফসিলীদের শুধু নিজেদের স্বার্থে আন্দোলন ও সংগ্রাম করলে চলবে না আজ তাদের দেশের সকল বঞ্চিত ও নির্যাতিত জনগণের স্বার্থে বৃহত্তর সংগ্রাম ও আন্দোলনে নেমে পড়তে হবে।'**

১৯৫১ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী ড. আম্বেদকর তৎকালীন পার্লামেন্টে হিন্দু কোড বিল পেশ করেন। এর পূর্বেই এই বিলের বিরুদ্ধে জোর সমালোচনা শুরু হয়েছিল। প্রথমদিকে বিলের সমর্থন ছিলেন প্রধান মন্ত্রী নেহরু। তিনি প্রকাশ্যে এই অভিমতও জ্ঞাপন করেছিলেন যে, হিন্দু কোড বিল যদি পার্লামেন্টে পাশ না

CENTRAL LIBRARY

করা যায় তবে তিনি (নেহরু) পদত্যাগ করবেন। অন্যদিকে পার্লামেণ্টের সভাপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ ও কংগ্রেস হাইকমাণ্ডের অন্যতম প্রধান সর্দার প্যাটেল বিলটির বিরুদ্ধে স্পষ্টভাবে অভিমত প্রকাশ করেন। ১৮৩০ সালের প্রিভি কাউন্সিলের আইনানুসারে শিখ, বৌদ্ধ ও জৈনরা হিন্দু আইনের অন্তর্ভুক্ত বলে সর্বসম্মত স্বীকৃতিলাভ করেছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, শিখ নেতা সর্দার হুকুম সিং পর্যন্ত প্রস্তাবিত হিন্দু কোড আইনের বিরোধিতা করেন। পার্লামেণ্টে তিন দিন ধরে প্রচণ্ড তর্ক-বিতর্ক হয়। অনেকে অভিমত প্রকাশ করেন যে, এই ধরনের একটি বিল আইনে পরিণত করার কাজ নতুন সংবিধান অনুসারে নির্বাচিত পরবর্তী পার্লামেণ্টেই তোলা হোক। শেষ পর্যন্ত স্থির হয় যে, বিলটি পার্লামেণ্টের পরবর্তী অধিবেশনে উত্থাপনের জন্য মুলতবী রাখা হোক।

১৯৫১ সালের এপ্রিল মাসে দিল্লীতে একটি অনুষ্ঠানে ড. আম্বেদকর কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার সদস্য থাকা সত্ত্বেও তার সরকারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে অভিযোগ করেন যে, নেহরু সরকার তফসিলীদের প্রতি বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করছে। (এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, তখনও সংবিধান অনুসারে নির্বাচনের পর কেন্দ্রীয় সরকার বা পার্লামেণ্ট গঠিত হয়নি)। তৎকালীন মন্ত্রীসভার সদস্যরা ড. আম্বেদকরের এই ধরনের আচরণে গভীরভাবে বিক্ষুব্ধ হন। এই পরিস্থিতিতে ড. অম্বেদকর তার অনুগামীদের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেন যে, হিন্দু কোড বিল আইনে পরিণত করার প্রচেষ্টা চালানো পর্যন্ত তিনি নেহরু মন্ত্রীসভায় থাকবেন।

ড. আম্বেদকর যে-হিন্দু কোড বিল উত্থাপন করেছিলেন তার প্রতি তথাকথিত উচ্চবর্ণের হিন্দুদের একটি প্রগতিশীল অংশের সমর্থন ছিল। ১৯৫১ সালের মে মাসে বুদ্ধজয়ন্তী অনুষ্ঠানে ড. আম্বেদকর হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে কঠোর আক্রমণাত্মক এক ভাষণ দেন। এর ফলে তথাকথিত উচ্চবর্ণের যে-সব হিন্দুদের হিন্দু কোড বিলের প্রতি সমর্থন ছিল তাদের অনেকেও মত পরিবর্তন করেন।

হিন্দু কোর্ডবিল নিয়ে কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী বোর্ডের সদস্যদের মধ্যে মতানৈক্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে প্রধানমন্ত্রী নেহরু কংগ্রেস সদস্যদের নিজের বিচার-বুদ্ধিতে ভোট দেবার স্বাধীন অধিকার মেনে নিতে বাধ্য হন। আর একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, বিলটিকে দুই অংশে ভাগ করতে হবে। দ্বিতীয় অংশটিকে 'বিবাহ ও বিচ্ছেদ বিধি' নাম দিয়ে পার্লামেণ্টে প্রথমে উত্থাপন করতে হবে। বিলের খসড়া রচনাকারী ড. আম্বেদকর এই শর্তেও রাজী হন।

পার্লামেণ্ট ভবনের চারদিকে কাঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ করে ১৭ই সেপ্টেম্বর বিলের দ্বিতীয় অংশের আলোচনা শুরু হয়। মন্ত্রীসভার সদস্য ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী পর্যন্ত বিলটির বিরোধিতা করতে গিয়ে মন্তব্য করেন: এই বিল আইনে পরিণত করা হলে স্বামী-স্ত্রীর অচ্ছেদ্য বন্ধন সম্পর্কে হিন্দুধর্মের মহান ঐতিহ্যকেই ধ্বংস করা হবে। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য প্রমুখ আরও অনেকে বিলের বিরুদ্ধে প্রায় অনুরূপ ভাষায় অভিমত প্রকাশ করেন। বিলের সমর্থনে

CENTRAL LIBRARY

অভিমত প্রকাশ করেছিলেন এন ভি গ্যাডগিল, পণ্ডিত কুঞ্জরু ও বহু মহিলা সদস্য।

জবাবী ভাষণ দিতে গিয়ে ড. আম্বেদকর রামায়ণ মহাকাব্যের রামসীতা সম্পর্কে এমন এক আপত্তিকর মন্তব্য করেন যাতে সমগ্র পার্লামেণ্ট বিক্ষুব্ধ হয়। ড. আম্বেদকর রাম-সীতা সম্পর্কে তার মন্তব্য প্রত্যাহার করে নেন। তা সত্ত্বেও বিলের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দিক থেকে এমন আক্রমণ আসতে থাকে যাতে প্রধানমন্ত্রী নেহরু রীতিমত বিরক্ত হয়ে ড. আম্বেদকরকে বিলটি প্রত্যাহার করে নিতে অনুরোধ করেন। সাতদিন ধরে আলোচনার পর বিলটি প্রত্যাহার করে নেওয়া হল। হিন্দু কোড বিলের প্রথম অংশ উত্থাপনের আর কোন সুযোগ থাকল না।

এই ঘটনার পর ২৭ শে সেপ্টেম্বর ড. আম্বেদকর প্রধানমন্ত্রী নেহরুকে এক পত্রে মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি এও জানান যে—কয়েকটি সরকারী বিলে তার বক্তব্য রাখার পূর্ব সিদ্ধান্ত রয়েছে। তাই সে কর্তব্য পালন না করা পর্যন্ত তিনি সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন।

১৯৫১ সালের ১১ই অক্টোবর ড. আম্বেদকর পার্লামেণ্টে তাঁর নিজস্ব বক্তব্য রাখার দাবী জানান। পার্লামেণ্টের ডেপুটি স্পীকার ড. আম্বেদকরকে জানান যে, তাঁর বক্তব্যের একটি কপি অগ্রিম তার কাছে জমা দিতে হবে। ড. আম্বেদকর ডেপুটি স্পীকারের এই নির্দেশে নিজেকে অপমানিত বোধ করেন এবং কোন বক্তব্য পেশ না করে প্রতিবাদে পার্লামেণ্ট কক্ষ ত্যাগ করেন। নেহরু মন্ত্রীসভা থেকে ড. আম্বেদকরের পদত্যাগের রিপোর্ট ও বিবরণ ১২ই অক্টোবরের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

পদত্যাগের পাঁচটি কারণ দর্শানো হয়। (১) হিন্দুকোড বিল পাশ করা সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী নেহরুর দুর্বল নীতি, (২) প্রধানমন্ত্রী নেহরুর সকল ক্যাবিনেট কমিটি থেকে তাঁকে (ড. আম্বেদকরকে) বাইরে রাখা, (৩) ড. আম্বেদকরের ধারণা —নেহরু সরকারের তফসিলীদের উন্নয়ন ব্যাপারে বিরূপ মনোভাব, (৪) কাশ্মীর প্রশ্নে নেহরু সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে তাঁর মতভেদ এবং (৫) ভারত সরকারের বৈদেশিক নীতি সম্বন্ধে তাঁর পুরোপুরি মতভেদ।

শেষোক্ত চারটি কারণ সম্পর্কে পূর্বে প্রকাশ্যে ড. আম্বেদকর কিছু বলেছেন বলে তথ্য প্রমাণ জানা নেই। হিন্দুকোড বিল নিয়ে নেহরু মন্ত্রীসভায় যে মতভেদ ছিল তা ড. আম্বেদকরের পদত্যাগ ঘোষণার আগেই সংবাদপত্রে ও পার্লামেণ্টে জানা গিয়েছিল। নেহেরু মন্ত্রীসভার সদস্য হিসাবেই তিনি হিন্দুকোড বিল উত্থাপন করেছিলেন। মন্ত্রীসভার সদস্য থাকাকালেই ১৯৫১ সালের এপ্রিল মাসে দিল্লীতে এবং মে মাসের বুদ্ধ জয়ন্তীতে সরকারী নীতি ও বর্ণ-হিন্দুদের বিরুদ্ধে অনেক কঠোর মন্তব্য করেছিলেন। অবশ্য এরূপ ধারণা করাও বোধ হয় ঠিক হবে না যে, তাঁর ঐরূপ কঠোর সমালোচনাই হিন্দুকোড বিলপাশে প্রধান বাধা ছিল। এই বিল নিয়ে পার্লামেণ্টে ভোটাভুটি হলেও ঐ বিল পাশ হয়তো হত না। তবে

CENTRAL LIBRARY

মন্ত্রীসভার সদস্য থাকাকালেই তাঁর ঐ ধরনের কঠোর সমালোচনা পার্লামেন্টের সদস্যদের যে বিলের বেশী সংখ্যায় বিরোধী হতে সাহায্য করেছে, তাতে সন্দেহ নেই।

নেহরু সরকার থেকে পদত্যাগের অন্যান্য যে কারণ দেখিয়েছেন তা তো বহু পূর্বেই কংগ্রেস-বিরোধী হিসেবে তাঁর জানা ছিল। বরং মনে হতে পারে—ড. আম্বেদকর হিন্দু কোড বিলের প্রশ্ন নিয়ে নেহরু মন্ত্রীসভা ত্যাগের সুযোগ খুঁজছিলেন!

বিশিষ্ট সাংবাদিক মনোরঞ্জন বড়াল দীর্ঘ অসুস্থতার পর এখনও লেখা-লেখির জগতে ফিরে আসেন নি—তাই লেখকের অনুমতি নিয়ে তাঁর "ড. ভীমরাও আম্বেদকর : কর্ম জীবনের কয়েকটি দিক" শীর্ষক গ্রন্থ থেকে নির্বাচিত অংশ নতুন শিরোনামে এখানে সংকলিত হল—

—সম্পাদক।

"Dr. Babasaheb Ambedkar was a symbol of revolt against all oppressive features of the Hindu Society"

—Pandit Jawaharlal Nehru.

ব্রাত্যজনের শ্রেষ্ঠ বন্ধু ড. আম্বেদকর

অস্পৃশ্যদের মানুষের মত সুন্দর জীবনধারণের অধিকার দাবী করার জন্য আমরা কি আম্বেদকরকে ক্ষমা করতে পেরেছি ? হিন্দু সমাজের জাতিভেদ প্রথা ধর্মের অংগ এবং হিন্দু সমাজের মধ্যে থাকলে অস্পৃশ্যরা চিরকালই সমাজের একেবারে নিচে পড়ে থাকবে বলে তিনি অস্পৃশ্যদের বৌদ্ধ-ধর্মান্তর চেয়েছিলেন, —আমরা কি সেজন্য তাঁকে ক্ষমা করতে পেরেছি ?

বৌদ্ধধর্মান্তরিত অস্পৃশ্যদের স্কলারশিপ এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি ও চাকুরীতে সংরক্ষণের পুনঃ প্রবর্তন আমাদের যেন প্রতারিত না করে। ভীমরাও আম্বেদকরের জন্মশতবর্ষের এসব হল সদিচ্ছার চিহ্ন। এই সদিচ্ছা হচ্ছে ফাঁকা বুলি এবং নাগপুরে পাঁচ লক্ষ অনুগামী সহ ড. আম্বেদকরের বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণের ৩৭ বছর পরে এই সদিচ্ছা দেখানো হচ্ছে।

ভারতের কেন্দ্রস্থল বলে নাগপুরকে ধর্মান্তরনের স্থান হিসাব বেছে নেওয়া হয়েছিল। উপলক্ষ ছিল বুদ্ধের জন্মের আড়াই হাজার বর্ষ পূর্তি। বর্তমান সমালোচকের সামনে **ড. বি আর আম্বেদকর** এবং **ড. বাবাসাহেব আম্বেদকর** দু'খানি পুস্তক রয়েছে। এর প্রথম খানি রাজ্যসভা প্রকাশ করেছে এবং তাতে বি পি মৌর্যের একটি প্রবন্ধ আছে। মৌর্য তাঁর প্রবন্ধে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে অফিসারদের মধ্যে দুই শতাংশের কম এবং কেরানীদের মধ্যে তিন শতাংশেরও কম তফসিলীদের প্রতিনিধিত্বের হিসাব দিয়েছেন। সরকারের অধিগৃহীত সংস্থার অফিসারদের মধ্যে চার ভাগের কম এবং কেরানীদের মধ্যে ছয় ভাগের কম তফসিলীদের প্রতিনিধিত্ব রয়েছে। আর কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরীতে তফসিলীরা রয়েছেন অফিসারদের মধ্যে নয় ভাগের কম এবং কেরানীদের মধ্যে এগারো ভাগের কম।

নিদেনপক্ষে একটি রাজনৈতিক দল, ভারতের জাতীয় কংগ্রেস, তার নির্বাচনী ইস্তেহারে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে তফসিলীদের চাকুরীতে প্রাপ্য অপূর্ণ কোটা পূরণ করে দেওয়া হবে। দিল্লীতে বেশীরভাগ সময় কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় থেকে এই পার্টি কি করেছে এতদিন ?

অন্য খণ্ডের লেখার মধ্যে কিছু কিছু ভণ্ডামীপূর্ণ বক্তব্য আছে। এই খণ্ড ঘটনাপঞ্জী নিয়ে লেখা হয়েছে। ১৮৪৮ সাল থেকে এই ঘটনাপঞ্জী। ১৮৩০ সালের ব্রাহ্ম সভা (পরে সমাজ)-র ট্রাষ্ট-দলিল এই ঘটনাপঞ্জীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় নি, অনেক পরে থেকে শুরু হয়েছে। এই ট্রাষ্ট-দলিলে ধর্মস্থানে সকলের প্রবেশাধিকার স্বীকৃত ছিল। এর ১০৬ বছর পরে ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা প্রথম মন্দির প্রবেশের আইন বিধিবদ্ধ করেন। ১৮৬৪ সালে ব্রাহ্মদের অসবর্ণ বিবাহের ঘটনা এই ঘটনাপঞ্জীর মধ্যে নেই। প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার দীর্ঘকাল পশ্চিম ভারতে ছিলেন। কিন্তু উল্লেখ

করার মতো ব্যক্তি একমাত্র করমভীর ভিথল রামজী সিন্ধেকেই ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষিত করেন। ভাইকম মন্দিরের পাশ দিয়ে যাতে ব্রাহ্ম মতে ধর্মান্তরিত অস্পৃশ্যরা হাঁটাচলা করতে পারেন তার জন্য ব্রাহ্মরা নিজেদের অহিন্দু বলে ঘোষণা করেন।

সাধারণ বিবাহ আইন পাশ হওয়ার সময় থেকে ব্রাহ্মদের অহিন্দু বলে মনে করা হতে থাকে। জ্যোধি দাস, ই. ভি. পেরিয়ার, রামস্বামী নাইকার, পি লক্ষ্মী নরসু এবং আন্না দুরাইয়ের মত নেতারা নিজেদের অহিন্দু বলে ঘোষণা করতে দ্বিধান্বিত ছিলেন, কিন্তু তাঁরা সমাজে যে ব্যবহার পেয়েছেন তা অহিন্দুর চেয়ে বেশী। কালক্রমে এরা সকলে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হন। ব্রাহ্ম ধর্মের বিরুদ্ধে আপত্তি ছিল একটিই, তা হল যে-ধর্মশাস্ত্র অস্পৃশ্যতা জন্ম দিয়েছে, সেই একই ধর্মশাস্ত্রকে নির্ভর করেই ব্রাহ্ম ধর্ম তৈরী হয়েছে। বিবেকহীন যুক্তিহীন কিছু কিছু বেদপ্রদত্ত বিধি-নিষেধ এবং অস্পৃশ্যতা ব্রাহ্মরা পরিত্যাগ করেছিলেন। সব ধরণের ব্রাহ্ম মতবাদের পর এল আর্য্য সমাজ। তারা হিন্দু সমাজের ঐক্যের উপর জোর দিয়ে ঘোষণা করলেন যে শুধুমাত্র ব্রাহ্মণ নয় বেদ সকল হিন্দুরই ঐতিহ্য। এরা অস্পৃশ্যতা অস্বীকার করলেন কিন্তু জাতিভেদ স্বীকার করলেন যা ব্রাহ্মরা মানতেন না। আম্বেদকর এবং গান্ধীর মধ্যে এখানেই পার্থক্য। ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের মধ্যে বিবাহ এবং একসঙ্গে বসে ভোজন পুনা প্যাক্টের আগে পর্যন্ত গান্ধী সমর্থন করতেন না।

আম্বেদকর মনে করতেন কৌলিন্য বা উঁচুনিচু ভেদ ধর্মের অচ্ছেদ্য ব্যবস্থা এবং যদি বর্ণভেদ থাকে সমাজে বৈষম্য অনিবার্য। সেজন্য মৌলিক অধিকারের যে খসড়া তিনি রচনা করেছিলেন, তার ভাষা ছিল এইরকম: "পদমর্যাদা, জন্ম, ব্যক্তি, পরিবার, ধর্ম সম্পর্কীয় আচার বা প্রথা হতে সৃষ্ট যে কোন অধিকার বা অক্ষমতা বিলুপ্ত হল।" বর্ণহিন্দুদের সংখ্যাধিক্যে ঠাসা গণপরিষদ এই খসড়া পছন্দ করে নি। কে এম মুন্সি, একে বদল করে সংশোধনী প্রস্তাব নিয়ে আসেন যা সংবিধানের বর্তমান ১৭নং ধারায় লিপিবদ্ধ আছে। এই ধারাটি হল:

"অস্পৃশ্যতা বিলোপ করা হইল এবং যে কোন প্রকারে উহার আচরণ নিষিদ্ধ হইল। 'অস্পৃশ্যতা' হইতে উদ্ভুত কোন নির্যোগ্যতা বলবৎ রাখা বিধি অনুসারে দণ্ডনীয় অপরাধ হইবে।"

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এবং এমন কি বৈশ্য তাদের অধিকার বজায় রাখলো। বর্তমান সমালোচক ১৯৪২ সালের গ্রাম বাংলার কোন একটি বিয়ে বাড়ীর কথা মনে করছে, সেখানে সকলের আগে ব্রাহ্মণদের খাইয়ে দেওয়ার চাপ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এ ঘটনা সংবিধানের খসড়া রচনার আগের ঘটনা। সত্যিই কেউ কি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারেন যে আজও জন্মগত কারণে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী নিশ্চিহ্ন হয়েছে? গান্ধীজী বর্ণভেদকে 'নিছক সামাজিক ভাগ' বলে খারিজ করে দিয়েছিলেন। আম্বেদকর বলতেন, "যতদিন বর্ণ স্বাতন্ত্র্য থাকবে" ততদিন মোট জনসংখ্যার কমবেশী এক চতুর্থাংশ আনুষ্ঠানিকভাবে অস্পৃশ্যতা উঠে গেলেও সমাজের নিচের তলায় পড়ে থাকবে।

CENTRAL LIBRARY

দশ বছর ও পেরোয়নি, রেলের কামরায় এক মহিলাকে আমি বলতে শুনেছি, ধোবী জল ছুঁয়ে দিয়েছে, এ জল আর পান করা যাবে না। এই মহিলা তার এক সহযাত্রীকে ধোপী জানতে পেরে এই কটাক্ষ করেছিলেন, যদিও ১৯৫০ সালের আগে ধোবী অস্পৃশ্য ছিল না। নিষ্ঠুর বর্ণভেদ প্রথার যারা সমর্থক তারা ঘুসিমারার জন্য তাদের উদ্যত মুষ্টি ভেলভেটের দস্তানার আড়ালে লুকিয়ে রাখার ভানটুকু পর্যন্ত করে না। বিহার সহ দেশের অন্যত্র বর্তমানেও যে এত মানুষ বর্ণভেদের বলি হচ্ছে তা-ই তার প্রমাণ।

আম্বেদকর যেদিন মারা গেলেন সেদিন একজন নৌঅফিসার আমার কাছে এসেছিলেন। ঐদিন চৌ-এন-লাইয়ের কলকাতা সফর উপলক্ষে সরকারী বাড়ীগুলি আলো দিয়ে সাজানো হয়েছিল। এটা আমার কাছে খুবই বেদনাদায়ক মনে হয়েছিল। এই বেদনার কথা আমি ঐ বন্ধুকে বলি। তার মন্তব্য আজও আমার কানে বাজছে: "সে (আম্বেদকর) কি একটা ভুঁই ফোড় নয়?" অস্পৃশ্য হয়ে জন্মেও আম্বেদকর নিজেকে তাঁর নানা লেখার ও ডিগ্রীর দ্বারা আত্মপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। দর্শন ও অর্থনীতিতে মৌলিক গবেষণার জন্য তার দুটি ডক্টরেট ডিগ্রী ছিল। এছাড়া তিনি ব্যারিস্টারও ছিলেন। কলম্বিয়া, লণ্ডন এবং লণ্ডন স্কুল অব ইকোনমিকসের মত প্রখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রতিষ্ঠান থেকে ৩৩ বছর বয়সের মধ্যেই তিনি এই সব ডিগ্রী ও সম্মান অর্জন করেছেন। এই সাফল্য বিশ্বের যেকোন মানুষের পক্ষে গৌরবজনক, আর একজন ভারতীয় অস্পৃশ্যের পক্ষে অকল্পনীয়; কারণ তাদের স্কুলেই ঢুকতে দেওয়া হত না। এই সাফল্যের অধিকারী হয়েও, যে গান্ধীর ব্যারীষ্টারী ছাড়া উল্লেখ করার মত কোন ডিগ্রী ছিল না, তার কাছে আম্বেদকর ম্লান হয়ে গেলেন। এই সব ডিগ্রী পাওয়ার দশ বছরেরও বেশী পরে গান্ধীজী তার হরিজন পত্রিকায় আম্বেদকর সম্পর্কে লিখলেন, "গড়ে শিক্ষিত ভারতীয়দের মেধার তুলনায় আম্বেদকরের মেধা বেশীই ছিল।" জন ডেবি এবং বার্ট্রান্ড রাসেল উভয়ে অনেক কম বয়স থেকে আম্বেদকরকে চিনতেন, কিন্তু তারা গান্ধীর মত উল্টো অর্থে তার পিঠ চাপড়ান নি।

প্রেসিডেণ্ট ভেঙ্কটরমন 'স্মরণিকা গ্রন্থে' মহাত্মার পিঠ চাপড়ানো ধরতে পারেন নি; বরং উল্টে তিনি গান্ধীজীর "গড়ে শিক্ষিত ভারতীয়দের মেধার তুলনায় বেশী" মন্তব্যকে আম্বেদকরের প্রতি গান্ধীজীর "বিরাট শ্রদ্ধা" বলে লিখছেন। স্মরণিকা গ্রন্থখানি বর্ণ হিন্দুদের বাকচাতুর্যে ভরপুর। উদাহরণ হল, প্রেসিডেণ্ট ভেঙ্কটরমন বলেছেন, "ইতিহাসের এক সুবিধাজনক অবস্থান থেকে আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি গান্ধীজী এবং বাবাসাহেব একই গণজাগরণকে ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে প্রতিনিধিত্ব করছেন।" আসলে একজন জাতিভেদ প্রথার বিলোপ চেয়েছেন, আর একজন এটাকে টিকিয়ে রাখতে চেয়েছেন। একজন আরএকজনের বিরোধী অবস্থানে ছিলেন; বিরোধিতা ছাড়া এদের অন্যভাবে সম্পর্কিত করা যায় না।

এই অস্পৃশ্যটি ১৯৩১ সালে গান্ধীর সঙ্গে দেখা করেন; তার আগে পর্যন্ত

আম্বেদকর উচ্চবর্গীয় নেতাদের দ্বারা উপেক্ষিত ছিলেন। এর আগে আম্বেদকর লাজপাত রাই, এবং এম এন রায়ের সঙ্গে দেখা করেন; কিন্তু তাঁরা অস্পৃশ্যরা যে অসুবিধা ভোগ করছিলেন তা বুঝতে চান না। তিনি ১৯৩৯ সালে নেহরু এবং ১৯৪০ সালে সুভাষ বসুর সঙ্গে দেখা করেন। তাঁরাও (উভয়েই) মনে করতেন ১৯৩২ সালের পুনা প্যাক্টের ফলে অস্পৃশ্য সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে।

কেবলমাত্র সেই সব উদারপন্থী যাঁদের ১৯১৭ সালের পরে গান্ধীপন্থীরা কংগ্রেস থেকে বের করে দিয়েছিলেন, তারাই আম্বেদকর এবং অস্পৃশ্যদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। রানাডের প্রভাবে উদ্বুদ্ধ চন্দ্রভারকর, পারানজী এবং জয়াকরের মত মানুষেরা অস্পৃশ্যদের জন্য অনেক কিছু করেছিলেন। রানাডে এবং তাঁর বন্ধুরা প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার এবং ব্রাহ্ম সমাজের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। অস্পৃশ্যদের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে 'প্রার্থনা সমাজের' চেয়ে 'ব্রাহ্ম সমাজের' অবদান কি করে কম হতে পারে তা গবেষণা সাপেক্ষ।

অনুরূপভাবে কোলহাপুর এবং বরোদার রাজ-পরিবারগুলির ভূমিকা আরো বিস্তারিতভাবে আলোচিত হওয়া দরকার। কোলহাপুর শাসকদের উত্তর পুরুষরা শিবাজীর বংশধর। শিবাজীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এদের রাজপুত মর্যাদা লুপ্ত হয় এবং এদের পূর্বের মারাঠা কৃষক জাতি সত্তায় ফিরে যায়। বরোদা ইন্দোর এবং গোয়ালিয়রের রাজ পরিবারগুলির জাতি পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন ছিল। বরোদার রাজকুমারীর বিয়ে হয় কোচবিহারের রাজপরিবারে। এই পরিবারেই কেশব সেনের মেয়ের বিয়ে হয়েছিল।

কোলহাপুর এবং বরোদার শাসকরা অস্পৃশ্যতা দূর করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। এরা আম্বেদকরকে উৎসাহ দিতেন। কোচবিহারের পরিবার উচ্চ বিবাহে উৎসাহী ছিলেন। দ্বিতীয় রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সে গান্ধীর সঙ্গে আম্বেদকরের সরাসরি সংঘাত লাগে। সংঘাতের কারণ হল, আম্বেদকর অস্পৃশ্যদের জন্য পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থা দাবী করেছিলেন। গান্ধী সম্পর্কে অভিযোগে করে নেহরুর কাছে এডওয়ার্ড থম্পসন লিখেছিলেন "গান্ধীজী উদ্ধত, অপ্রাসঙ্গিক এবং অন্য প্রতিনিধিদের মতামতের প্রতি অসহিষ্ণু"। জয়াকরের মতে গান্ধীজীর আচরণ "মাইনরিটি প্যাক্ট" গ্রহণের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। "কংগ্রেস সংগঠনের বাইরে গিয়ে একটা সিটেও দলিত সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষণ মানতে রাজী ছিলেন না গান্ধী।"

রামজে ম্যাকডোনাল্ডের "কমিউন্যাল অ্যাওয়ার্ডে" অস্পৃশ্যদের জন্য পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থার প্রস্তাব ছিল। এ থেকেই মাইনরিটি প্যাক্ট হয়েছিল। এই প্যাক্ট অনুসারে মুসলমান, শিখ এবং অন্যান্য স্বার্থের জন্য পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থা রাখা হল। এর ফলে হিন্দুদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নগণ্য হয়ে পড়ে। গান্ধী আমৃত্যু অনশন শুরু করেন। ম্যাকডোনাল্ড মহাত্মাকে লিখলেন: আপনি আমৃত্যু অনশনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এই জন্য নয় যে অন্যান্য হিন্দুদের সঙ্গে দলিত

CENTRAL LIBRARY

হিন্দুদের একই নির্বাচনী ব্যবস্থা হোক, কারণ সে ব্যবস্থা বর্তমানে রয়েছে ; হিন্দুদের ঐক্যের জন্যও আপনি অনশন করছেন না, কারণ সে ঐক্য রয়েছে, বরং আপনার অনশনের একমাত্র লক্ষ্য বলা যায় ভয়ংকর রকম সামাজিকভাবে অক্ষমতা পীড়িত দলিত হিন্দুরা যাতে নিজেদের পছন্দমত প্রতিনিধি নির্বাচন করতে না পারে।" এইখানে জোর দেওয়া হল এই জন্য যে অনগ্রসরদের (আগে দলিত সম্প্রদায় এবং বর্তমানে তফসিলী জাতি) প্রতিনিধিত্বের প্রশ্ন পুনরায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

পুনাপ্যাক্ট সম্পর্কে জয়াকর বলেছেন ঃ বেয়নেটের মুখে এটাকে গ্রহণ করানো হয়েছিল"। সমর গুহ, যিনি জয়াকরকে বলবেন নিছক উদারপন্থী, তিনি বলেছেন যে আম্বেদকর—"মহাত্মার নৈতিক আবেদনের কাছে নতি স্বীকার করেছিলেন"। একটি পীড়নমূলক অনশনকে কি করে নৈতিক আবেদন বলা হয় তা বর্ণ হিন্দুদের দু'মুখো ভাষার অংগ। সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা ৭৮ থেকে ১৪৮ বাড়ানো হয়েছিল। এই আসন বৃদ্ধিকে গুহ উচ্চজাতের মহানুভবতার প্রমাণ বলে উল্লেখ করেছেন। আসল কথা হল অনেক দুঃখ নিয়ে চাপে পড়ে ভয়ে এবং মানবিক কারণে গান্ধীর জীবন রক্ষার জন্য আম্বেদকর এই চুক্তি স্বাক্ষর করেন। পরবর্তী কালে আম্বেদকর ঘোষণা করলেন যে "এই প্যাক্টের ফলে ৬ কোটি অস্পৃশ্যের ভোটাধিকার লুপ্ত হল।"

বি পি মৌর্য দুঃখ করে বলেছেন, 'যারা সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত হয়ে আসেন, "সমাজের দুর্বলতর অংশের উপর ক্রমবর্ধমান হারে প্রতিদিন যে পাশবিক অত্যাচার চলছে তার বিরুদ্ধে" তাদের সংসদে কদাচিৎ সোচ্চার হতে দেখা যায়। তিনি মনে করেন দুই সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচনী-ক্ষেত্র ব্যবস্থায় যাওয়া উচিত। সেখানে যারা অতফসিলী তারা কেবল সাধারণ আসনের জন্য ভোট দেবেন।

উচ্চবর্ণের হিন্দুদের ব্যবহারিক ভাষায় বৈজ্ঞানিক শব্দেরও সুবিধাজনক পরিবর্তন ঘটানো হচ্ছে উদাহরণ হিসাবে বলা যায় দিল্লী থেকে ২৫ মাইল দূরে "ছাত্তেরা গ্রামে"র উপর এক প্রবন্ধে একজন শিক্ষাবিদ কে. ডি. গ্যাংগ্রেড নিম্নলিখিত বিষয়কে সামাজিক অগ্রগতির লক্ষণ বলে চিহ্নিত করেছেন ঃ বর্ণহিন্দু পঞ্চায়েতের উদ্যোগে নিরামিশ ভোজন ; আগে যেসব আচার-অনুষ্ঠান গ্রামের প্রবীণদের দ্বারা করানো হত এখন তা করার জন্য পুরোহিত নিয়োজিত হচ্ছে। যৌতুকের পরিবর্তে কনের দাম ধরা হচ্ছে। এইগুলিই দেখাচ্ছে কিভাবে গ্রামের ভাঙ্গি ও চামাররা হিন্দু ব্যবস্থার মধ্যে আরও নিবিড় ভাবে মিশে যাচ্ছে ; অবশ্য অস্পৃশ্যদের সঙ্গে ব্রাহ্মণ বা জাঠ সম্প্রদায়ে একসঙ্গে ভোজন বা অসবর্ণ বিবাহের বাধা নিষেধের পরিবর্তন হল কি না সে হিসাবের মধ্যে না গিয়ে। এটাই গান্ধী চিয়েছিলেন আর আম্বেদকর বিরোধিতা করেছিলেন। এই সেদিন ১৯৮৯ সালে নেহরু স্মৃতি বক্তৃতা করার সময় রাজীব গান্ধী "অস্পৃশ্য" শব্দের পরিবর্তে "যুগ পরম্পরায় অসুবিধার মধ্যে থাকা জনগণের অংশ" শব্দগুলি ব্যবহার করা বেশী পছন্দ করলেন।

CENTRAL LIBRARY

কে. এন. কদমের ঘটনাপঞ্জী রাজ্যসভা-প্রকাশিত স্মরণিকা পুস্তকের চেয়ে বেশী স্পষ্ট। ১৯৩১ সাল পর্যন্ত অস্পৃশ্যরা পুলিশ বাহিনীর চাকুরীতে ঢুকতে পারতো না। ১৮৯২ থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত এরা সেনা বাহিনীতেও নাম লেখাতে পারতো না। এবং ১৯১৭ সাল পর্যন্ত ঝাড়ুদার, মুচি' সহিস এবং মালি ছাড়া কোন নিচু স্তরের সরকারী কাজও এদের দেওয়া হত না। এই কাজ গুলি গ্রাম্য হিন্দু অস্পৃশ্যদের বংশগত জীবিকা ছিল। মিশ্র গ্রাম এবং হিন্দু ছাড়াও অন্যান্যরা বসবাস করে এমন শহরে এই পেশাগুলি অস্পৃশ্যদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল।

গ্রামে এবং শহরে আরোকিছু সেবামূলক পেশা নির্ভর সম্প্রদায় ছিল ; তবে এরা সমাজের নিচের তলায় জায়গা পেতো—যদিও অস্পৃশ্য ছিল না। এই ধরণের পেশা ভিত্তিক বর্ণ হল, ধোপা, নাপিত, দর্জি, কামার, ছুতোর। এই দুই নিচু জাতের ফারাক হল, অস্পৃশ্যরা ভূমিহীন আর অন্যরা সেবার বিনিময় জমির মালিক হতে পারতো। অস্পৃশ্যরা গ্রামসমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিলে না, তাদের বসবাসের জন্য গ্রামের বাইরে জমি দেওয়া হত যাতে তাদের কাছ থেকে শ্রম পাওয়া যায়। এরা কৃষকদের শ্রম দিত, কিন্তু নিজেরা চাষ করার জন্য জমি পেতা না।

অস্পৃশ্যরা আগে যেমন ছিলো, এখনো আছে, অন্যান্যদের তুলনায় জীবিকার জন্য চাকুরীর উপর বেশী নির্ভরশীল। এর কারণ তার ভূমিহীন। চাকুরীর সুযোগও খুবই সীমিত। শিল্পায়ন এদের জীবিকার জন্য কোন সুযোগ এনে দেয় নি। যেমন, সুতোকলের তাত বিভাগে অস্পৃশ্যদের নিয়োগ করা হত না। ১৯৫০ সাল পর্যন্ত গান্ধীর অনুগামীদের কারখানায়-ও এই নিয়ম চালু ছিল। এই অবস্থায় পুরানো ব্যবস্থা ভেঙ্গে ফেলা অস্পৃশ্যদের কাছে খুবই জরুরী হয়ে পড়েছিল। ধাবওয়ারের সরকারী স্কুলে ভর্তির জন্য মাহার সম্প্রদায়ের একটি ছেলে আবেদন করেছিলেন। তাকে ভর্তি করতে স্কুল কর্তৃপক্ষ অস্বীকার করায় সে ১৮৫৬ সালে সরকারের কাছে তার প্রতিবাদ জানিয়েছিল এই বৈষম্যের জন্য।

এই প্রতিবাদে সাড়া দিয়ে ১৮৫৮ সালে সরকার এক নির্দেশনামায় সমস্ত সরকারী স্কুলে ভর্তি অস্পৃশ্য সহ সকল শ্রেণীর জন্য উন্মুক্ত করে দেয়। গভর্নমেণ্ট জানিয়ে দেয় যে অস্পৃশ্যতা বা জাতিগত কারণে কোন স্কুলে কাউকে ভর্তি না করলে আর্থিক অনুদান বন্ধ করে দেওয়ার অধিকার সরকারের থাকল। এর বিয়াল্লিশ বছর পরে ভীমরাও আম্বেদকর সাতারে একটি সরকারী স্কুলে ভর্তি হলেন। কিন্তু সেখানে যেমন, তেমনি বম্বেতেও পাঠকক্ষের বাইরে বসেই তাকে পড়াশোনা শিখতে হয়েছে।

১৯২০-এর দশকের মাঝামাঝি বর্তমান লেখক কোন একটি শহরের স্কুলে পড়তেন সেখানে চারটি হাইস্কুল ছিল। এই চারটি স্কুলের ১২ শত ছাত্রের মধ্যে মাত্র দুজন ছিলো অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্র। এর একজন একটি বাংলা স্কুলের ছাত্র এবং তাকে ক্লাসের মধ্যে ডেস্কে বসতে দেওয়া হত, কিন্তু জল পান করার জন্য

তাকে আলাদা পাত্র রাখতে হত। অন্য ছেলেটি ছিল সরকারী স্কুলে। তাকে ক্লাশের মধ্যে বসতে দেওয়া হত বটে, কিন্তু বসতে হত চটের বস্তায়। আম্বেদকরের ছাত্রজীবন থেকে ২৫ বছরের মধ্যে পরিস্থিতির অনেক উন্নতি হয়েছিল। একজন আর্য্যসমাজী একটি অস্পৃশ্য বালকের পাত্র থেকে জল পান করায় তাকে শুদ্ধি করণের বিধান দেওয়া হল এই বলে যে তার ঠোঁটে গোবর ছোঁয়াতে হবে। সে এর প্রতিবাদ জানিয়েছিল। এর তিনবছর পরে ঐ শহরে-পরিবেশেই সমুদ্রযাত্রার জন্য জয়প্রকাশ নারায়ণকে একই শুদ্ধিকরণের আচার মানতে হয়েছিল।

বিদেশ থেকে ফিরে ১৯১৭ সালে আম্বেদকর রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন। তখন মণ্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কারের কাজ চলছিল। কংগ্রেসের একজন অস্পৃশ্য সদস্য ভিথল রামজী সিন্দে তার প্রস্তাবে বললেন, যেমন দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাংগরা কালোদের প্রতিনিধিত্ব করেথাকে তেমনি ভারতেও বর্ণহিন্দুরা অস্পৃশ্য-দের প্রতিনিধি। আম্বেদকরের প্রস্তাব ছিল, অস্পৃশ্যদের প্রতিনিধি অস্পৃশ্যরাই নির্বাচিত করবে। যখন এই সংস্কার চালু হল তখন প্রাদেশিক আইনসভায় অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ভুক্ত মনোনীত সদস্যদের দ্বারা তাদের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা রাখা হল। ১৯২৫ সালে ডিসেম্বর মাসে আম্বেদকরকে বোম্বাই আইন সভায় মনোনীত করা হয়।

পুণা প্যাক্টে যে ব্যবস্থা কায়েম হল তাতে আম্বেদকর মাত্র একবারের জন্য সরাসরি নির্বাচিত হতে পেরেছিলেন। এটা হয়েছিল ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে যখন বোম্বে আইনসভায় ইণ্ডিপেনডেণ্ট লেবার পার্টির প্রার্থী হিসাবে আম্বেদকর ও আরও ১৩ জন নির্বাচিত হয়েছিলেন। ঘটনাপঞ্জীতে পরিস্কার করে বলা হয়নি, এই আসনগুলি শ্রমিকদের অথবা তফসিলীদের জন্য সংরক্ষিত কি না। গণপরিষদে তার নির্বাচন অবিভক্ত বাংলা থেকেই হয়েছিল, কারণ ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে বোম্বাই আইনসভায় তার সমর্থকরা পাঁচটি আসনেও জিতে আসতে পারে নি। সবকটি নির্বাচনা ক্ষেত্রেই বর্ণ হিন্দুরা তফসিলীদের তুলনায় সংখ্যাধিক্য ছিলো। পূর্ব বাংলার নমঃ শূদ্ররা তার গণপরিষদে নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক আইনসভার সদস্য নির্বাচিত করেছিলেন। র‍্যাডক্লিফের অ্যাওয়ার্ডে ঐ অঞ্চল পাকিস্তানে চলে গেলে আম্বেদকরের নির্বাচিত হওয়ার রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। তার পুরানো বন্ধু জয়াকর এগিয়ে এলেন ; নিজে পদত্যাগ করে তার আসনে আম্বেদ-করকে নির্বাচনের সুযোগ দিলেন। বর্ণ হিন্দুদের ভোটের জন্য একজন অপরিচিত তফসিলী কংগ্রেসকর্মীর কাছে আম্বেদকর প্রথমে ১৯৫২ এবং পুনরায় ১৯৫৪ সালে যথাক্রমে বোম্বাই ও ভান্দ্রা থেকে পরাস্ত হলেন। ১৯৫২ সালের পরাজয় কংগ্রেসী-দের কাছেও এত শোকাবহ হয়েছিল যে তারা বোম্বাই বিধানসভা থেকে তাকে রাজ্য সভায় পাঠালেন। তফসিলী জাতির ভোট তফসিলী প্রার্থীর নির্বাচন সংক্রান্ত মৌর্যের যুক্তি আম্বেদকরের নির্বাচনী পরাজয়ের অভিজ্ঞতার দ্বারা সমর্থিত হয়।

অস্পৃশ্যতা নিবারণ আইনের কি ঘটছে ? মাত্র দু-বছর আগে অস্পৃশ্যদের নাথ-

দোয়ারা মন্দির দরজা থেকে ঢুকতে না দিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া হল। সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত স্কুলে ভর্তির ব্যাপারে বৈষম্য না করার নির্দেশ নামার ১৩২ বছর পরেও জনসংখ্যার অনুপাতে অস্পৃশ্য ছাত্রদের সংখ্যা খুবই নগণ্য। কবে সেই ১৯২৩ সালে সরকারী অর্থে নির্মিত জলাধার, কুয়ো এবং বিশ্রামালয়ে প্রবেশের অধিকার তফসিলীদের প্রদান করে একটি প্রস্তাব বোম্বাই আইনসভায় গৃহীত হয়েছিল। চার বছর পরে অবাধ প্রবেশের অধিকার কোন স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান অস্বীকার করলে সরকারী অনুদান বন্ধ করা হবে এই অতিরিক্ত ধারা যুক্ত করে ঐ প্রস্তাবই পুনরায় গ্রহণ করা হয়। চৌদার জলাধার সংক্রান্ত মামলা দীর্ঘদিন ধরে চলেছিল। নিম্ন আদালত এই জলাধার থেকে জলতোলার উপর অস্পৃশ্যদের বিরুদ্ধে স্থগিতাদেশ দিলে মামলাটি হাইকোর্ট পর্যন্ত গড়ায়।

ঘটনাপঞ্জীতে অনেক চাঞ্চল্যকর ঘটনার উল্লেখ আছে। ১৯১৭ সাল পর্যন্ত কোন অস্পৃশ্য ডেপুটি কালেক্টর পদে নিযুক্ত হয় নি। ১৯৩২ সালেও কোন অস্পৃশ্য গ্রামপঞ্চায়েতে নির্বাচিত হতে পারতো না। নিজের অর্জিত অর্থে নির্মিত গৃহ বিক্রয় করে আম্বেদকর বই কিনেছিলেন এবং ৩২ টি বাক্স ভর্তি করে সেগুলি বম্বে এনেছিলেন। বর্তমান লেখক যখন বম্বে ছিলেন, তখন তিন বছর ধরে আম্বেদকরের গাঠাগার ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছিলেন।

এই পুস্তক পর্যালোচনায় আমি তফসিলী জাতি বা হরিজন কথার পরিবর্তে অস্পৃশ্য শব্দ ব্যবহার করা বেশী পছন্দ করেছি, কারণ একমাত্র এই শব্দটিই সমাজের একাংশ যে নির্মম সামাজিক বৈষম্যের শিকার তা পুরোপুরি ব্যক্ত করতে পারে। গান্ধীর হরিজন নামকরণ আম্বেদকরের পক্ষে আপত্তিজনক ছিল। একবার ১৯৩৮ সালে বোম্বাই আইনসভায় একটি সংশোধন বিলে 'হরিজন' শব্দ ব্যবহার করার প্রতিবাদে আম্বেদকর সভাকক্ষ ত্যাগ করেন। শুধুমাত্র আম্বেদকর নয়, তার আগেও অনেক অস্পৃশ্য নেতা বৌদ্ধধর্মকে গ্রহণ করেছিলেন ; কারণ বৌদ্ধ ধর্মে জাতিভেদ প্রথা নেই। এদের মধ্যে ডি এম কে দলের প্রতিষ্ঠাতা পেরিয়ার ই ভি রামস্বামী নাইয়ার ছিলেন। আমাদের সাংসদদের মধ্যে প্রধানতম ব্যক্তি এন জি রঙ্গ স্বীকারোক্তি করে বলেছিলেন, সে এবং তার বন্ধুরা এদের প্রসংশা করতেন, "কিন্তু আমরা হিন্দুধর্ম অথবা ঈশ্বরে বিশ্বাস কোনটাই ছাড়তে পারি নি।"

সানডে স্টেটসম্যান পত্রিকায় ১৯৯১ সালের ১৫ই ডিসেম্বর হামুদি বে-র এই লেখাটি প্রকাশিত হয়। তিনি মারা যান ৩রা ডিসেম্বর। ড. বি. আর আম্বেদকর (প্রকাশক-রাজ্যসভা) ও ড, বাবাসাহেব আম্বেদকর (ঘটনাপঞ্জী—সংকলক, কে, এন, কদম)-গ্রন্থ দুটির আলোচনা প্রসঙ্গে লেখা এ রচনার বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করে **পথ সংকেত পত্রিকা** জানুয়ারী (১৯৯২) সংখ্যায়। দুটি পত্রিকার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে লেখাটি এখানে সংকলিত হল—সম্পাদক।

CENTRAL LIBRARY

ড. জোয়াথিম পিউকে ৫

ড. আম্বেদকর ও তাঁর আন্দোলন

উনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় সমাজের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কার্ল মার্কস বলেছিলেন, "সমাজের সমস্ত মানুষের মধ্যে পরিব্যাপ্ত ব্যবধান এবং সাংগঠনিক বিচ্ছিন্নতাজনিত এক ধরণের ভারসাম্য ছিল সেই সমাজ-কাঠামোর ভিত্তিস্বরূপ।" ব্রিটিশরা যে ঘটনাকে বিদ্রোহ বলে আখ্যা দিয়েছিল, এবং কার্ল মার্কস যাকে আখ্যা দিয়েছিলেন 'ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম' বলে, সেই ঘটনার কয়েক বৎসর পূর্বে 'নিউ ইয়র্ক ডেইলী ট্রিবিউন' পত্রিকার জন্য লিখিত তাঁর অন্যতম প্রবন্ধে কার্ল মার্কস এই মন্তব্য করেছিলেন। আগামী বহু বৎসর পর্যন্ত তাঁর এই মন্তব্য যথার্থ পরিগণিত হবে। বিশেষ করে "সমাজের সমস্ত মানুষের মধ্যে সাংগঠনিক বিচ্ছিন্নতা" আগামী দিনে ভারতীয় সামাজিক আন্দোলনের অগ্রগতিকে ব্যাহত করবে। এই 'বিচ্ছিন্নতা'র ভিত্তি হল আবহমান কালের অতীব কঠোর এবং অচলায়তনস্বরূপ হিন্দুসমাজের জাতিভেদ প্রথা। এই প্রথার মুখ্য নীতি হল, সমাজের সমস্ত মানুষের মধ্যে সার্বিক অসাম্য। যার ফলে, হয় তারা জন্মসূত্রে ধন-সম্পত্তি, শিক্ষা এবং শক্তির অধিকারী, অথবা বলপূর্বক দারিদ্র্য, অশিক্ষা এবং শোষণের মধ্যে আবদ্ধ। অসংখ্য জাত-পাত নিয়ে যুগ-যুগান্ত ধরে সম্প্রসারিত এই প্রথা যেমন সমাজের প্রতিটি মানুষের চিন্তা জগতে এর চিরস্থায়িত্ব এবং অপরিবর্তনীয়তা গভীরভাবে অনুপ্রবিষ্ট করেছে, তেমনি একটা প্রবোধও এনে দিয়েছে যে, এর চাইতেও নীচু জাতের মানুষ আগেও ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। উক্ত সমাজ-কাঠামোর সব চাইতে নীচু জাতের নীচেও যে আর কিছু ছিল না, তা নয়। সেখানে সর্বনিম্ন জাতের চাইতেও নীচু জাতের এবং শোচনীয় অবস্থার কতগুলি মানুষ বাস করত, যাদের দেখলে কিংবা যাদের কাছে গেলেও পাপ হয়, এবং যারা হল অস্পৃশ্য। এমন মানুষেরাও কিন্তু বাস করত জাতিভেদ প্রথার মূল নীতির গভীর প্রভাবের ভিতরে। তাই তারা নিজেদেরও ভাগ করে নিয়েছিল কয়েকটি 'জাতে'র মধ্যে, প্রতিষ্ঠা করেছিল কতগুলি নিয়ম ও বাধ্যবাধকতার এবং সেগুলিকে তারা কঠোরভাবে মেনেও চলত।

ছিন্ন-বিছিন্ন ভারতীয় সমাজের মধ্যে হিন্দু ছাড়াও ছিল মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান ইত্যাদি সম্প্রদায়। ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের সংহতি তথা অগ্রগতির পূর্বে এবং সময়ে এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, ব্রিটিশ শাসকবর্গ নিজেদের স্বার্থেই এই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন অবস্থার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করছে। ভারতীয় সমাজের প্রাচীন আচার-নিয়ম, রীতি-নীতি এবং প্রথা সমূহকে মান্য করবার প্রতিশ্রুতি তারা ১৮৫৮ সালের গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া অ্যাক্টেই ঘোষণা করেছিল। ভারতীয় উপনিবেশের প্রভু হিসাবে তারা নজর রেখেছিল যাতে এই সমস্ত বিষয়ে কোন রকম পরিবর্তন না আসে। কারণ, প্রাচীন সামাজিক রীতি-নীতির যে-কোন রকম পরিবর্তনই সমাজে

CENTRAL LIBRARY

অনৈক্যের বদলে এনে দিত ঐক্য। এই জিনিসটা ব্রিটিশেরা আদৌ চায় নি। ভারতভূমিতে নিজেদের রাজত্ব কায়েম করতে ভারতবাসীদের মধ্যে অনৈক্যই ছিল ব্রিটিশদের সব চাইতে বড় সহায়। ভারতের ব্রিটিশ রাজত্বের শেষ দিন পর্যন্ত ব্রিটিশরা নিজেদের নীতির সমর্থনে যে কাজটি সম্পন্ন করেছিল, তা' হল Devide-et impera নীতির রূপায়ণ।

বর্ণবিভেদের প্রাচীর ডিঙিয়ে এবং উদীয়মান ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী, শ্রমিক, কৃষক তথা ভূমিহীন মজুরদের একত্রিত করে—এক কথায় ভারতীয় সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষদের নিয়ে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সংগঠন তথা অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু জাতিভেদ প্রথার কঠিন কাঠামোয় প্রথম ফাটল দৃশ্যমান হল। প্রতিটি সমাজের শক্তিশালী অংশের মত, তার দুর্বলতম অংশেরও কিছুটা শক্তি রয়েছে। একাধিক কারণে হিন্দু সমাজের দুর্বলতম মানুষ হল তারাই, যাদের অস্পৃশ্য বলা হয়ে থাকে এবং অস্পৃশ্য করে রাখা হয়। এই কারণেই দেখা দিল হিন্দুসমাজের অভ্যন্তরীণ বিরোধ। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রগতির খানিকটা প্রাথমিক পর্যায়েই বোঝা গেল সেই বিরোধের প্রভাব।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অবিসংবাদী নেতা মহাত্মা গান্ধীর মতে "বর্ণাশ্রম হল....মনুষ্য প্রকৃতির জন্মগত ব্যাপার", এবং হিন্দুধর্ম কেবলমাত্র একে বিজ্ঞানে পরিণত করেছে।" অস্পৃশ্যতাকে তিনি অবশ্য ধিক্কার জানিয়ে বলেছেন, "এটা হল চরম অধর্ম, এবং একে বিনিষ্ট করা উচিত।" এই মতাদর্শ নিয়েই মহাত্মা গান্ধী অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে তাঁর আন্দোলন শুরু করেন। বর্ণাশ্রমসিদ্ধ বর্তমান সামাজিক কাঠামো পরিবর্তন করবার কোন উদ্দেশ্য তাঁর ছিল না। হিন্দুধর্মকে রক্ষা করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। তাই তিনি "বর্ণহিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিটি মানুষকে আপন হৃদয় সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করে অস্পৃশ্যতাকে অন্তর থেকে বিতাড়িত করার জন্য" আবেদন জানালেন। তিনি মনে করতেন, অস্পৃশ্যতাকে সমাজে থাকতে দিলে হিন্দুধর্ম এবং তৎসহ ভারতবর্ষ ধ্বংস হয়ে যাবে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের পরিণতির ক্ষেত্রে এই সমস্যা সমাধানের গুরুত্ব অনুধাবন করে, তিনি একে "সর্বাপেক্ষা মূল্যবান—রাজনৈতিক ভাষ্যে যাকে স্বরাজ বলা হয়েছে—তার চাইতে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ বিষয়" বলে ঘোষণা করেনে।

ড. বি. আর. আম্বেদকর নিজে ছিলেন অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের মানুষ। বিশের দশকে তিনি অন্ত্যজ সম্প্রদা[illegible] এক শক্তিশালী নেতারূপে আত্মপ্রকাশ করেন, অন্ততঃপক্ষে প্রাক্তন বোম্বাই প্রেসিডেন্সির মধ্যে তিনি যে উক্ত সম্প্রদায়ের একজন অবিসংবাদী নেতা ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তিনি মনে করতেন, ভারতে ব্রিটিশ রাজত্বের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে স্বরাজের অর্থ স্বাভাবিকভাবেই দাঁড়াবে এখানে বর্ণহিন্দুদের আধিপত্য বিস্তার। ৬ কোটি অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের মানুষের কোন রকম সামাজিক, ধর্মীয় অথবা রাজনৈতিক সম-অধিকারের প্রতিষ্ঠা কিছুতেই হবে না। সুতরাং, অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষেরা যাতে প্রকৃত অর্থে নাগরিকত্ব লাভ

করতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে তিনি ঐ সমস্ত অধিকার অর্জনের দিকেই সর্বাধিক মনোযোগ দিতে মনস্থ করেন। তাদের প্রতি তিনি আবেদন জানালেন, "স্মরণাতীত কাল ধরে আপনারা অত্যাচারিত হয়ে আসছেন, তবু এই অসহায় অবস্থা যে অবশ্যম্ভাবী এই ধারণা আঁকড়ে ধরে থাকতে আপনারা মোটেই লজ্জিত নন·····নব জীবনের আলোকে জাগরিত হয়ে নিজেকে যদি পুনরুজ্জীবিত করতে না পারেন, তা' হলে আপনাদের পক্ষে মৃত্যুবরণ করে পৃথিবীর ভারমুক্ত করাই শ্রেয়।"

বস্তুত যে আদর্শগুলি তিনি তুলে ধরেছিলেন, তা' হল স্বাবলম্বন, আত্মোন্নতি এবং আত্মসম্মান। মহাত্মা গান্ধীর প্রচেষ্টা ছিল বর্ণহিন্দুদের বিবেকবুদ্ধি উদ্বুদ্ধ করে হিন্দুধর্মের কলংকস্বরূপ এই অস্পৃশ্যতাকে দূরীভূত করা এবং বর্ণভেদ প্রথাকে সংস্কার করে বর্ণাশ্রমকে রক্ষা তথা শোধন করা। পক্ষান্তরে, অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষেরা যাতে নিজেদের মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নিজেরাই সংগ্রামে অবতীর্ণ হয় সেই উদ্দেশ্যে তাদের পরিচালিত করবার চেষ্টা করেছিলেন ডঃ আম্বেদকর। তাঁর দাবী ছিল—"সাম্য এবং বর্ণাশ্রমের অবসান—এই দুটি মুখ্য নীতির উপর ভিত্তি করে হিন্দু সমাজের পুর্নগঠন।" আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করার কোন সংকল্প তাঁর ছিল না। মুখ্য প্রচেষ্টা তাঁর কেন্দ্রীভূত ছিল বর্ণভেদ প্রথাকে ধ্বংস করে হিন্দু সমাজকে ঢেলে সাজাতে। লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, ১৯২৭ সালের ডিসেম্বর মাসে অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের মাহার সম্মেলনে যখন ডঃ আম্বেদকর তাঁর পরিকল্পনার খসড়া রচনা করেন, ঠিক, সেই সময়েই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে ঘোষণা করা হয়, "পূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতাই হল ভারতবাসীর লক্ষ্য।" তৎকালীন সামাজিক, তথা রাজনৈতিক অবস্থায় পরিপ্রেক্ষিতে ডঃ আম্বেদকর নিজেকে এবং তাঁর বর্ণের সমস্ত মানুষকেই "হিন্দুধর্মের সীমানার বাইরের লোক" বলে মনে করতেন। ১৯২৮ সালে সাইমন কমিশনের সামনে তাই তিনি অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের মানুষদের 'হিন্দু সম্প্রদায়ের থেকে পৃথক স্পষ্টত সংখ্যালঘু—সম্পূর্ণরূপে পৃথক, স্বতন্ত্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায়" রূপে চিহ্নিত করবার দাবী করেন। অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের সংখ্যালঘু মানুষেরা শিক্ষার দিক থেকে অনেক পিছনে পড়ে রয়েছে। অর্থনৈতিক দিক থেকে অতি দরিদ্র ও সামাজিক দিক থেকে দাসত্ব-শৃংখলে আবদ্ধ, এবং তারা এমন কতগুলি রাজনৈতিক অক্ষমতার শিকার হয়ে রয়েছে যা' অন্য কোন সম্প্রদায়ের নেই"—এই যুক্তিতে তিনি প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার প্রবর্তনের ক্ষেত্রে অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষদের জন্য সংরক্ষিত আসনের দাবী জানান ; যদি স্বাধীন ভারতের ভাবী সংবিধানের কাঠাময় প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার না থাকে, তবে সেক্ষেত্রে অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষদের জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর দাবী করেন। এটা ছিল হিন্দুধর্মের উপর সরাসরি আক্রমণ। কারণ অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের মানুষের পক্ষে বর্ণহিন্দুদের সঙ্গে প্রতিটি ক্ষেত্রে সমপর্যায়ে হিন্দুধর্মের মধ্যে বসবাস করা যে সম্ভব নয়, সেটা এর দ্বারা স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছিল।

ফলে, ডঃ আম্বেদকর ও তাঁর সমর্থকদের সঙ্গে মহাত্মা গান্ধী, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস তথা বর্ণহিন্দুদের সমস্ত অংশের দেখা দিল প্রচণ্ড বিরোধ। ১৯৩০ সালের আগষ্ট মাসে নাগপুরে অনুষ্ঠিত প্রথম অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের কংগ্রেসে ড. আম্বেদকর মন্তব্য করেন, "কেবলমাত্র স্বরাজ সংবিধানেই রাজনৈতিক ক্ষমতা পাবার সম্ভাবনা রয়েছে, যেটা ছাড়া আমাদের সম্প্রদায়ের মানুষের মুক্তি নেই...কিন্তু এই প্রসঙ্গে আমি দৃঢ়ভাবে বলতে চাই যে, রাজনৈতিক ক্ষমতায় অন্ত্যজ ক্ষমতায় শ্রেণীর মানুষের দুঃখ-দুর্দশার প্রতিকার হতে পারে না। তাদের মুক্তি নির্ভর করছে তাদের সামাজিক উন্নতিসাধনের মধ্যে।" এই আন্দোলন "আমাদের সম্প্রদায়ের মানুষের মুক্তি এনে দেবে, এবং দেশে এমন একটি সমাজের প্রতিষ্ঠা করবে যে সমাজে রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক—অর্থাৎ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিটি মানুষেরই থাকবে সমান অধিকার।" ড. আম্বেদকরের দাবীসমূহের বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধীর তীব্র আক্রমণ ঘটল ১৯৩১ সালে লণ্ডনের গোলটেবিল বৈঠকে। "ভারতের তাবৎ অস্পৃশ্য সম্প্রদায় সম্বন্ধে ড. আম্বেদকরের কথা বলার অধিকার" নস্যাৎ করে দিয়ে তিনি বললেন, "তাঁর এই দাবী হিন্দুধর্মের মধ্যে কেবলমাত্র বিভেদেরই সৃষ্টি করবে, যা আমি কোনক্রমেই সমর্থন করতে পারি না; অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের লোকেরা ইসলাম অথবা খৃষ্টান ধর্মগ্রহণ করলেও আমার আপত্তি নেই। সেটাকে আমি সহ্য করব, কিন্তু এই ভাবে দুটি ভাগে বিভক্ত হলে হিন্দুধর্মের ভাগ্যে যা লেখা আছে, তাকে আমি বোধ হয় কোন রকমেই সহ্য করতে পারব না....।" তিনি আরও বললেন যে, আসন সংরক্ষিত না রেখে, যুক্ত নির্বাচকমণ্ডলীর ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে সম্প্রদায়ভুক্ত প্রার্থীরা যদি পরাজিত হয়, তা' হলে সেরূপ ক্ষেত্রে তারা আদালতে গিয়ে নিজেদের উপযুক্ততা প্রমাণ করুক। বস্তুত, ড. আম্বেদকর ও তাঁর ক্রমবর্ধমান সমর্থকবৃন্দ, এবং মহাত্মা গান্ধী, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও তার সমর্থকদের মধ্যেকার বিরাট ফাটলকে ভরাট করার ব্যাপারে এই সমস্ত মন্তব্য আদৌ সহায়ক হয় নি, এ কথাটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

ঐতিহাসিক দিক থেকে মৃত্যুমুখী এক সমাজব্যবস্থা তথা বর্ণভেদ থাকে মহাত্মা গান্ধী ভবিষ্যৎ স্বাধীন ভারতের ভিত্তিস্বরূপ বলে মনে করতেন; এবং সেই সমাজব্যবস্থা তথা প্রথাকে বাঁচাবার প্রয়াসে তিনি বর্ণহিন্দুদের সঙ্গে অস্পৃশ্য হিন্দুদের যুক্ত করবার যে সংগ্রাম শুরু করেছিলেন, সেই সংগ্রাম তিনি আদৌ পরিত্যাগ করেন নি। গোলটেবিল বৈঠকের ফলস্বরূপ ১৯৩২ সালের আগস্ট মাসে অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর ব্যবস্থা-সূচক সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ ঘোষিত হলে, উক্ত ব্যবস্থা বাতিল না হওয়া অবধি মহাত্মা গান্ধী আমরণ অনশনের দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা করেন। উল্লেখ করা দরকার যে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় কমিটির সর্বশেষ অধিবেশনে সাম্প্রদায়িক সমস্যার চূড়ান্ত ফয়সলার ব্যাপারে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীকে মধ্যস্থতা করবার ক্ষমতা দিয়ে যে স্মারকলিপি পাঠানো হয়েছিল গোলটেবিল বৈঠকে অংশ-গ্রহণকারী অন্যান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীও ছিলেন

তার অন্যতম স্বাক্ষরকারী। পরবর্তী পর্যায়ে সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের বিতর্কিত ধারাগুলি সম্বন্ধে পুণায় যখন মহাত্মা গান্ধী ও ড. আম্বেদকরের মধ্যে আলোচনা শুরু হল তখন বর্তমান হিন্দুসমাজব্যবস্থা সম্বন্ধে মুখ্য মতানৈক্যগুলি আবার স্পষ্ট হয়ে গেল। মহাত্মা গান্ধীর মতে বর্ণভেদ প্রথা খারাপ নয়; শুধু মাত্র বর্ণ-হিন্দুদের "একবার সুযোগ দিতে হবে যাতে তারা নিজেদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে হিন্দুধর্মকে শুদ্ধ করতে পারে", এবং তার পরে অস্পৃশ্যরা সমাজে পাবে উচ্চতর আসন। পক্ষান্তরে ড. আম্বেদকরের বক্তব্য ছিল, "নিম্নবর্ণের লোকেরা হল বর্ণভেদ প্রথারই কুফল। যতদিন পর্যন্ত বর্ণভেদ প্রথা থাকবে, ততদিন পর্যন্ত নিম্নবর্ণের মানুষও থাকবে। বর্ণভেদ প্রথার ধ্বংসসাধন ব্যতীত অন্য কোন ব্যবস্থাই নিম্নবর্ণের মানুষদের মুক্তি এনে দিতে পারবে না।" তিনি মনে করতেন, আর্থিক, শিক্ষা এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের অগ্রগতিই হল মুখ্য প্রয়োজনীয় বিষয়। মন্দির প্রবেশের অধিকার তাঁর মতে ছিল গৌণ বিষয়। কারণ, হিন্দুধর্ম তাঁদের অসম্মানজনক অবস্থার মধ্যে নিক্ষেপ করেছিল, তাতে মন্দির প্রবেশের অধিকারের সুফলের কোন প্রয়োজন ছিল না। আইনসভাগুলিতে অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের জন্য অধিকতর সংরক্ষিতর আসন ব্যবস্থার বিনিময়ে ড. আম্বেদকর তথাকথিত পুণা চুক্তিতে অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর দাবী পরিত্যাগ করেন। সংশ্লিষ্ট দলসমূহ কর্তৃক চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরদানের সঙ্গে সঙ্গে, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সাথে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে ড. আম্বেদকর বর্ণ হিন্দুদের উক্ত চুক্তিকে মান্য করতে সনির্বন্ধ আবেদন জানান, এবং দৃঢ় আশা প্রকাশ করেন যে, তাঁরা উক্ত চুক্তিকে অলঙ্ঘনীয় বলে মনে করবেন ও সেই অনুসারে সম্মানজনক মনোভাব সহকারে কাজ করবেন।

এই নতুন ব্যবস্থায় উভয় পক্ষেরই লাভ-লোকসান হয়েছিল কিছু-না-কিছু। অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের জন্য আইনসভাগুলিতে বর্ণহিন্দুদের ছেড়ে দিতে হয়েছিল দ্বিগুণ সংখ্যক আসন। পরিবর্তে পেয়েছিল অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের নির্বাচিত করার অধিকার। প্রথমে মনে হয়েছিল, বর্ণহিন্দু ও অস্পৃশ্য হিন্দুদের মধ্যেকার কঠোর সম্পর্কে কোন-না-কোন ধরনের শিথিলতা হয়তো গড়ে উঠবে। বিশ শতকের গোড়ার দিকে গান্ধীজী অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের লোকেদের মন্দিরে প্রবেশের অনুকূলে ছিলেন না। কিন্তু ১৯৩৩ সনের জানুয়ারী মাসে তিনি ঘোষণা করলেন, অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের লোকেদের জন্য মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত করে না দিলে তিনি অনশন করবেন। ড. আম্বেদকর অবশ্য আবার দৃঢ়তা সহকারে বললেন যে অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের মানুষদের যে সমস্ত মুখ্য সমস্যা এবং অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে, তার কোন সমাধান এতে হবে না। "...তাদের মুক্তির নিশ্চিততম পন্থা হল উচ্চশিক্ষা, উচ্চ-চাকুরি এবং জীবনধারণের জন্য সুষ্ঠুতর রোজগারের ব্যবস্থা করা। সমাজজীবনে একবার ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারলেই তারা পাবে সম্মান; এবং একবার সম্মানের আসনে বসতে পারলেই তাদের প্রতি গোঁড়া হিন্দুদের ধর্মীয়

দৃষ্টিভঙ্গি নিশ্চিতরূপেই পরিবর্তিত হবে। আর তা' যদি নাও হয়, তবু এটা তাদের বাস্তব স্বার্থের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।...হিন্দুধর্মকে যদি তাদের ধর্ম হতে হয়, তা' হলে তাকে হতে হবে সামাজিক সাম্যভিত্তিক ধর্ম। তবেই হিন্দুধর্ম তাদের আপনজন বলে স্বীকার করে নেবে; বহিরাগত বলে উপেক্ষা করবে না...যেটা আশু প্রয়োজন, তা' হল চতুর্বর্ণের মতবাদ থেকে হিন্দুধর্মকে উদ্ধার করা। সমস্ত অসাম্যের মূলই হল এই চতুর্বর্ণ; এই-ই হল বর্ণভেদ এবং অস্পৃশ্যতার মতো আরেক ধরনের অসাম্যের জনক।"

ড. আম্বেদকরের এই নতুন প্রয়াস রাজনৈতিক লাভ তথা ক্ষমতাএবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি বিধানের প্রতি তাঁর অনুগামীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। এর ফলে তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং নীতির বিরুদ্ধে শুরু হয় সর্বরকমের তীব্র ও ব্যাপক আক্রমণ। অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষদের মন্দিরে প্রবেশের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান বিরোধিতা, পুণা চুক্তি বাতিলের দাবীতে বিভিন্ন প্রস্তাব এবং ড. আম্বেদকরের বিরুদ্ধে সংবাদপত্রগুলির ব্যাপক বিষোদ্গার, বর্ণহিন্দু ও অস্পৃশ্য হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যেকার বিভেদের প্রাচীর দৃঢ়তর করতে নবোদ্যমে চাপ বৃদ্ধি করে চলে। মহাত্মা গান্ধী নিজেও অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের জন্য কিছুকাল প্রয়াস চালিয়ে ছিলেন। তিনিও আক্রমণের হাত থেকে রেহাই পাননি। গোঁড়া হিন্দুসমাজের বাঘা বাঘা সমালোচকেরা তাঁকে অভিহিত করেন শয়তান বলে। যে সমস্ত হিন্দু নেতা পুণা চুক্তিকে অনুমোদন করেছিলেন, তাঁরা প্রায় সবাই এই চুক্তির বিরুদ্ধে চলে যান, এবং গান্ধীজীর হরিজন আন্দোলনের প্রতিও তাঁদের আগ্রহ ক্রমশ স্তিমিত হয়ে আসে। শেষ পর্যন্ত হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজের পরিবর্তনসাধনের সংগ্রাম বন্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন ড. আম্বেদকর। কারণ হিন্দুসমাজে প্রাথমিক অধিকার ও সমমর্যাদা প্রাপ্তির সংগ্রাম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। ১৯৩৫ সালের অক্টোবর মাসে ইলোরা সম্মেলনে তিনি হিন্দুধর্মের সঙ্গে সমস্ত সংস্রব ছিন্ন করে অন্য কোন ধর্মমতের আশ্রয় নিয়ে সান্ত্বনা এবং আত্মসম্মান লাভের চেষ্টা করতে অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের কাছে আবেদন জানান—এমন একটি ধর্মমত, যা তাদের দেবে সমমর্যাদা, নিরাপদ আশ্রয় এবং ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার। তদনুসারে অস্পৃশ্য সম্প্রদায়কে বর্ণহিন্দু সম্প্রদায়ের সমপর্যায়ে উন্নীত করে হিন্দু সমাজের উভয় অংশের সমন্বয়সাধনপূর্বক ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী এবং বলিষ্ঠ এক হাতিয়ার রূপে গড়ে তোলবার যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল, তা' বন্ধ করবার একটি প্রস্তাবও উক্ত সম্মেলনে গৃহীত হয়। এই সিদ্ধান্ত দেশব্যাপী সাড়া জাগিয়ে তুলল। মহাত্মা গান্ধী এই সিদ্ধান্তে দুঃখ প্রকাশ করে বললেন, "ধর্মমতের পরিবর্তন...তাদের অন্তরের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারবে না।" অধিকাংশ হিন্দুদেরই মতামত এই ব্যাপারে হয়ে পড়ল দ্বিধাবিভক্ত। অচঞ্চল এবং নির্বিকার রইল অনেকে; অনেকে আবার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। পক্ষান্তরে মুসলমান ও খৃস্টানরা এই পরিস্থিতির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে হয়ে উঠল সচেষ্ট। তাদের আশা হল, ড. আম্বেদকরের ঘোষণা কার্যকরী হলে

দেশের ভারসাম্য তাদেরই দিকে ঝুঁকে পড়বে। ড. আম্বেদকর ও তাঁর সম্প্রদায়ের মানুষদের বৌদ্ধধর্মের ছত্রছায়ায় সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে মহাবোধি সোসাইটির সম্পাদক জোর দিয়ে বললেন, "বৌদ্ধদের মধ্যে ধর্ম অথবা সামাজিকভাবে অযোগ্য কেউ নয়। ধর্মান্তরিত প্রতিটি মানুষকে আমরা সমমর্যাদা প্রদান করবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকি। কোন প্রকার বর্ণভেদপ্রথা নেই আমাদের মধ্যে।" ইতিমধ্যে ড. আম্বেদকরের কাছে তাঁর সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য বিভিন্ন সহানুভূতিসম্পন্ন মহল থেকে অনুরোধ আসতে থাকে। সেগুলির জবাবে ড. আম্বেদকর বলেন যে, ধর্মান্তর গ্রহণের কাজটি সম্পন্ন করা হবে বছর পাঁচেক পরে, যদি অবশ্য এর মধ্যে বর্ণহিন্দুরা তাদের সুস্পষ্ট ব্যবহার দ্বারা তাঁকে নিজ সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করতে প্রলুব্ধ না করে। লক্ষণীয় তথা আকর্ষণীয় ব্যাপার হল এই যে, কেবল-মাত্র মাহার সম্প্রদায়ের লোকেরা ছাড়া অধিকাংশ অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরাই ড. আম্বেদকরের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মতামত ব্যক্ত করেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল, শুধু-মাত্র ধর্মান্তর গ্রহণ অধিক অথবা অন্য কোনভাবে তাঁদের ভাগ্যকে পরিবর্তন করতে পারবে না। অন্ত্যজ শ্রেণীর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে পূর্বে ড. আম্বেদকরের যে একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল, তার বিরুদ্ধে ক্রমশ বহু ব্যক্তই সোচ্চার হয়ে উঠেন এবং ভারতব্যাপী অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের উপর তাঁর যে প্রভাব ছিল, তাও ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসতে থাকে। ড. আম্বেদকর কর্তৃক নির্ধারিত সময়-সীমার পরেও বিভিন্ন কারণে পূর্বঘোষিত ধর্মান্তরিতকরণ ঘটে নি। সেটা ঘটেছিল প্রায় কুড়ি বছর পরে। এটা অবশ্য বিস্ময়ের কিছু নয় যে, ১৯৫৬ সালে নাগপুর শহরের উপান্তে ধর্মান্তর গ্রহণ অনুষ্ঠানে সেই সমস্ত অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের লোকেরাই মুখ্য তথা অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, যারা ১৯৩৫ সালের হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করার সেই বিতর্কিত তথা গুরুতর সিদ্ধান্তের পরেও তাঁর আনুগত্য ত্যাগ করে নি।

বর্ণাশ্রম প্রথার বিলুপ্তি ঘটিয়ে এবং সমস্ত হিন্দুদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা তথা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সমপর্যায়ে স্থাপন করে হিন্দুধর্মের সমাজব্যবস্থায় যে একটি অসাধারণ বিপ্লবী প্রচেষ্টায় শুরু হয়েছিল, তার উপর যবনিকাপাত হল উক্ত অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গেই। এই নাটকীয় প্রচেষ্টার প্রথম অঙ্ক, এবং কুড়ি বছর পরে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষাগ্রহণ—এই দুটি ঘটনার মাঝখানে রয়েছে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের আরো বহু বছরের অদম্য সংগ্রাম, ভারতের জনগণের দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দিনগুলি, ভারতে ব্রিটিশ রাজত্বের অবসান এবং স্বাধীন ভারতের এক নতুন ভবিষ্যতের মধ্যে পদক্ষেপ। নব ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু ড. আম্বেদকরকে নিজ মন্ত্রিসভায় কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রীরূপে যোগদান করতে অনুরোধ করেন। ড. আম্বেদকরও অতীতের গ্লানিকর ঘটনা সকল ভুলে গিয়ে তাতে রাজী হন। ভারতের ইতিহাসে তাঁর নাম "ভারতীয় সংবিধানের জনক" রূপে স্থান পায়। কিন্তু প্রস্তাবিত হিন্দু কোড বিলে হিন্দুধর্মকে সংস্কার করবার নব প্রচেষ্টায় তিনি ব্যর্থ হন। কারণ লোকসভায় জনৈক সদস্যের মন্তব্য অনুসারে

সেই প্রচেষ্টা "হিন্দু সংস্কৃতির মহান কাঠামোকে ছিন্ন-ভিন্ন করে ফেলবে, এবং নষ্ট ক'রে ফেলবে এমন এক প্রগতিশীল উদার জীবনপ্রণালীকে যা শত শত বৎসর ধরে পরিবর্তনের সঙ্গে আশ্চর্যভাবে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছে!" ড. আম্বেদকর দেখলেন, মন্ত্রিসভার সদস্যরূপে থাকবার আর কোন সার্থকতা নেই। সুতরাং ১৯৫১ সালের অক্টোবর মাসে মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করলেন তিনি।

বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের সমসাময়িক সময়ে তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শ তথা ধ্যান-ধারণা কিরূপ ছিল, সে সম্বন্ধে খানিকটা আলোচনা করা যেতে পারে। এই ঘটনার কয়েক মাস পূর্বে তিনি ভারতে গণতন্ত্রের ভবিষ্য-চিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলেন। সেই প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "গণতন্ত্রের মূল অন্বেষণ করতে হবে সামাজিক সম্পর্কের ভিতরে, যাদের নিয়ে সমাজ গঠিত, তাদের সম্মিলিত জীবনযাত্রার পরিপ্রেক্ষিতে।" জীবনের সর্বক্ষেত্রেই ভারতীয় সমাজ বর্ণবৈষম্যের উপর ভিত্তি করে রয়েছে, সে বৈষম্য আর্থিক, সামাজিক অথবা রাজনৈতিক যাই হোক না কেন। সুতরাং গণ-তন্ত্রের মূল দাবীকে পরিপূরণ করতে হলে, এই সমাজব্যবস্থাকে বদলাতেই হবে। ভারতে গণতন্ত্রের ভবিষ্যতকে উজ্জ্বলতর করার ব্যাপারে তিনি 'বর্ণভেদ প্রথাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে উৎসুক সেই ভারতীয় সমাজের নিম্নতর স্তরের" মধ্যে শিক্ষা বিস্তারকেই চূড়ান্ত বলে চিহ্নিত করেছিলেন। এর কয়েক বৎসর পূর্বে গণতন্ত্রের সংজ্ঞা নির্দেশ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেছিলেন, এহল "এমন এক ধরণের তথা এমন এক নিয়মের সরকার, যেখানে বিনা রক্তপাতে জনগণের অর্থনৈতিক তথা সামাজিক জীবনধারায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনা যায়।" এ ছাড়া, যাকে তিনি বলতেন রাষ্ট্রীয় সমাজবাদ—তাতেই ছিল তাঁর বিশ্বাস। "ভারতে দ্রুত শিল্পোন্নয়নের জন্য রাষ্ট্রীয় সমাজবাদ অত্যাবশ্যক। বে-সরকারী উদ্যম এটা করতে পারে না, যদিও বা তা পারে, সেক্ষেত্রে বেসরকারী পুঁজিবাদ ইউরোপে যেমন ধন-বৈষম্যের সৃষ্টি করেছে, তেমনি বৈষম্যের জন্ম দেবে। ইউরোপের এই ঘটনা ভারতবাসীর কাছে সাবধান-বাণী স্বরূপ হওয়া উচিত। ভূসম্পত্তির পুনর্বিন্যাস এবং প্রজাস্বত্ব আইন—এ সমস্তই হল একেবারে অকেজো ব্যবস্থা। এর দ্বারা কৃষিব্যবস্থার কোন রকম উন্নতি হতে পারে না। ভারতের ছয় কোটি অস্পৃশ্য শ্রেণীর মানুষ হল স্রেফ ভূমিহীন মজুর। ভূসম্পত্তির পুনর্বিন্যাস অথবা প্রজাস্বত্ব আইন কোনটাই এদের কোন রকম মঙ্গলসাধন করতে পারে না। এদের মঙ্গলসাধন করতে পারে একমাত্র যৌথখামার ব্যবস্থা···। সরকার হবে জমির মালিক, জাতি অথবা ধর্মের কোন প্রকার পার্থক্য না করে গ্রামবাসীদের মধ্যে জমির বিলি-ব্যবস্থা করতে হবে, এবং তা করতে হবে এমনভাবে যাতে কোন জমিদার, কোন প্রজা কিংবা কোন ভূমিহীন মজুর না থাকে।" এই রাষ্ট্রীয় সমাজবাদ অবশ্য তিনি কায়েম করতে চেয়েছিলেন সাংবিধানিক আইনের মারফত যাতে আইনসভা অথবা প্রশাসন কোন আইন বলেই এর কোন রকম পরিবর্তন না করতে পারে। তাঁর মতে সংসদীয় গণতন্ত্র বজায় রেখে এবং একনায়কত্ব এড়িয়ে একমাত্র এই পথেই সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার কাজে সাফল্য

আসা সম্ভব। এই ব্যবস্থার পূর্বসর্ত হিসাবে তিনি সমাজব্যবস্থার সংস্কারসাধনের উপরে গুরুত্ব আরোপ করেন। "সমাজবাদীরা যদি···সমাজবাদকে নিশ্চিতরূপে বাস্তবে রূপায়িত করতে চান, তা' হলে সামাজিক সংস্কারই যে মূল সমস্যা, একথা তাঁদের মানতেই হবে—এটা না করলে তাঁদের বিপ্লব কোন দিনই সফল হবে না। বিপ্লবের আগে না হলেও, বিপ্লবের পরে জাত-পাত সমস্যার মোকাবিলা করতেই হবে।" ড. আম্বেদকর একটা সত্য উপলব্ধি করতে পারেন নি; সেটা হল, সামাজিক পরিবেশ এবং সামাজিক প্রথা,—এগুলি হ'ল বাস্তব অর্থনৈতিক অবস্থা তথা উৎপাদন-ব্যবস্থার প্রতিফলন মাত্র এবং এই দুটি ব্যবস্থাকে বদলে দিলেই, সামাজিক প্রথারও পরিবর্তন আসতে বাধ্য। তাই তিনি ভারতের সমাজিকব্যবস্থার পরিবর্তন করাটাকেই মুখ্য কর্তব্যজ্ঞানে আপন সমস্ত রাজনৈতিক কর্মতৎপরতার মাধ্যমে আগাগোড়া চেষ্টা করে গেছেন।

হিন্দুধর্মের মধ্যে থেকে ড, আম্বেদকর উক্ত লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারেন নি। তাই তিনি আশা করেছিলেন যে, বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করলে তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ হবে। কিন্তু যে-সাফল্যটুকু পাওয়া গেল, তার দ্বারা লাভবান হল অন্ত্যজ শ্রেণীর মুষ্টিমেয় জনকয়েক শিক্ষিত ব্যক্তি। গ্রামাঞ্চলের হাজার হাজার অশিক্ষিত মানুষের অর্থ-নৈতিক দিক থেকে বলতে গেলে কোন রকম পরিবর্তনই আসে নি। আধুনিক যুগের সব চাইতে উপযোগী ধর্ম বলে তাঁর মনে হয়েছিল বৌদ্ধধর্মকে। কারণ, তাঁর মতে, বৌদ্ধধর্মে ছিল এমন সমস্ত নৈতিক নিয়মাবলী, যা মানবসমাজের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয়; এই ধর্ম হল বিজ্ঞান তথা মানবিক যুক্তিসম্মত এবং এই ধর্ম সর্বমানবের মুক্তি, সাম্য এবং ভ্রাতৃত্ব ঘোষণা করে। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল—দেশের আপামর জনসাধারণ দলে দলে এই ধর্মে ধর্মান্তর গ্রহণ করবে এবং এইভাবে ভারত পরিণত হবে এক বৌদ্ধধর্মাবলম্বী দেশে। এই কারণেই তিনি ১৯৫৬ সালের ১৪ই অক্টোবর তারিখে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

প্রখ্যাত সমাজ বিজ্ঞানী তথা ভারত তত্ত্ববিদ জার্মান পণ্ডিত ড. হাইনস্ মোদের নাম আমাদের দেশের প্রগতিশীল মানুষের কাছে খুবই পরিচিত। তাঁর ছাত্র অধুনালুপ্ত পূর্ব জার্মানির বৌদ্ধ-গবেষণা কেন্দ্রের গবেষক ড. জোয়াখিম পিউকে এ প্রবন্ধটি লেখেন সত্তরের দশকে। মূল জার্মান ভাষা থেকে এটি অনুবাদ করেন—শ্রীবিজন চক্রবর্তী। ১৩৮১ বঙ্গাব্দের পৌষসংখ্যা 'চতুষ্কোণ' পত্রিকায় প্রবন্ধটি মুদ্রিত হয়। পরে একটি সুন্দর-মুখবন্ধসহ এটি প্রকাশিত হয় - 'কোন্ পথে' (পরিবর্তিত নাম পথসংকেত) পত্রিকায় ১৯৮১ সালে। দুটি পত্রিকার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে লেখাটি এখানে প্রকাশ করা হল।

—সম্পাদক।

CENTRAL LIBRARY

□ বিমান বসু

ড. আম্বেদকর ও সংরক্ষণ সম্পর্কে কয়েকটি কথা

আম্বেদকর ছিলেন ভারতের শোষিত মানুষের এক অকৃত্রিম বন্ধু ও বিরল নেতৃত্ব। যদিও যে নেতৃত্ব তিনি দান করেছিলেন, তা' কেবলমাত্র এই নিপীড়িত শোষিত দলিত সমাজের জন্যই নয়, তা' ছিল মূলত সমগ্র দেশের বৃহত্তর স্বার্থের জন্যই নিবেদিত। তৎকালীন যুগ-পরিবেশে নিসঃঙ্গ এই প্রাজ্ঞ মানুষটি নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত-বেদনার-বেদীমূল থেকে তাঁর সংগ্রামের প্রেরণা লাভ করেছিলেন। তাই জীবনের নানা উত্থান-পতনেও তিনি কখনই ভুলে যান নি সেই সব মানুষদের, যাঁদের মধ্য থেকে তিনি এসেছিলেন। তাঁদের মুক্তির পথ সন্ধান, আর তার জন্য নিরবিচ্ছিন্ন আন্দোলনে তিনি নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। উৎসর্গ করেছেন তাঁর জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত। যথার্থ অর্থে এই যাত্রা তাঁর শুরু হয়েছিল ১৯২৪ সালে **'বহিষ্কৃত হিতকারিণী সভা'** গঠনের মাধ্যমে। সেই হিত কারিনী সভার কর্ম প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তিনি যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন তাকেই মূলধন করে তিনি সমাজের সমগ্র নিপীড়িত শোষিত মানুষদের নিয়ে একটি রাজনৈতিক দলগঠনের স্বপ্নও দেখেছিলেন। ঐ অভীষ্ট-দলের কর্মসূচী ও ভবিষ্যৎ রূপরেখাও তিনি রচনা করেছিলেন। যদিও জীবিত অবস্থায় সেই দল তিনি গঠন করে যেতে পারেন নি। কিন্তু তার মৃত্যুর পর 'রিপাবলিকান' পার্টি গড়ে উঠেছিল। ঐ দলের কর্মসূচী ড. আম্বেদকরের বক্তব্য অনুযায়ী কতটা নির্ধারিত হয়েছে, সেটা পর্যালোচনার বিষয়। কিন্তু এখানে আমাদের যা বিচার্য বিষয় সেটা হল জাত পাতের সমস্যা সমাধান করার জন্য বর্তমানে কাঁশিরাম প্রমুখের নেতৃত্বে "বহুজন সমাজ পার্টি" সহ অন্যান্য যে রাজনৈতিক দল গঠিত হয়েছে, তার ভূমিকা সম্পর্কে। দলিত মানুষের সমস্যার সত্যিকারের সমাধান কি, এইসব দলের কর্মসূচীতে আছে? এ প্রসঙ্গে আলোচনায় দু একটি সাম্প্রতিক ঘটনা তোলা যাক্, যেমন—কয়েক মাস আগে দিল্লীতে একটি ঘটনা ঘটেছে। মোহনদাস করম চাঁদ গান্ধীর একটি মর্মর মূর্ত্তি দিল্লীর রাজঘাটে আছে। কাঁশিরামের দলের নেতৃত্বে কতিপয় ব্যক্তি ঐ মূর্তি অপসারণের চেষ্টা করে, চেষ্টা করে সমাধি ভাঙ্গার এবং সেখানে ভীমরাও আম্বেদকরের মূর্তি বসাতে হবে—এই শ্লোগান ও দেয়।—এটা যেমন সমাধানের পথ নয়। তেমনি আবার এটাও সমাধানের পথ নয়—যখন মহারাষ্ট্রে আম্বেদকর বিশ্ববিদ্যালয় তৈরী করার জন্য বিল পাশ হল তখন কিছু মানুষ বিরোধিতায় নেমে এল ড. আম্বেদকর বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের বিরুদ্ধে, যার মধ্যে ছিল বুদ্ধিজীবীদের একটি অংশ—বিশেষ করে তথা কথিত উচ্চবর্ণের মানুষের একটি অংশ এনিয়ে বিদ্বেষ

CENTRAL LIBRARY

ছড়াতে শুরু করল এবং এইভাবে তারা কিন্তু আবার একটা জাতপাতের সংঘর্ষে মহারাষ্ট্রের মানুষকে যুক্ত করে দিল। এসব দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা এই জন্যে যে, সত্যিকারের সমাধানের পথটা কি তার দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

১৯২৮ সালে সাইমন কমিশনের সামনে ড. আম্বেদকর যে বক্তব্য উত্থাপন করেছিলেন সেই বক্তব্য কিন্তু ১৯৩০ সালে যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল তাতে জায়গা পায়নি। তবে ১৯৩৫ সালে ভারতীয়দের দিয়ে শাসন পরিচালনা করার জন্য ব্রিটিশরা যে আইন রচনা করে সেই আইনে সংরক্ষণের কিছু ছোটখাটো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। তারপর থেকে নানা পরিক্রমার মধ্য দিয়ে ১৯৫০ সালে সংবিধানে সংরক্ষণের জন্য প্রথম পর্যায়ে ১০ বছর সময়সীমা অর্থাৎ ১৯৬০-এর ২৫শে জানুয়ারী পর্যন্ত মেয়াদ নির্দিষ্ট করা হয়। সেই মেয়াদের মধ্যে অর্থনৈতিক দিক থেকে ও সামাজিকভাবে পশ্চাদপদ এবং বঞ্চিত যারা তাদের জন্য সংরক্ষণ আইন গৃহীত হয়।

ড. আম্বেদকর, সংরক্ষণ নীতি প্রয়োগের মাত্র ছয় বছরের মধ্যে, উপলব্ধি করলেন এই সংরক্ষণ মূল সমাধান নয়। যদিও আজ আর সে সব আলোচনা করে লাভ নেই। কারণ কংগ্রেস (আই) সরকারের নেতৃত্বে দীর্ঘ ৪০ বছর যে অর্থনৈতিক নীতি, যে শিল্পনীতি, যে সামাজিক নীতি ; ন্যায় বিচারের নামে পরিচালনা করা হয়েছে তার মধ্য দিয়ে এটা পরিষ্কার ফুটে উঠেছে যে, সমাজের যে অংশের মানুষ অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়েছেন, বঞ্চিত হয়েছেন,—একটু বেশী শোষিত হয়েছেন, যাদের সত্যিকারের সামাজিক মর্যাদা যেভাবে পাওয়া উচিত সেভাবে সামাজিক মর্যাদা তারা পাচ্ছেন না ; সেই পিছিয়ে পড়া মানুষদেরকে অগ্রসর মানুষদের সারিতে এনে দাঁড়করাতে না পারলে সামগ্রিক ভাবে সমাজ-প্রগতি সম্ভব নয়।

ঠিক এই কথাই ড. জয়পাল সিং বলেছিলেন তফসিলী উপজাতি সম্পর্কে তথা তাঁদের উন্নয়ন সম্পর্কে। প্রথমে ড. সিং ঝাড়খণ্ড পার্টি তৈরী করেছিলেন এবং ১৯৫২ সালের পর যখন তিনি লোকসভাতে নির্বাচিত হলেন, তারপর তিনি দেখলেন ঠিক এইভাবে আলাদা করে (সামগ্রিক সমাজের উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে) তফসিলী উপজাতির মানুষেরা অগ্রসর হতে পারবে না। বিচ্ছিন্নভাবে সংগ্রাম করে তা সম্ভবও নয়। নানা চিন্তা ভাবনার পর তিনি সমগ্র সমাজ ধারার সঙ্গে তফসিলী উপজাতি মানুষের উন্নয়নের ধারাকে যুক্ত করে—শোষিত, নিপীড়িত, বঞ্চিত মানুষের আন্দোলনকে এগিয়ে নেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন।

আজকে ভারতবর্ষে জাতপাত, ধর্ম, বর্ণের যে সমস্যা বিরাজ করছে, যে আকার নিয়ে তা অবস্থান করছে, তার জন্য দায়ী ভারতের শাসকগোষ্ঠী তথা কংগ্রেস (ই) পার্টি। তাদের যে শোষণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং তার সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে যে বহিঃপ্রকাশ তার ফলশ্রুতি হিসাবে আজকে মানুষের মধ্যে এই বিচ্ছিন্নতা এবং মানুষের 'একলা চলরে' ভাব, তথা আলাদা করে লড়াই করে এগিয়ে

যেতে হবে—এই ভ্রান্ত চিন্তার প্রাধান্য। আর এই ভ্রান্ত চিন্তার শিকার শুধু যে সেই অংশের মানুষেরা হচ্ছেন তা নয়—অন্য অংশকেও তা ধ্বংস করছে। যদিও একথা ঠিক যে পশ্চিমবাংলার বুকে আমরা হয়তো সবটা উপলব্ধি করতে পারি না। যে জাতপাতের সমস্যাটা কি আকার নিয়ে ভারতবর্ষে বিরাজ করছে।

যদি বিহারের কোন প্রান্ত সীমায় বা অন্ধ্রপ্রদেশের একটি গ্রামে অথবা তামিলনাড়ুর কোন পল্লীতে কেউ যান—তবে এই বৈষম্য দেখতে পাবেন। এমনকি মহারাষ্ট্রে যেখানে ওয়ার্লি বিদ্রোহ হয়েছিল, যেখানে গোদাবরী পারুলেকর একটা গৌরবজনক ভূমিকা পালন করেছিলেন—সেই ওয়ার্লি বিদ্রোহের কেন্দ্রস্থলেও যদি যাওয়া যায় অথবা যদি কর্ণাটকের একটি অজগ্রামে পৌঁছে যান কেউ, তাহলে দেখতে পাবেন, তপসিলী জাতি-উপজাতির মানুষেরা অন্যদের সঙ্গে আজও একসাথে পংক্তি ভোজন করতে পারেন না।

এই সকল অঞ্চলে যে কুয়ো আছে, যেটা ব্রাহ্মনেরা এককালে তৈরী করিয়েছেন, যে কুয়ো থেকে তথাকথিত সমাজের উচ্চবর্ণের মানুষ জল তোলে সেই কুয়ো থেকে সমাজের তথাকথিত পশ্চাৎ অংশের মানুষ যদি একটু জল তুলতে যান, তাহলে তার উপর লেঠেল বাহিনীর আক্রমণ সংঘটিত হয়। কখনোবা বন্দুক দিয়ে গুলি করা হয়।

আমি বিহারের একটা অনুরূপ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলাম ঃ পশ্চাৎপদ অংশের একটি পরিবার। যাদের বাড়ীর ধারে-কাছে কোন কুয়ো নেই। কোন টিউবওয়েল নেই। দূর থেকে টিউবওয়েলের জল আনতে হয়। বাড়ীতে অসুখ করেছে—এক্ষুনি জল দরকার। রাত দেড়টা। সামনে একটা কুয়ো। কুয়োটা উচ্চ বর্ণের মানুষেরা ব্যবহার করে। সেখানে একজন নিম্ন বর্ণের মানুষ জল তুলতে গেছেন। জল তোলবার সময় বালতিটা হঠাৎ হাত থেকে ফসকে পড়ে যায় এবং আওয়াজ হয়, সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসে লেঠেল বাহিনী এবং এমন প্রহার করে যে তাকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় হাসপাতালে যেতে হয়। কেবল প্রহার নয়; এই অত্যাচার কত নিষ্ঠুর হয় সে বিষয়ে খুশবন্ত সিংহের একটা লেখা পড়ে ছিলাম। সেখানে তিনি জাতপাতের অত্যাচারের এইসব কাহিনী তুলে ধরে ছিলেন।

এদেশে মার্কসবাদী চিন্তার যাঁরা প্রবক্তা বলে পরিচিত যেমন প্রয়াত কমঃ পি. সুন্দরাইয়া যিনি ভারতের মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির সম্পাদক ছিলেন—তিনিও এই প্রশ্ন তুলেছিলেন যে এদের সমাধান কোন পথে? ১৯৭৩ সালে National Integration Council'-এ প্রদত্ত স্মারক লিপিতে বলেছিলেন যে, সমাজের পশ্চাদপদ অংশের তথা বিভিন্ন প্রদেশের অনগ্রসর এলাকার মানুষের উন্নয়ন করা যদি আমাদের উদ্দেশ্য হয়,—তাহলে আমাদের উন্নয়ন পরিকল্পনা, আমাদের কর্মসূচী, সামগ্রিক উন্নয়নের দৃষ্টি ভঙ্গিতে পরিচালিত করতে হবে। যেমন—(১) যে সমস্ত শিল্পোন্নত অঞ্চল আছে সেই শিল্পোন্নত অঞ্চলের সঙ্গে শিল্পে অনগ্রসর অঞ্চল কে যুক্ত করতে হবে এবং (২)শিল্প-শ্রমিক ও কৃষি-শ্রমিকদের ন্যায়-

বিচারেরর জন্য সামাজিক দিক থেকে গ্যারাণ্টি দিতে হবে। এই প্রসঙ্গে আমাদের প্রয়াত সম্পাদক পলিট ব্যুরো সদস্য কম বি. টি রণদিভের অথবা পার্টির প্রাক্তন সম্পাদক ই. এম. এস নাম্বুদ্রিপাদের সুচিন্তিত বক্তব্য আছে। যাইহোক আমরা দেখি প্রতি বছর সরকার নিয়োজিত তফসিলী জাতি উপজাতি কমিশন তাদের রিপোর্টে সমস্যার সমাধানের যে সুপারিশ করে থাকে, সেই সুপারিশগুলো কার্যকরী হয়না। অর্থাৎ রিপোর্ট পেশের পর আর কিছুই হয়নি।

১৯৫৩ সালে প্রথম সিডিউলকাণ্ট এ্যাণ্ড সিডিউল ট্রাইবস্ কমিশন হল। সেই থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত ২৩তম কমিশনের রিপোর্ট যদি আমরা একবার প্রথম পাতা থেকে শেষ পাতা পর্যন্ত পর পর পড়ে যাই, তাহলে দেখতে পাব, একই কথা বার বার আসছে, আর সামাজিক অন্যায় অবিচার অত্যাচার নিপীড়ন বেড়েই চলছে। অর্থাৎ সরকার তার কাজ সারছেন রুটিন মাফিক সমীক্ষা করা, পর্যালোচনা করা, এবং তারপর সেই রিপোর্ট রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করা এবং লোকসভায় পেশ করার মাধ্যমে। তা লোকসভায় আলোচনাও হয়েছে। রাজ্যসভার কাছে পেশও করা হয়েছে।—প্রতিবিধান কি করা হয়েছে এই প্রশ্ন যদি আসে—তখন স্বাভাবিকভাবে আসে আমাদের সামনে কর্তব্যের কথা; সমস্যার সমাধান কোন্ পথে, সেকথা। সামগ্রিক উন্নয়নের দৃষ্টি ভঙ্গিতে আন্দোলনের চেহারা নিয়ে অগ্রসর হতে হবে, সামাজিক ন্যায় বিচারের জন্য অর্থনৈতিক দিক থেকে যে বৈষম্য তার প্রতিবিধান করতে হবে। শিক্ষার দিক থেকে অনগ্রসরতার যে কারণগুলো আছে, সেই গুলো উপড়ে ফেলার কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে হবে।—এসব না হলে কেবল রিপোর্ট ছেপে, বাস্তবে কোন ফল লাভ হবে না।

পশ্চিমবাংলায় ১৯৭৭ সালে বামফ্রণ্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ভারতের শোষণ ভিত্তিক রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যেই। অর্থাৎ তার যে অর্থনৈতিক নীতি, তার যে শিল্পনীতি তাকে মেনেই চলতে হয় এই সরকারকে। অংগরাজ্য হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের সরকারকে সীমাবদ্ধ ক্ষমতা নিয়ে সীমাবদ্ধ অধিকার নিয়ে, কাজ করতে হয়। সারা ভারতবর্ষে চাষযোগ্য যত জমি আছে তার শতকরা চার ভাগ পশ্চিমবঙ্গে আছে। কিন্তু সারা ভারতবর্ষে যত খাসজমি সরকার অধিগ্রহণ করেছে তার মোট জমির মাত্র শতকরা ২৪ ভাগ। আর যত জমি বিলি বণ্টন করা হয়েছে তার শতকরা ২০ ভাগ হয়েছে পশ্চিমবঙ্গেই এবং এর আবার ৫৭% পেয়েছেন সমাজের তফসিলী জাতি উপজাতির লোকেরা। যথার্থ ভূমি সংস্কার যদি না করা যায় এবং সামাজিক দিক থেকে লাঞ্ছিত এবং ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত যে মানুষ, তাদের হাতে যদি জমি না আসে; তার মজুরীর প্রশ্নে যদি গ্যারাণ্টি তৈরী না হয়; যদি সামাজিক মর্যাদার জন্যে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে না ওঠে, তা হলে তাদের সমস্যার যথার্থ সমাধান কখনো সম্ভব নয়।

ভারতবর্ষের মতো বহু ভাষাভাষী, বহু জাতির এবং বহু ধর্মাবলম্বী মানুষের দেশে জাতপাতের সমস্যার সমাধানের প্রশ্নে সংরক্ষণ নীতি কখনই একমাত্র ফলপ্রসূ

রক্ষা-কবচ হতে পারে না, যদিও সংরক্ষণ নীতির প্রয়োজন আছে। আমি সংরক্ষণ নীতির বিরোধী নই। অনেকেই জানেন এ প্রসঙ্গেও কাকা কার্লেকারের রিপোর্ট সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ আছে।

এ ছাড়া সাম্প্রতিক কালের মণ্ডল কমিশনের রিপোর্টের কথা প্রায় সকল মানুষই জানেন। কমিশনের চেয়ারম্যান প্রাক্তন সাংসদ শ্রী বি. পি. মণ্ডল ছাড়াও সেই কমিশনের অন্য যারা সদস্য ছিলেন তারা হলেন—

(১) শ্রী আর. আর. ভোলে—সাংসদ,
(২) শ্রী দেওয়ান মোহন লাল
(৩) শ্রী এল. আর. নায়েক—প্রাক্তন সাংসদ,
(৩) শ্রী কে. সুব্রমনিয়াম
(৫) শ্রী এস. এস. গিল,—সেক্রেটারী

বি. পি. মণ্ডল ছিলেন পশ্চাদপদ সম্প্রদায়ের মানুষ। যদিও তাঁর পিতার দেড় হাজার একর জমি ছিল। অর্থাৎ অর্থনৈতিক দিক থেকে তিনি পশ্চাদপদ ছিলেন না। তা সত্ত্বেও একথা উল্লেখ্য যে শ্রী মণ্ডল শৈশবে স্কুলের শ্রেণীকক্ষে যে বেঞ্চিতে বসেছিলেন সেই বেঞ্চিতে যেহেতু উচ্চবর্ণের ছাত্ররা বসত তারা বলল, 'তুমি আমাদের সঙ্গে বসতে পারবে না। তোমাকে আলাদা বেঞ্চিতে বসতে হবে।' যদিও তিনি পড়াশুনায় বেশ ভালোই ছিলেন।—এ অতীব দুঃখের ও লজ্জার কথা। একমাত্র ভারতবর্ষের মতো দেশেই এ অবিচার সম্ভব। সারাজীবনে একথা তিনি কখনই ভুলতে পারেননি। যা হোক মণ্ডল কমিশনের রিপোর্টকে আমরা সমর্থন করি। এই প্রসঙ্গে Terms of reference of the Commission-র কথা স্মরণকরা যেতে পারে ঃ*[১]

(i) to determine the criteria for defining the socially and educationally back word classes ;
(ii) to recommend steps to be taken for the advancement for the soceailly and educationally backword classes of citizens so identified ;
(iii) to examine the desirability or ortherwise of making provision for the resevevation of appointments or posts in favour of such backword classes of the citizens which are not adequately represented in public services and posts in connection with the affairs of the union or of any state and
(iv) present to the President a report setting out the facts as found by them and making such recommendations as they think proper.

৩১ শে ডিসেম্বর ১৯৮০ সালে ভারতের তদানীন্তন রাষ্ট্রপতির কাছে এই রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়েছিল। এই রিপোর্টে সামাজিক এবং শিক্ষাগত দিক থেকে পশ্চাদপদের জন্য বিশেষ সংরক্ষণের নীতি গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে। এখানে আমাদের পরিষ্কার এবং সবিনয় বক্তব্য এই যে, সামাজিক ও শিক্ষাগত পশ্চাদপদতার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক ভাবে পশ্চাদপদের জন্যও কিছু সুযোগ সুবিধা যুক্ত করা উচিত ছিল। আর তা না করেই তড়িঘড়ি করে ভি-পি-সিং সরকার এটা ঘোষণা করলেও মূলতঃ এটা ভাল কাজই করেছেন; এই জন্য বলব যে সত্যিকারের পশ্চাদপদ সম্প্রদায় (O, B, C) এর সমস্যা নিয়ে ইতিপূর্বে কোন দিন কোন কেন্দ্রীয় সরকার কোন পদক্ষেপ গ্রহণই করেন নি।

১৯৭৭ সালে প্রথম যে জনতা সরকার গঠিত হয়েছিল অর্থাৎ অ-কংগ্রেসী সরকার, সেই সরকার এই কমিটি নিয়োগ করেছিল এবং এই কমিটির রিপোর্ট ১৯৮০ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর দেওয়া সত্ত্বেও কংগ্রেসী সরকারের আমলে এটা ধামা চাপা দিয়ে রাখা হয়েছিল। অনেকেই এই রিপোর্টের মুখও দেখেন নি। তার-পর ভি. পি. সিং-সরকার অর্থাৎ রাষ্ট্রীয়মোর্চা সরকার তথা বামপন্থীদের সমর্থন পুষ্ট সরকার তা কার্যকরী করার সিদ্ধান্ত নেন। অর্থাৎ সেই রিপোর্টে ও. বি. সি সংক্রান্ত যে সুপারিশ ছিল তা কার্যকর করার জন্য নির্দেশও দেন।

প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে ঐ নির্দেশের মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য ছিল, সেটা হল কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরীর ক্ষেত্রে এই সংরক্ষণ সরাসরি প্রযোজ্য হলেও বিভিন্ন রাজ্যে যে ব্যবস্থা আছে তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এটা করতে হবে। রাজ্যগুলির ওপর কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষ কোন নির্দেশ আরোপ করছে না। কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের পুনর্বিন্যাসের যে সিদ্ধান্ত ছিল,—যে কথা নির্বাচনী ইস্তেহারে বলা হয়েছিল, তাকেও মনে রেখে সুন্দরভাবে এই নির্দেশ চালুকরার জন্য তিনি আদেশ জারি করে-ছিলেন,—এটা সঠিক হয়েছিল। কাজেই এই প্রশ্ন সমর্থন করতে চেয়ে আমরা লক্ষ্য করে দেখলাম যে একাংশের ছাত্র সম্প্রদায়কে সংরক্ষণ বিরোধী আন্দোলনে নামানো হোল। সেন্ট্রাল দিল্লীতে একদিন আমাদের (ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মা.)-র) কেন্দ্রীয় কমিটির মিটিং ছিল। কিন্তু সেই মিটিং এ আমরা যেতে পারছি না। কারণ সব রাস্তাতেই ধর্মঘটী ছাত্র-ছাত্রীদের প্রচণ্ড ভিড়। দিল্লীর মিরাণ্ডা কলেজের মেয়েরা ব্যাগীপরে আন্দোলন করছে। এবং আরো দেখেছি মেডিকেল কলেজের ছাত্র ছাত্রীরাও Anti Reservation আন্দোলনে নেমেছে। এতে করে এমন একটা পরিবেশ তৈরী হয়েছে যেন একেবারে Cast-war শুরু হয়ে গেছে। এই জাতের দাঙ্গা নিয়ে যারা উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেছেন তাদের কে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো উচিত। এ ক্ষেত্রে কংগ্রেস (আই) যে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিল আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

সকলেই জেনে থাকবেন, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে যে ভাবে দাঙ্গা হয়েছে, তা-সে মহারাষ্ট্রে, অন্ধ্রপ্রদেশে অথবা তামিলনাড়ুর জাতের দাঙ্গা; বিহার, উত্তর প্রদেশের

জাতের দাঙ্গাই বলুন প্রত্যেকটা দাঙ্গার নেপথ্য নায়ক হিসেবে আমরা দায়ী করতে পারি কংগ্রেস (আই) কে। এছাড়া কতক গুলো ধর্মীয় সমাজসেবা মূলক সংগঠনের নেপথ্যে-থেকে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বীজ ছড়াচ্ছে যে দল তার নাম ভারতীয় জনতা পার্টি। কখনো আর. এস. এস, শিবসেনা, বিশ্বহিন্দু পরিষদ, বজরং দল—নানা শাখা প্রশাখার ছদ্মবেশে এদের কাজ। কিছু সাম্প্রদায়িক সংখ্যালঘু সংগঠনও আছে যাদের ভূমিকাও সমান ভাবে সমালোচনা ও নিন্দার যোগ্য।

দেশের অভ্যন্তরে যখন এই সব শক্তি সক্রিয় থেকে মানুষের ঐক্য ধ্বংস করছে তেমনি তার সঙ্গে যুক্ত আছে বিদেশী শক্তির মদতে ও প্রশ্রয়ে লালিত উগ্র বিচ্ছিন্নতা-বাদী নানাশক্তি।

আমরা জেনেছি আমেরিকার ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের দেশের জাতি-অধিজাতি তথা নানা ধরনের সামাজিক বিষয় নিয়ে গবেষণা হচ্ছে—তাদের উদ্দেশ্য হল কিভাবে এই সব মানুষের মধ্যকার ঐক্যকে তথা মিলনের সূত্রকে ধ্বংস করা যায় এবং পরস্পর-বিরোধী শক্তি হিসেবে আত্মহননে নিয়োজিত করা যায় তথা ভ্রাতৃ-দাঙ্গা —জাতি-দাঙ্গার রক্তাক্ত কলংকিত প্রক্রিয়ায় যুক্ত করা যায়। এই অগ্রগামী-ও পশ্চাদপদের দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ সংগঠিত করার যে প্রক্রিয়া তার একটা ব্লুপ্রিণ্ট বা খসড়া-নথি কিছু দিন আগে (অর্থাৎ ১৯৭৭ সালের ১২ই জুলাই তারিখে) প্রকাশিত হয়ে পড়ে।

এমন কি পেণ্টাগণ থেকে নির্দেশিত 'অপারেশান ব্রহ্মপুত্র প্রোজেক্ট'ও প্রকাশ হয়ে গিয়েছিল। সেখানে একথা লেখা ছিল যে ভারত বর্ষের উত্তর পূর্বাংশের রাজ্যগুলোতে সংখ্যালঘু উপজাতিদের এবং ধর্মগত যে সমস্যা আছে তাকে সূক্ষ্ম-রূপে ব্যবহার করে এমন ভাবে আঘাত হানতে হবে যাতে দাঙ্গা ও সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম হয়। দাঙ্গা ও সন্ত্রাসের বিভেদ দ্বারা সেখানকার মানুষ দের মধ্যে যাতে অস্থিরতা বিরাজ করে তার পরিবেশ তৈরী করতে হবে। আর এই অস্থিরতার মধ্যে যাতে প্রতিক্রিয়ার শক্তি—সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তাদের স্বার্থকে হাসিল করতে পারে তার উপযুক্ত মৃগয়া ক্ষেত্র তৈরী করতে হবে। আমরা লক্ষ্য করে দেখেছি যে, এ জিনিস লাতিন আমেরিকার বুকে বারবার চেষ্টা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। আমাদের এশিয়ার দেশ গুলোতেও চেষ্টা হচ্ছে। এজন্য ভারতবর্ষকেও বারবার চিহ্নিত করা হচ্ছে। কাজেই এসব প্রশ্ন গুলোকে স্মরণে রেখেই আমাদের দেশে জাতপাতের সমস্যা এবং সংরক্ষণের ব্যবস্থাকে সঠিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখতে হবে। সামগ্রিক ভাবে সমাজের নিপীড়িত, শোষিত, বঞ্চিত মানুষ—যারা সামাজিক মর্যদার আসন থেকে অনেক দূরে আছেন ; অন্যায় ভাবে যাদের সরিয়ে রাখা হয়েছে, তাদের যৌথ মোর্চার মধ্যে যেমন নিয়ে আসা প্রয়োজন, তেমনি যারা সামাজিক দিক থেকে একটু অগ্রসর হয়েছেন, তাদেরকে সঙ্গে নিয়েও যৌথ উদ্যোগেমোর্চা গড়ে তোলা প্রয়োজন। আমাদের বলতে কোন কুণ্ঠা বোধ নেই যে কর্পূরী ঠাকুর ফরমুলা

সংরক্ষণের অত্যন্ত কার্যকারী ব্যবস্থা। তবে আগে থেকেই কোন রাজ্যে যদি তার বেশী সুযোগ থাকে তা বহাল রাখাই উচিত। এই ফরমুলা বিহারের কপুরী ঠাকুর সরকার-ই প্রথম তৈরী করেছিলেন একথা বলাউচিত নয়। কারণ তা প্রথম করেছিলেন আব্দুল গফুর সাহেব যখন বিহারের মুখ্য মন্ত্রী ছিলেন। গফুর সাহেবের সরকার স্বল্প মেয়াদী সরকার ছিলো। তিনি সব বিষয়টি পরিস্কার করে এবং সম্প্রদায়ের নাম সু নিদিষ্ট করে যেতে পারেনি। তাহলেও অনেক ধরনের সম্প্রদায়ের কথা সেখানে বলাহয়েছিল। মণ্ডল কমিশনের রিপোর্টে যে লিস্ট তৈরী করা হয়েছে তাতে ২৩৯৯টি পশ্চাদপদ সম্প্রদায়ের কথা বলা হয়েছে যারমধ্যে ৮৩৭টি অধিকতর-অনগ্রসর। এদের চিহ্নিত ও নির্দিষ্ট করণের কাজটা বিহারের মুখ্যমন্ত্রী কর্পুরী ঠাকুর করেছিলেন। এক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্য ছিল ঃ—সংরক্ষণ থাকবে ১২% অধিকতর পশ্চাদ পদের জন্য, ৮% পশ্চাদপদের জন্য, ৩% নারীদের জন্য ও ৩% অর্থনৈতিক ভাবে পশ্চাদপদের জন্য। এই বক্তব্যটা নিয়েই আমাদের সংরক্ষণের ব্যবস্থাটাকে পাকাপাকি ভাবে কার্যকারী করার জন্যে গণ-আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে তাতে যুক্ত করতে সচেষ্ট হতে হবে। তাহলে অর্থনৈতিক দিক থেকে যে মানুষ শোষিত, বঞ্চিত এবং যে মানুষের উপর সত্যিকারের সামাজিক নিপীড়ন হচ্ছে এই উভয়কে একত্রে সামিল করা যাবে। এবং নিরবচ্ছিন্ন ভাবে শোষণ, বঞ্চনার বিরুদ্ধে মুক্তির লড়াইকে শক্তিশালী করতে পারলে সামাজিক ন্যায় বিচারের আন্দোলনকেও শক্তিশালী করা যাবে। আর তা করতে পারলে জাতপাতের সমস্যার উর্দ্ধে উঠে আমরা সত্যিকারের সংরক্ষণেরও সঠিক এবং বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাকে কার্যকরী করতে পারব।

★ ১. □ Report of the Backward clsses Commisson—1980.
Page—VII. Vol—I & II, First Part– Govt. of India.

□ নৈরঞ্জনা রায়চৌধুরী

মহাত্মা জ্যোতিরাও ফুলে, ড. আম্বেদকর, জাতপাত ও সংরক্ষণ-ব্যবস্থা

আধুনিক ভারতবর্ষ ব্রিটিশ আমল থেকেই এক জটিল আর্থ-সামাজিক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে বিবর্তিত হতে শুরু করে। এই বিবর্তনের ধারা ও প্রকৃতি নিয়ে নানা মুনির নানা মত। এ ব্যাপারে কোন সর্বজনসম্মত বিশ্লেষণ এখনো পর্যন্ত হয়ে ওঠে নি। মার্কসের মতে ব্রিটিশ শাসন ভারতীয় সমাজব্যবস্থার সমগ্র কাঠামোটিকে সমূলে আঘাত করেছিল। কিন্তু ভারতের বা 'হিন্দুস্থানের' সামাজিক রূপান্তর ঘটানো ঔপনিবেশিকদের স্বার্থের পক্ষে প্রয়োজনীয় ছিল না। যার ফলে পুরাতন সামাজিক স্তরবিন্যাস, শ্লথ অর্থনৈতিক চরিত্র ও 'এশিয়াটিক' সামন্ততান্ত্রিক ভূমি-সম্পর্কের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হলো সর্বনিম্ন পর্যায়ের পুঁজিবাদী সম্পর্ক। ফলে দুটি পরস্পরবিরোধী প্রক্রিয়া একই সঙ্গে কাজ করে চলল। একদিকে আধুনিক সম্পর্কগুলি প্রবর্তিত হলো—রেলওয়ে, যোগাযোগব্যবস্থা, টেলিগ্রাম, কর্মশালা স্থাপিত হলো—প্রাক্‌ব্রিটিশ সামাজিক কাঠামো ভেঙে পড়ার প্রবণতা দেখা দিল—আঘাত পড়লো জাতিভেদ প্রথাতেও। আবার অপরদিকে এই ঔপনিবেশিক শাসক-কুলকেই সামন্তশক্তির সমর্থন পাওয়ার জন্য পুরাতন ভূমিব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে হয়েছিল—যার অবশ্যম্ভাবী অর্থ হলো জাতিভেদ প্রথাকে অক্ষুণ্ণ রাখা।[১]

পরবর্তী মার্কসবাদীরা মনে করেন যে উৎপাদন সম্পর্কের বিবর্তন, বিশেষত ভারতীয় কৃষিব্যবস্থায় পুঁজিবাদী সম্পর্কের বিকাশের সঙ্গেই এই সামাজিক সম্পর্কের বিবর্তনগুলি অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত।ক

কোন কোন সমাজবিজ্ঞানীর মতে ভারতবর্ষের সামাজিক সম্পর্কের ক্রমবিকাশ-গুলি আন্তসামাজিক সচলতা (Social Mobility)-র মধ্যে দিয়েই এক বিশেষ আকার ধারণ করেছে। এই সংস্কৃত্যায়ন (Sanskritization) পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট জাতির লোকেরা অপেক্ষাকৃত উচ্চতর জাতির লোকেদের আচার ও অনুষ্ঠান আয়ত্ত করে নিজেদের সেই জাতি বা সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বলে দাবী করতেন।খ ১৯০১ সালের সেন্সাস ব্যবস্থার নতুন নিয়মে স্বঘোষিত জাতি-মর্যাদা (Caste Precedence) দাবী করার এই প্রবণতা আরও বৃদ্ধি পায়। এই সঙ্গে তাল মিলিয়ে হঠাৎ হঠাৎ করে বেশ কিছু লোক নিজেদের বংশ ও উৎপত্তির সঙ্গে একাধিক পৌরাণিক চরিত্রের যোগাযোগ স্থাপন করে জাতিমর্যাদা দাবী করে বসে।

(ক) পট্টনায়ক ১৯৭১, চট্টোপাধ্যায় '৭২, আলাভী ১৯৭৫, লীন '৮০, ধনগার '৮০।
(খ) হার্ডগ্রেভ ১৯৬৯, ম্যান্ডেলবম ১৯৭০, সিঙ্গার ১৯৭২, শ্রীনিবাস ১৯৭৯।

CENTRAL LIBRARY

সাম্প্রতিককালে কোন কোন ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানীরা[গ] মনে করছেন যে সমাজের 'নিম্নবর্গের মানুষের' (the subaltern group) এক মৌলিক বিদ্রোহী সত্তা (Elementary rebel spirit) বর্তমান। এই চেতনা তাদের নিজস্ব ধর্মীয় জাতিগত, গোষ্ঠীগত বিশেষত্ব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই স্বায়ত্ত সত্তাই (Autonomous Consciousness) বারংবার স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে-কোনোরকম কর্তৃত্বের (Domination) বিরুদ্ধে তাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। সমাজের বিভিন্ন স্তরের এই আধিপত্য অধীনতার সম্পর্কই (Domination—subordination relation) সামাজিক বিবর্তনের প্রক্রিয়ার ওপর এক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছে। উপরিলিখিত সব মতগুলিকেই যদি মোটামুটি সংক্ষেপে সাজানো যায়, তাহলে দাঁড়ায় এইরকম—ভারতবর্ষে পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্ক ও ব্যাপকভাবে পুরাতনী সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের সহাবস্থানের মধ্য দিয়ে জাতিব্যবস্থা সমানভাবেই টিকে রয়েছে। কাজেই কোন একমাত্রিক মতবাদের দ্বারা এই সামাজিক প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করা প্রায় অসম্ভব।

উপরিলিখিত প্রেক্ষাপটে ব্রিটিশ আমলে ভারতবর্ষে অনুন্নত বা দলিত জাতির সামাজিক অবস্থান ও তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক দাবীদাওয়ার বিষয়ে একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হচ্ছে।

□ জ্যোতিরাও ফুলের সত্যসাধক আন্দোলন

ব্রিটিশ আমলে মহারাষ্ট্রনিবাসী তথাকথিত নিম্নবর্ণভুক্ত মালাকার পরিবারের মহাত্মা ফুলের (১৮২৭-১৮৯০) প্রচারকে কেন্দ্র করে জাতপাতবিরোধী বা আরো নির্দিষ্টভাবে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রবিরোধী আন্দোলন বিশেষভাবে আত্মপ্রকাশ করে। ফুলে একদিকে পুরোহিততন্ত্রের অনাচার উদ্‌ঘাটনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। অন্যদিকে তিনি মানুষের সমানাধিকার, হিন্দু-মুসলমান-ক্রিশ্চানদের সমতার দাবী, নীচু বর্ণের মানুষদের শিক্ষা, নারীশিক্ষা বিস্তারের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন তাঁর 'সত্যসাধক' আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে। তিনি সরকারি চাকরি এবং বিভিন্ন রকমের স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলিতে হিন্দুসমাজের সকল সম্প্রদায়ের উপযুক্ত সংখ্যক প্রতিনিধি গ্রহণের জন্যও দাবী জানিয়েছিলেন।

সেই সময়ে সমতার সমর্থনে ও জাতি আধিপত্যের বিরুদ্ধে যে-কোন আন্দোলনেই একটা ব্রাহ্মণবিরোধী তীব্রতা থাকা অনিবার্য ছিল। কারণ, হিন্দুদের ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগে ব্রাহ্মণরাই ছিল সর্বোচ্চ বর্ণ। এই অবস্থার সঙ্গে আরও কিছু বিষয় যুক্ত হয়ে পড়েছিল। জ্যোতিরাওয়ের প্রজন্ম চিৎপাবন ব্রাহ্মণ দ্বিতীয় বাজীরাওয়ের অধীনে পেশোয়া শাসনের বিভীষিকা ভুলতে পারে নি। ফুলের জীবনীকার কীর 'লোকহিতবাদী' থেকে দ্বিতীয় বাজীরাওয়ের রাজত্বের চিত্র এভাবে তুলে ধরেছেন : 'কৃষকরা

(গ) গুহ, ১৯৮৩, গুহ সম্পাদিত ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬ ভলুম।

CENTRAL LIBRARY

এমনকি খরা বা দুর্ভিক্ষের সময়েও প্রাপ্য খাজনা দিতে অসমর্থ হলে তিনি তাদের ছেলে-মেয়েদের গরম কড়াই থেকে ফুটন্ত তেল ঢালতেন, তাদের নগ্ন পিঠের ওপর চাবুক মারার অনুশীলন চলত, তাদের মাথা গুঁজে দেওয়া হত দমবন্ধকরা ধোঁয়ার মধ্যে, তাদের নাভিদেশে আর কানে বারুদ ছড়িয়ে দেওয়া হত'। এই কৃষকরা অধিকাংশই হল সেই নীচ জাতের মানুষ। বাজীরাও ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পরেও ব্রাহ্মণদের আধিপত্য কিন্তু অক্ষুণ্ণই রইল। ইংরেজী শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের অধিকাংশই ছিল উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণসন্তান—তারাই নিযুক্ত হলো উচ্চ সরকারি কর্মচারী, আমলা, লেখক, পত্র-পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে। ফলে রাজনৈতিক ক্ষমতা হারানো সত্ত্বেও ব্রাহ্মণরাই কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে হিন্দুসমাজের ওপর আধিপত্য চালিয়ে যেতে লাগল। জ্যোতিরাও যদিও অনিবার্যভাবে তাঁর আন্দোলন ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধেই পরিচালিত করেছিলেন, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি সংকীর্ণ ও সাম্প্রদায়িক ছিল না। তাঁর সঙ্গে তাঁর বিরোধীদের কখনোই কোন আপস হয় নি। কারণ, তিনি হিন্দুদের ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগে কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্যই একটা স্থান খোঁজার চেষ্টা করেন নি।

তবে সত্যসাধক আন্দোলনের মধ্যে একধরনের দ্বৈতসত্তা (Dualism) লক্ষ্য করা যায়। এই জাগরণের মধ্যে একদিকে যেমন এক উচ্চবর্গীয় রক্ষণশীলতার (Elite-based conservation) প্রবণতা দেখা যায়, আবার অন্যদিকে গণমুখী আমূল সংস্কারকামিতাও পরিলক্ষিত হয়।[২]

প্রথম বিশেষত্বটি সংস্কৃত্যায়ন পদ্ধতিতেই বিকাশ লাভ করে। যেমন কখনো কখনো এই গোষ্ঠী মারাঠীদের বেদোক্ত অধিকারের (ক্ষত্রিয় হিসাবে স্বীকৃতির অধিকারের) জন্য লড়াই করেন। জ্যোতিরাওয়ের মৃত্যুর পরই এই আন্দোলন সামন্ত রাজপুত্র কোলাপুরের মহারাজা কর্তৃক পরিচালিত হয়। পরবর্তী দুই দশকের মধ্যেই দাবী করা হয় যে, কেবলমাত্র ব্রাহ্মণদের স্থলেই ক্ষত্রিয়দের বসাতে হবে। হিন্দুসমাজের বর্ণবিভাগের মধ্যে নিজের সম্প্রদায়ের জন্য, বিশেষ করে মারাঠী সম্প্রদায়ের জন্য অনুকূল স্থান সন্ধানের নতুন সুবিধাবাদ এবং পরবর্তীকালে ব্রিটিশ শাসনের অধীনে উচ্চপদ ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করার সংগ্রাম এই আন্দোলনকে তার সঠিক পথ থেকে অনেক সময় দূরে সরিয়ে আনে।[৩]

এছাড়া এই আন্দোলনে এক রাজভক্তির মেজাজ লক্ষ্য করা যায়। ব্রিটিশ শাসককুল এই আনুগত্যের মনোভাবকে অনেক সময়েই তাদের অনুকূলে কাজে লাগিয়েছিল। এভাবে তারা কোলাপুরের সামন্তকে তিলকের বিরুদ্ধে মদত যুগিয়েছিল এবং পরবর্তীকালে এর ফলস্বরূপ ১৯১৯-এ ভাস্কর রাও যাদবের 'অব্রাহ্মণ দল' (Non Brahmin Party) এক শক্তিশালী কংগ্রেসবিরোধী গোষ্ঠীরূপে আত্মপ্রকাশ করে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এইভাবে এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এক বিচ্ছিন্নতাবাদের বীজ বপন করার চেষ্টা করে।

দ্বিতীয় প্রবণতাটিও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। ঊনবিংশ শতকের বেশিরভাগ সমাজসংস্কার আন্দোলনগুলি যখন কেবলমাত্র শহরগুলিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠছিল,

সেই সময় এই সত্যসাধক গোষ্ঠীর কার্যকলাপের মূলকেন্দ্র ছিল গ্রামাঞ্চল। দ্বিতীয়ত এই জাগরণের মূল হাতিয়ার ছিল মারাঠী ভাষা যা প্রতিটি শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত আপামর মহারাষ্ট্রনিবাসীর কাছে তাদের বার্তা পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছিল। ইংরেজীনবিশ সমাজসংস্কার আন্দোলনগুলির সঙ্গে এখানে ছিল এর এক মূলগত প্রভেদ। এই বাণীই শেঠজী-ভাটজীর (মহাজন-ব্রাহ্মণ) বিরুদ্ধে এক 'বহুজন সমাজ' গড়ার স্বপ্নে কৃষককুলকে আহ্বান জানিয়েছিল। এই আদর্শই পরে ১৯১৯-১৯২১ সালে সাতারায় কৃষক জাগরণের সামিল হয়েছিল।

লক্ষ্ণৌ হিন্দু-মুসলমান চুক্তি অথবা গান্ধীবাদী জাতীয় ঐক্য কর্মসূচির চেয়ে জ্যোতিরাওয়ের ঘোষণার মধ্যে ছিল অনেক বেশি আমূল পরিবর্তনের কর্মসূচি। এই কর্মসূচির সাফল্য অর্জিত হতে পারত ভারতে সামন্তবাদী ভূমিসম্পর্কের ও ঔপনিবেশিক শাসনের বৈপ্লবিক অবসান ঘটানোর মধ্যে দিয়ে। কিন্তু যে সর্বব্যাপক বিদ্রোহ ঘোষণা করতে ফুলে চেষ্টা করেছিলেন, তা যথোপযুক্ত পরিণতির পথে যায় নি। সামন্ততান্ত্রিক ও আধাসামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কের সম্পূর্ণ বিনাশের সঙ্গে গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পূর্ণ করার কর্মসূচি যুক্ত করলেই হিন্দুসমাজের ক্রমোচ্চ বর্ণ বিন্যাসের কাঠামোর সম্পূর্ণ ধ্বংসসাধন করা সম্ভবপর হতো। কিন্তু কংগ্রেসের আপসকামী নেতৃত্ব কিংবা অ-ব্রাহ্মণ আন্দোলনের দেশপ্রেমিক নেতৃত্ব কেউই এ কাজ করতে সক্ষম ছিল না, কারণ উভয় নেতৃত্বই এসেছিল একই শ্রেণী থেকে। ফলে জনগণের এক স্বাধীন বিপ্লবী সমাবেশের যে আশা প্রতিষ্ঠাতা-নেতা জাগিয়ে তুলেছিলেন তা ক্রমশ অন্তর্হিত হয়ে গেল। যে আন্দোলন এক বিপ্লবী অভিযানে স্বাধীনভাবে কৃষক সম্প্রদায়ের সমাবেশ ঘটাতে পারত সেই আন্দোলন চলে গেল কিছু মুষ্টিমেয় স্বার্থান্বেষীদের হাতে।[৪]

□ ড. আম্বেদকরের সংগ্রাম

এই তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানুষদের অসহনীয় যন্ত্রণার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা ক'রে তিরিশের দশক থেকে ব্যাপক সংগ্রামের সূচনা করেন ড. আম্বেদকর। আন্দোলনের প্রথম দিককার বছরগুলিতে আম্বেদকর উচ্চজাতির ভণ্ডামির মুখোশ খুলে দিয়েছিলেন, কংগ্রেসের নীতির বিরুদ্ধতা করেছিলেন এবং পরে অস্পৃশ্যদের জন্য জমি ও পৃথক উপনিবেশ দাবী করেছিলেন। এরই সাথে সাথে গান্ধীজীর আদিবাসী তথা হরিজন কল্যাণ পরিকল্পনাকে 'রাজনৈতিক অনুকম্পা' বলে ঘোষণা করেছিলেন। অনুন্নত শ্রেণীর আন্দোলন পরিচালনার জন্য তিনি ভারতীয় লেবার পার্টি ও তফসিলী সম্প্রদায় ফেডারেশন গঠন করেন। ইতিমধ্যে বিভিন্ন রাজ্যে অনুন্নত সম্প্রদায়ের জনগণ মন্দিরে প্রবেশের অধিকার ও অন্যান্য সামাজিক বৈষম্য নিরসনের দাবীতে আন্দোলনে ব্রতী হয়। এই আন্দোলনের ফলে ত্রিবাঙ্কুর, ইন্দোর প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যে অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য মন্দির প্রবেশের অধিকারও স্বীকৃত হয়।

ড. আম্বেদকরের দাবী ছিল বর্ণাশ্রমের অবসান এবং সাম্য। এই দুটি মুখ্য-নীতির উপর ভিত্তি করে হিন্দুসমাজের পুনর্গঠন। তিনি ১৯২৮ সালে সাইমন কমিশনের কাছে তাঁর দাবীপত্র পেশ করে বলেছেন, 'অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের সংখ্যালঘু মানুষেরা শিক্ষার দিক থেকে অনেক পিছিয়ে পড়ে আছে। অর্থনৈতিক দিক থেকে অতি দরিদ্র ও সামাজিকভাবে দাসত্ব শৃংখলে আবদ্ধ। তারা এমন কতকগুলি রাজনৈতিক অক্ষমতার শিকার হয়ে রয়েছে যা অন্য কোন সম্প্রদায়ের নেই'।

১৯৩১ সালের জনগণনা থেকে দেখা যায় যে ভারতের মোট নিম্নবর্ণজাত হিন্দুর সংখ্যা হল ৫,০১,৯২,০০০। বর্ণভেদপ্রথা শুধুমাত্র ভারতীয় সমাজব্যবস্থাতে একটি দুরারোগ্য ব্যাধি ছিল তা নয় এর ফলে জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রেও জটিলতা সৃষ্টি হয়। নিম্নবর্ণভুক্ত সম্প্রদায়ের স্বার্থসংরক্ষণের জন্য জাতীয় রাজনীতিতে তিন ধরনের প্রবণতা দেখা দিয়েছিল। একদিকে জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ শাসকবর্গ বিভেদপন্থী সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে ইন্ধন যোগাতে থাকলেন। এর ফলে এক বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাব মাথা চাড়া দিতে লাগল। অপরদিকে জাতীয় আন্দোলনের পরিধি প্রসারিত হওয়ার ফলে কখনও কখনও নিম্নবর্ণভুক্ত তফসিলী সম্প্রদায়ের মানুষ এই আন্দোলনে মূল ধারার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে পড়লেন। আবার কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলন বিকাশ লাভ করায় বর্ণগত বিভেদের প্রাচীর শিথিল হয়ে পড়ার প্রবণতা দেখা দিল ও বর্ণের পরিবর্তে শ্রেণীর ভিত্তিতে সংগঠিত হওয়ার মনোভাব কোন কোন জনগোষ্ঠীর মনে ব্যাপক হয়ে উঠল। ফলে বিশের দশকের শেষে ও ত্রিশের দশক থেকে ভারতের নিম্নবর্ণের জনগণের রাজনৈতিক যাত্রাপথে অনেকগুলি মাত্রা সংযোজিত হতে শুরু করল। প্রথমত সাংবিধানিক কংগ্রেসী আন্দোলনের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের মনোভাব, যা অনেকখানিই মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক প্রভাবিত হয়েছিল, দ্বিতীয়ত কংগ্রেসী আন্দোলনে উচ্চবর্ণ, হিন্দু আধিপত্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা এবং 'হিন্দুরাষ্ট্রের' বিরোধিতা করা। প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার প্রবর্তনের ক্ষেত্রে অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষদের জন্য সংরক্ষিত আসন ও পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর দাবী জানান। তৃতীয়ত, বর্ণভিত্তিক সমাজকে মূলে আঘাত করা ও শ্রেণীভিত্তিক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করা।

এই পরিস্থিতিতে ইংলণ্ডের শ্রমিক দলের দক্ষিণপন্থী নেতা র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড ১৯৩২-এর ১৬ই আগস্ট ভারতের আসন সংস্কারের ক্ষেত্রে একটি সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ঘোষণা করলেন। ব্রিটিশ সরকার প্রস্তাবিত সাংবিধানিক কাঠামোতে অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীতে আসন সংরক্ষণের প্রস্তাব ঘোষিত হলো।

□ **যৌথ বনাম পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী ঃ** এই প্রসঙ্গে যৌথ ও পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর ধারণাটি পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন। যৌথ নির্বাচকমণ্ডলীতে

আসনটি কোন বিশেষ গোষ্ঠীর জন্য সংরক্ষিত হতে পারে। কিন্তু নির্বাচকমণ্ডলী সেক্ষেত্রে কোন বিশেষ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমন, কোনযৌথ নির্বাচকমণ্ডলীতে তফসিলীভুক্ত প্রার্থীর জন্য আসন সংরক্ষিত হতে পারে। কিন্তু ভোটদাতারা বর্ণহিন্দু, তফসিলী ও অন্যান্য সম্প্রদায়ভুক্ত জনসমষ্টির সমন্বয়েই গঠিত হবে। অপরদিকে পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর ক্ষেত্রে আসনটি তো বিশেষ গোষ্ঠীর জন্য সংরক্ষিত হবেই, এমনকি নির্বাচকমণ্ডলীগুলিকেও ওই বিশেষ গোষ্ঠীভুক্ত হতে হবে।

ড. বি আর আম্বেদকর অস্পৃশ্যদের জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী গঠনের দাবীতে আন্দোলন করেছিলেন। তাঁর যুক্তিগুলি ছিল এইরকম, প্রথমত, হিন্দুরা পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর বিরোধিতা করছে। কারণ, তারা ভাবছে যে এই ব্যবস্থা ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে এক বিভেদকামিতা সৃষ্টি করবে। কিন্তু ভারতবর্ষ কি আদৌ এক ঐক্যবদ্ধ দেশ হিসাবে স্বীকৃত? না ভারতীয় জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ এই তথাকথিত ঐক্যের প্রতি আস্থাশীল, ধর্মের দোহাই দিয়ে কতগুলি মানুষকে দিনের পর দিন অত্যাচার-অবিচারের মধ্যে দিয়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য ও শোষণের দ্বারা জর্জরিত করাই যে দেশের রীতি সেখানে জাতীয়তাবাদের ধারণা কেবলমাত্র হাস্যকরই নয়, অবাস্তব ও অমানবিকও বটে। কাজেই বর্ণহিন্দু নেতাদের বিচ্ছিন্নতাবাদের জিগির তোলা কেবলমাত্র নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার। এইসব নেতারা যদি সত্যিই ভায়তবর্ষকে একসূত্রে গাঁথতে চাইতেন তাহলে অনেক আগেই তারা এই নিম্নবর্ণের জনগোষ্ঠীকে স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য জোরালো আন্দোলন চালাতে পারতেন। কিন্তু সংগ্রামের কোন পর্যায়েই এই বিষয়টির ওপর তারা যথোপযুক্ত গুরুত্ব দেয় নি। দ্বিতীয়ত যদি নীতিগতভাবে মেনে নেওয়া হয় যে অস্পৃশ্য বা তফসিলী জনগোষ্ঠীর প্রতি-নিধিরাই কেবলমাত্র আইনসভায় তাদের নিজেদের সম্প্রদায়ের স্বার্থসংরক্ষণে সচেষ্ট হবে তাহলে কেনই বা তারা কেবলমাত্র সেই গোষ্ঠীর জনগণ কর্তৃকই নির্বাচিত হবে না? অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের পক্ষে বর্ণহিন্দুদের সঙ্গে প্রতি ক্ষেত্রে সমপর্যায়ে হিন্দুধর্মের মধ্যে বাসকরা সম্ভব নয়। পদসংরক্ষণের মধ্যে দিয়েই কিন্তু এই মতটি স্বীকৃত হচ্ছে যে অস্পৃশ্যই অস্পৃশ্যদের একমাত্র প্রতিনিধি—বর্ণহিন্দুরা নয়। কাজেই নীতিই যদি মেনে নিতে হয় তবে সিদ্ধান্ত নয় কেন? আসলে পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী তৈরী হলে ভোটদাতাদের সংখ্যার অনুপাতে যতগুলি আসন অস্পৃশ্যদের জন্য সংরক্ষিত হবে, যৌথ নির্বাচকমণ্ডলী হলে সেই সংখ্যা অনেক কমে যাবে। ফলে সেই বাকী আসনগুলি অবশ্যম্ভাবীভাবেই বর্ণহিন্দুদের দখলে চলে যাবে। এই অংকটাই জাতীয়তাবাদী নেতারা কষেছিলেন এবং সেই স্বার্থসংরক্ষণের তাগিদেই তাঁরা বিচ্ছিন্নতাবাদের কল্পিত ভয়ে দিশেহারা বোধ করছিলেন। আম্বেদকর মাদ্রাজের নিম্নলিখিত নির্বাচন এলাকা নিরীক্ষণের ভিত্তিতে তাঁর মতকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন।'

এলাকার নাম	হিন্দুদের জন্য মোট আসনসংখ্যা	অস্পৃশ্যদের জন্য সংরক্ষিত মোট আসন-সংখ্যা	মোট হিন্দু ভোটদাতা	মোট অস্পৃশ্য ভোটদাতা	হিন্দু ও অস্পৃশ্য ভোটদাতার অনুপাত
মাদ্রাজ শহর (দক্ষিণ)	২	১	৬০,৬২৬	২৫,৭৭০	১৬ : ১
চিকাকোল	২	১	৮৩,৪৫৬	৫,১২৫	১৬ : ১
বিজয়নগরম	২	১	৪৭,৫৯৪	৯৯৬	৪৯ : ১
অমলপুরম	১	১	৫২,৮০৫	৭,৭৬০	৭ : ১
এলোর	১	১	৫১,৭৯৫	৫,১৫৫	৯ : ১
বন্দির	১	১	৮৪,১৯২	৪,৭২৩	১০ : ১
তেনালি	২	১	১,৩২,১০৭	৫,৭৩২	২৪ : ১

উপরে তালিকাটি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে মাদ্রাজের এই সাতটি এলাকায় যদি পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর ব্যবস্থা থাকতো তাহলে তা অস্পৃশ্যদের স্বার্থসংরক্ষণের অনেক বেশি জোরদার হতো। অন্যদিকে পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী গঠনের মধ্যে দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠী যে চাল চেলেছিলেন গান্ধীজী সেটি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। জাতীয় আন্দোলনের ঐক্যকে ভাঙার জন্য ব্রিটিশ সরকার বিভিন্ন জাতি ও বর্ণের মধ্যে, সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর মধ্যে, কখনও বা বিভিন্ন ভাষাভাষী ও আঞ্চলিক গোষ্ঠীর মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করে সংঘর্ষ বাধিয়ে দিতে চেয়েছিল। গান্ধীজী এর তীব্র বিরোধিতা করেন। তিনি অনুন্নত সম্প্রদায়কে বর্ণহিন্দু থেকে বিচ্ছিন্ন করার তীব্র সমালোচনা করলেন। ১৯৩১ সালে লণ্ডনের গোলটেবিল বৈঠকে গান্ধীজী ঘোষণা করলেন, 'এই দাবী হিন্দু-ধর্মের মধ্যে কেবলমাত্র বিভেদই সৃষ্টি করবে যা আমি কোনক্রমে সমর্থন করতে পারি না। অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের লোকেরা ইসলাম অথবা খ্রীষ্টানধর্ম গ্রহণ করলেও আমার আপত্তি নেই। সেটাও আমি সহ্য করব, কিন্তু এইভাবে দুটি ভাগে বিভক্ত হলে হিন্দুধর্মের ভাগ্যে যা লেখা আছে তাকে আমি বোধহয় কোন রকমেই সহ্য করতে পারব না...।'

আম্বেদকরের বিক্ষুব্ধ মনোভাবের প্রতি উপযুক্ত সহমর্মিতা প্রকাশ করেও একথা বলা দরকার যে সমাজ সংগঠনের ব্যাপারে গান্ধীজীর সমুচ্চ রাজনৈতিক আদর্শকে তিনি অনেকখানিই নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া সহকারে গ্রহণ করেছিলেন। হিন্দুধর্মের নিষ্ঠুরতার লাঞ্ছনায় জর্জরিত হয়ে তিনি অনেকখানিই আবেগপ্রবণ হয়ে গিয়েছিলেন। আসলে গান্ধিজী ভাবতেন যে ভারতবর্ষে জাতি, পংক্তি, সম্প্রদায় ও ধর্ম প্রভৃতি আনুগত্য সৃষ্টির প্রধান অনুঘটক হিসাবে চিরকালই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

CENTRAL LIBRARY

পালনকরে এসেছে। সেই হিসেবে আলফ্রেড লায়লে বা ১৯০১ সালে সেন্সাস সভাপতি হার্বার্ট রিজলে প্রমুখ সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিকদের সঙ্গে গান্ধীজীর মতের কিছু কিছু সাদৃশ্যও লক্ষ্য করার মতো। কিন্তু উল্লেখিত, সাম্রাজ্যবাদী পণ্ডিতেরা ভারতীয় জনমানসের এই বিচিত্র প্রবণতাগুলির ওপর অস্বাভাবিক গুরুত্ব আরোপ করে এই কথাই বোঝাতে চেয়েছিলেন যে ভারতবর্ষে ইউরোপের মতো একটি সংহত রাজনৈতিক সমাজ (Political Society) গড়ে তোলা সম্ভব নয়—বিচ্ছিন্নতা ও বিভেদই সে দেশের অবধারিত বিধিলিপি। কিন্তু গান্ধীজী পরিকল্পিত আদর্শ ভারতভূমিতে এইসব ছোটখাটো আনুগত্যের বন্ধনগুলি স্বীকার করে নিয়েও সেগুলিকে এমন একটি বৃহত্তর পরিধির মধ্যে সংহত করার কথা ভাবা হয়েছিল যার ফলে ভারতবর্ষের অখণ্ড রাজনৈতিক জাতিসত্তা সহজেই বিকাশলাভ করতে পারে। আসলে গান্ধীজী যে স্বপ্নের ভারতবর্ষের কথা চিন্তা করতেন সেখানে একটি বহুবিন্যস্ত সমাজ (Pluralist Society) গড়ে উঠবে বলেই বিশ্বাস করা হত। দমিত শ্রেণীকে আম্বেদকরের প্রস্তাব অনুযায়ী একটি পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী উপঢৌকন দেওয়া হলে গান্ধীজী পরিকল্পিত এই বহুবিন্যস্ত সমাজের স্বপ্ন সফল হত না।

□ **পুণা চুক্তি (১৯৩২):** ম্যাকডোনাল্ডের সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রতিবাদে গান্ধীজীর আমরণ অনশনের পরিপ্রেক্ষিতে অনুন্নত সম্প্রদায়ের নেতা ড. আম্বেদকর এ ব্যাপারে একটি সমঝোতায় এলেন ও গান্ধীজীর সঙ্গে পুণা চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন। এই চুক্তির ঐতিহাসিক দলিলের বঙ্গানুবাদ নিচে দেওয়া হল—

□ **পুণা চুক্তি সেপ্টেম্বর ১৯৩২ :** অনুন্নত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ ও অবশিষ্ট হিন্দু জনসমষ্টির নেতৃবৃন্দ নিম্ন লিখিত সহমতে উপস্থিত হয়েছেন।

প্রথম অনুচ্ছেদ—প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতে সাধারণ আসনে অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য যে সকল আসন সংরক্ষিত থাকবে তা হল—

মাদ্রাজ—৩০, বোম্বাই (সিন্ধুসহ)—১৫, পাঞ্জাব—৮, বিহার ও উড়িষ্যা—১৮, মধ্যপ্রদেশ—২০, আসাম—৭, বাংলা—৩০, যুক্তপ্রদেশ—২০, সর্বসমেত=১৪৮।

প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত সিদ্ধান্তে প্রাদেশিক আইনসভাগুলির জন্য নির্দিষ্ট সম্পূর্ণ আসনসংখ্যার ভিত্তিতে এই সংখ্যাগুলি নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ—কেন্দ্রীয় আইনসভায় ব্রিটিশ ভারতের সাধারণ নির্বাচক-মণ্ডলীর জন্য যে সদস্য সংখ্যার পরিমাণ নির্দিষ্ট করা হয়েছে তার শতকরা আঠার ভাগ অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

পুণা চুক্তি • কিন্তু নিম্নবর্ণের মানুষকে এতটুকু খুশি করতে পারে নি। ১৯৩২ সালের ১৩ই অক্টোবর তারিখে বর্ণহিন্দুবিরোধী ক্ষোভের জ্বালায় ড. আম্বেদকর ভারতবর্ষের 'হরিজন' সমাজকে 'স্বধর্মত্যাগী হওয়ার জন্য প্রকাশ্যে আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং পরে তিনি নিজেও বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন।

যাই হোক অবশেষে ব্রিটিশের কাছে ড. আম্বেদকরের দাবিসনদ পেশ ও তাঁর সাথে গান্ধীজীর পুণা চুক্তির পটভূমিতে ১৯৩৫ সালে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট যে 'ভারত শাসন আইন' পাশ করে তাতে হিন্দুসমাজের পিছিয়ে পড়া কতগুলি সম্প্রদায়ের জন্য আইনসভায় আসন সংরক্ষণের অধিকার মেনে নেওয়া হয়।

□ **প্রথম 'তফসিলী জাতের' জন্য সংরক্ষণ ঃ** ব্রিটিশের এই সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তফসিলী সম্প্রদায়ভুক্ত জাতিকে 'Scheduled Caste' নামে তালিকাভুক্ত করা হয়। তফসিলী উপজাতিদের তখন বাদ রাখা হয়। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পর থেকে স্বাধীনতা পর্যন্ত ব্রিটিশরা তফসিলী জাতির জন্য শিক্ষা ও চাকরির ক্ষেত্রে কিছু সুযোগকেও প্রসারিত করে।

□ **তফসিলী জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক দাবিদাওয়া ঃ** ড. আম্বেদকর অস্পৃশ্যদের মুক্তি-সংক্রান্ত কর্মসূচিকে কয়েকটি অংশে ভাগ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে ১৯৪২ সালের ১৯ শে ও ২৩ শে জুলাই নাগপুরে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় তফসিলী সম্মেলনে (All India Schedule Caste Congress) গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি নিচে উল্লেখ করা হলো।

□ **সংকল্প নং ২ (Resolution No. II) ঃ সংবিধান প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অনুমোদন :**

এই সম্মেলনে এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হচ্ছে যে তফসিলীভুক্ত জাতির লোকেরা সংবিধান প্রণয়নে অসম্মতি প্রকাশ করবে যদি না তাতে—(ক) তফসিলী অনুমোদন থাকে। (খ) তফসিলীভুক্ত জনগোষ্ঠীকে বর্ণহিন্দুদের থেকে এক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় গোষ্ঠী হিসেবে স্বীকৃতি না দেওয়া হয়। (গ) নতুন সংবিধান এই গোষ্ঠীকে প্রকৃত অর্থে এক নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেয়।

প্রকৃত নিরাপত্তার বিষয়টি আরো পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করা হয় এই সম্মেলনের অন্যান্য সিদ্ধান্ত গুলিতে। যেমন—

□ **সংকল্প নং ৩ (Resolution No. III) ঃ সংবিধানের প্রয়োজনীয় শর্তাবলী ঃ** তফসিলীভুক্ত জাতির মানুষের মধ্যে প্রকৃত নিরাপত্তাবোধ জাগানোর মর্মে এই সম্মেলন নিম্নলিখিত প্রতিবিধান দাবি করে ঃ

(ক) এই জনগোষ্ঠীর ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক ও উচ্চতর শিক্ষার খাতে আঞ্চলিক সরকারকে নির্দিষ্ট হারে বার্ষিক অনুদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

(খ) কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের কার্যনির্বাহী এই গোষ্ঠীর মানুষদের আইনানুগ পদ্ধতিতে তাদের নির্দিষ্ট সংখ্যা ও প্রয়োজনের ভিত্তিতে পদ সংরক্ষিত করতে হবে।

(গ) এই সম্মেলনে এই সিদ্ধান্তও নেওয়া হয় যে নিরাপত্তা বিভাগে (যেমন বিচার বিভাগ, পুলিশ ও রাজস্ব বিভাগে) আগামী ১০ বছরের জন্য ন্যূনতম যোগ্যতার ভিত্তিতে তফসিলী জাতির লোকেদের জন্য পদ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

(ঘ) আইনানুগ পদ্ধতিতে আইনসভাগুলিতেও সদস্যপদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভায় নির্বাচিত তফসিলীভুক্ত সদস্যদের জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী গঠন করতে হবে।[৬]

উপরিলিখিত আলোচনার ওপর ভিত্তি করে কতগুলি কথা বলা যেতে পারে। প্রথমত, হিন্দুধর্মের অন্যায় আচরণের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য ড. আম্বেদকর বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন ও তার অনুগামীদের সেই অনুযায়ী আচরণ করতে বলেছিলেন। কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে যে অবিচারপূর্ণ ভূমিসম্পর্কের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ভয়ংকর সামাজিক বাস্তবতা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের দ্বারা পরিবর্তিত হয় না। দ্বিতীয়ত, সমগ্র আন্দোলনের আরো শোচনীয় দিক হলো এই যে, এমনকি নিপীড়িত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরাও কিন্তু ক্ষমতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা, চাকরির দাবি, আসন সংরক্ষণ, শিক্ষার সুযোগ—ইত্যাদি কতকগুলো উপরিতল সংক্রান্ত (Superficial) সুযোগ-সুবিধার বাইরে আদর্শগতভাবে অন্যকিছু দেখতে পারে নি। বর্তমান আর্থ-সামাজিক কাঠামোর মূলে আঘাত করার প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে তারা হয়তো সচেতন ছিলেন না। এই পরিকাঠামোর মধ্যে অবস্থান করেই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলিকে কিছু চটজলদি সমাধান করে কোনক্রমে টিকে থাকাই যেন গোটা সমাজের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। এই গোটা আন্দোলনের মধ্যে ছিল না কোন দূরাক্ষয়ী স্বপ্ন—ছিল কেবল এক তাৎক্ষণিক সাগ্রয়—রোগের প্রকৃত নিরাময় নয়—মৃত্যুপথযাত্রী রোগীকে কোরামিনের সাহায্যে আরো কিছুক্ষণ বাঁচিয়ে রাখার করুণ প্রতিশ্রুতিই যেন ছিল এই সংগ্রামের অন্যতম লক্ষ্য। অবশ্য ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী পশ্চাদপদ সম্প্রদায়ের মনে অগ্রগতির আশা জাগাতে, ঐক্যবদ্ধ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মূল সূত্র থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করতে এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী চেতনাকে ভোঁতা করে জাতপাত ও সম্প্রদায়গত বোধকে স্থায়ী করার দুরভিসন্ধি নিয়েই যে এই ধরনের বিভেদের বীজ রোপণ করেছিল একথা ডঃ আম্বেদকর পরে হয়তো উপলব্ধি করেছিলেন। এই কারণেই বোধহয় স্বরাজ্যের দাবীতে সামিল হবার জন্য তিনি অনগ্রসর গোষ্ঠীকে আহ্বানও জানিয়েছিলেন। তবে উৎপাদন ব্যবস্থাকে পরিবর্তন না করে শুধুমাত্র সামাজিক উন্নতিবিধানের মধ্য দিয়েই যে জাতিভেদ প্রথা এবং সামাজিক বৈষম্যের অবসান ঘটানো সম্ভব নয়, এই সত্য হয়তো বা বাবাসাহেব আম্বেদকর বুঝতে পারেননি।

তথ্যসূত্র

১। কার্ল মার্কস 'ভারতে ব্রিটিশ শাসন,' 'ডেইলি ট্রিবিউন, জুন ১৮৫৩।

২। গেইল অমভিট (Gail Omveidt). The Caltural Revolt in :a Colonial Society,—Non Brahmin Movement in Western India Bombay. 1976.

৩। বি টি রনদিভে—জাত শ্রেণী ও সম্পত্তি সম্পর্ক।

৪। বি আর আম্বেদকর—Emancipation of Untouchability.

৫। তদেব

CENTRAL LIBRARY

□ নেপাল মজুমদার

আম্বেদকর ও 'অবনত শ্রেণী'গুলির রাজনৈতিক অধিকার

যদি প্রশ্ন হয়, ভারতের রাজনীতিতে বি. আর. আম্বেদকরের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান কি ? এক কথায় বলতে হলে বলা যায়, হিন্দু সমাজের সবচেয়ে অত্যাচারিত এবং অপমানিত ও লাঞ্ছিতদের বিশেষ রাজনৈতিক অধিকার, স্বীকৃতি ও মর্যাদা আদায় করে নেওয়াটাই হচ্ছে আম্বেদকরের প্রধান অবদান। বস্তুত ঐতিহাসিক 'পুণা চুক্তি'র পরই (১৯৩২-৩৩) দেশের হিন্দু সমাজের সমস্ত দলিত ও অবনত শ্রেণী এবং জাতি-গোষ্ঠী ও উপজাতিদের নজরকাড়া অস্তিত্ব দেশের উচ্চবর্ণের শিক্ষিত মানুষের মনে অস্বস্তি এবং উদ্বেগ-আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এতকাল পর্যন্ত হিন্দুসমাজের এইসব অন্ত্যজ ও অবনত শ্রেণীর মানুষদের কোনো বাস্তব অস্তিত্বই ছিল না, তথাকথিত 'উচ্চ বর্ণে'র শিক্ষিতজনের মনে ;—এতকাল এরা সেন্সাস রিপোর্ট, গেজেটিয়ার ও সরকারী নথিপত্রেই চাপা পড়েছিল। নানা ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আম্বেদকরের এই ঐতিহাসিক ভূমিকা ও অবদানের গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

অবশ্য প্রথমেই একটা কথা পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার। শুধু বা কেবল মাত্র 'পুণা-চুক্তি'র বিরুদ্ধে হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের অসন্তোষ ও বিক্ষোভের কারণ নয়। কেননা 'পুণাচুক্তি তো ম্যাকডোনাল্ডের সমগ্র 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার (Communal Award) একটা ভগ্নাংশ মাত্র। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় গুলির বা অবনত শ্রেণী এবং অনুন্নত জাতি-গোষ্ঠীগুলির প্রতি ন্যায় ও সুবিচার করার মহান উদ্দেশ্যে নয়—সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার মধ্যে ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী অতি কূট 'বিভেদ-নীতিরই' অতি সূক্ষ্ম প্রয়োগের চেষ্টা ছিল। প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় যে ভাবে ইংরেজ-বশম্বদ দেশীয় নৃপতিদের এবং অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান এবং অন্যান্য বশম্বদ শক্তিকে বিশেষ সুবিধাদি দিয়ে সংখ্যাগুরু হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের শক্তিকে খর্ব এবং নিয়ন্ত্রিত করার একটা সুপরিকল্পিত চেষ্টা ছিল, এই সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার মধ্যে। আর সংখ্যা লঘু সম্প্রদায় এবং অবনত শ্রেণীর ও উপজাতি শ্রেণীর মানুষের মনে ইংরেজরা 'দেগে-দেগে' এই কথাটাই বুঝিয়ে দিতে চাইলে যে, ইংরেজ সরকারের 'মহানুভবত াও ন্যায়পরতা'-র জন্য এবং ইংরেজ সরকারের অনুগ্রহেই তারা এই সব রাজনৈতিক অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা লাভ লাভ করতে সমর্থ হলো। 'অনুগৃহীতরা' বেশি করে ইংরেজ সরকারের উপর

নির্ভরশীল এবং কৃতজ্ঞ থাকবে, এই হল ইংরেজ ব্যুরোক্র্যাটদের অন্তরের গোপন আশা-আকাঙ্ক্ষা।

'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা'র পশ্চাতে ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী কূট অভিসন্ধির কথা আম্বেদকর যে বুঝতে পারেন নি, তা নয়। ইংরেজ ব্যুরোক্রাটদের হাতে ক্রীড়ানক বা কাঠের পুতুল হতেও চান নি তিনি। কিন্তু এসব সত্ত্বেও হিন্দু সমাজের ও অবনত শ্রেণীর বিশাল মানুষের স্বার্থরক্ষার প্রশ্নটাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কেননা এতে তো শুধু তার 'ভারত শাসন-সংস্কার আইনেরই' (১৯৩৫) নয়—ভবিষ্যৎ ভারতের স্বাধীন রাষ্ট্রিক সংবিধানের মূল নিয়ামক নীতির সম্ভাবনার বীজ নিহিত রয়েছে। সে কথাটাও উপেক্ষণীয় বা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। হিন্দুসমাজের বিশেষ গঠনপ্রকৃতি বা তার বৈশিষ্ট্যটা আম্বেদকর হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিলেন। চিরকাল যে ভাবে তথাকথিত 'সনাতনী হিন্দুসমাজ' চলে এসেছে, সেইভাবে চলতে থাকলে কোনোদিনই এই সব দলিত ও অবনত শ্রেণীর লোকেরা উন্নত বা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। দারিদ্র্য পীড়ন অত্যাচার অপমান লাঞ্ছনা ঘৃণা ও অবজ্ঞার কালিমা মেখে তারা অনন্তকাল পড়ে পড়ে মার খেয়ে যাবে। এর জন্য প্রথমেই চাই রাষ্ট্রনৈতিক বিশেষ অধিকার এবং স্বীকৃতি, আম্বেদকর তা স্পষ্টই বুঝেছিলেন। ম্যাকডোনাল্ডের 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা-য় বাস্তবত অবনত হিন্দু শ্রেণীর মানুষেরা জাতীয় মূল স্রোতোধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছিল কিন্তু 'পুণাচুক্তি'-র ফলে সেই জাতীয় ঐক্য ও মূল স্রোতোধারায় তারা ফিরে এলো এবং তা আম্বেদকরের প্রাজ্ঞোচিত উপলব্ধি এবং সম্মতিদানের ফলেই সম্ভব হলো।

কিন্তু ব্যাপারটা যত সহজ মনে হয়েছিল, ততটা নয়। প্রশ্ন হচ্ছে, হিন্দু সমাজের অবনত শ্রেণী এবং তার মানদণ্ড বা নিরূপনের মাপকাঠি কী হবে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে (অর্থাৎ রাজ্যে) এবং অঞ্চলে হিন্দুসমাজের গঠনপ্রকৃতি এক এক রকম। গোঁড়া ও সনাতনী হিন্দু বা ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রচণ্ড দাপট কোন কোন এলাকায়, যেমন দক্ষিণ-ভারতে। কোথাও বা মাঝারি রকমের, কোথাও অনেকটা কম, যেমন (অবিভক্ত) বাংলায়। বাংলায় কম হলেও তখনও রক্ষণশীল বর্ণের মানুষ নিজ নিজ বর্ণগত ও কৌলীণ্য মহিমার গৌরববোধ এবং গর্বান্ধে তথাকথিত অবনত শ্রেণীর ও নমঃশূদ্র মানুষকে অবজ্ঞা ও ঘৃণা করতেন। বস্তুত মানুষ বলেই তাদের গণ্য করতেন না তাঁরা। পক্ষান্তরে অবনত তথাকথিত 'বৈশ্য' ও 'শূদ্র' বা 'নমঃশূদ্র' সম্প্রদায়ের মধ্যে এতো বিভিন্ন রকম স্তর এবং ব্যক্তিগত পদবীর অজস্রতা ছিল যে, তারাও ঠিক সমগোত্রীয়ের আত্মীয়তা বা একাত্মতাবোধে ঐক্যবদ্ধ ছিল না। এই 'অবনত শ্রেণী' গুলির মধ্যেও শিক্ষাগত এবং আর্থিক ও বৈষয়িক দিক থেকে যারা অন্যদের অপেক্ষা অনেকটা উন্নত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, তাঁরা অন্যান্য সব 'অবনত শ্রেণী'কে মনে মনে অশ্রদ্ধা ও হীন মনে করতেন। এমন কি অনুন্নত' বা 'অবনত শ্রেণী' হিসেবে সরকারী তালিকাভুক্ত হতে বা চিরকালের

মত চিহ্নিত হতে তাঁরা ঘোরতর প্রতিবাদ বা আপত্তি জানালেন। বস্তুত 'পুণা চুক্তি'র পর তাই-ই ঘটলো বাংলা (অবিভক্ত) দেশে।

'পুণা চুক্তি'র পর বাংলাদেশে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশেও সরকারী 'ফ্রাঞ্চাইস কমিটি (Franchise Committee) সংবাদপত্রে সমস্ত 'অবনতজাতি-কে সরকারী তালিকাভুক্ত হবার জন্য নোটিস বা বিজ্ঞপ্তি জারি করে (১৯শে জানুয়ারী, ১৯৩৩)। প্রাথমিক ভাবে ১৯৩১ সালের বাংলার 'সেন্সাস রিপোর্ট' হতে মোট ৮৬ / ৮৭ টি 'অবনত শ্রেণী' ও উপজাতি'র একটি তালিকা করে এই বিজ্ঞপ্তি তে বলা হয়, যাঁরা এই তালিকাভুক্ত হতে চান না, তাঁরা যেন এক মাসের অর্থাৎ ১৪ই ফেব্রুয়ারির মধ্যে গভর্ণমেণ্টকে লিখিতভাবে জানিয়ে দেন। সরকারী তালিকায় প্রাথমিক নিম্নলিখিত ৮৭ টি বর্ণ ও জাতি-গোষ্ঠীকে 'অনুন্নত' বা 'অবনত' শ্রেণী হিসেবে ঘোষণা করা হয় :

"আগরিয়া, বাগদী, বাহেলিয়া, বাইতি, বাউরি বেদিয়া, বেলদার, বেরুয়া, ভাটিয়া, ভুঁইমালি, ভুঁইয়া, ভুমিজ, নিন্দ, বিঞ্জিয়া, চামার, ধেনুয়ার, ধোবা, দোয়াই, ডোম, দোসাদ, গারো, খাসি, গোনরি, হদি, হাজং, হালালাখোর, হাড়ি, হো, জেলিয়া, কৈবর্ত ঝালো, মালো, কাদার, খারো, কালওয়ার, কান, কাঁষ, কান্দ্রা, কেওরা, কাপালি, কাপুরিয়া, কারেঙ্গা, কস্তা, কউর, খণ্ডাইত, খাতিক, কীবক, কোচ, কোনাই, কোনওয়ার, কেরা, কোটাল, লালবেগি, লোধা, লোহার, মাহার, মালি, মাল, মল্ল, মাল পাহাড়িয়া, মেছ, মেথর, মুচি, মুণ্ডা, মুসাহার, নাগর, নার্গেসিয়া, নৈয়া, নমঃশূদ্র, নাথ, নুজিয়া, ওরাও, পালিয়া, পান, পাসি, পাটনি, পোদ, পুন্ডুরী, রাভা, রাজবংশী, রাজু, রাজওয়ার, সাঁওতাল, সাগির্দপেশা, সুকলী, শুড়ি, তিয়র, ও তুরী।"

বলা বাহুল্য, এই তালিকাভুক্তির নথিকেই 'Scheduled castes' বলে চিহ্নিত করা হয়। বস্তুত সাধারণ মানুষের,—এমন কি তথাকথিত বহু শিক্ষিত মানুষের মনেও 'সিডিউলড্' বা 'তফসিল সম্প্রদায়' মানেই খুবই 'হীন অস্পৃশ্য এবং নীচ বংশোদ্ভূত' বলে একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে, আজও পর্যন্ত। অধিকাংশ মানুষই 'তফশীল শ্রেণী' কথাটার অর্থ বা তাৎপর্যটাই জানেন না।

বস্তুত, এর জন্য সরকারী বিজ্ঞপ্তি ও প্রচারের ধরণ-ধারণটাও কম দায়ী নয়। অবশ্য দক্ষিণ ভারতে (এবং উত্তর ভারতেও বেশ কিছু এলাকায়) প্রধানত 'অস্পৃশ্য-দের'কেই 'তফশীলী' তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। বাংলা দেশে বল্লালী-কৌলীন্য-প্রথা এবং পরবর্তীকালে বাংলার স্মার্তকারদের কৌলীন্য পুনর্বিন্যাসের পর বিভিন্ন বর্ণ ও বৃত্তির (পেশাগত) জন্য কিছু শ্রেণীর হিন্দুকে স্পৃশ্য এবং 'জল-চল' করে নেওয়া হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'নব শায়ক' (বা 'নব শাখা' 'লব্শাখা') যার মধ্যে তিলি, মালাকার, তামুলি, সাদ্গোপ, নাপিত, বারুই, কামার, কুমোর, গন্ধবণিক ইত্যাদি শ্রেণীর পেশা বা জীবিকাগত বৃত্তির মানুষকে স্পৃশ্য ও 'জল-চল' এবং সামাজিক ক্রিয়াকর্মে তাদের সামাজিক মর্যাদা এবং স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এ ছাড়াও

পূর্ব পশ্চিম উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গে সমশ্রেণীর কিছু বৃত্তিধারী মানুষ ছিলেন যাঁরা 'ডোম, হাড়ি বাউরী মুচি মেথর ধাঙ্গ'ড় ইত্যাদি তথাকথিত 'শূদ্র বা নমঃ শূদ্র' শ্রেণীর মানুষদের ঘৃণা করতেন এবং নিজেদেরকে অনেক উচ্চ জাতি বা বংশোদ্ভূত বলে মনে করতেন। তাঁরা সন্তর্পণে এই সব তথাকথিত 'নীচ জাতির' সংস্পর্শ এড়িয়ে চলতেন, পাছে স্পর্শদোষ ঘটে। অথচ মজাটা এই, এই সব 'নবশাখা' বা সমশ্রেণীর উপরস্থ কিছু মানুষ ছাড়া তাদেরই গোষ্ঠীর বা জাতির অধিকাংশ মানুষই দুঃস্থ, এবং অশিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিত ও কর্মহীন হয়ে অনশনে অর্ধাশনে দিনাতিপাত করছিলেন। এঁদের মুষ্টিমেয় বা ওপরতলার কয়েকজন ব্যবসা-বাণিজ্য মহাজনী তেজারতী এবং লাটদারী ও পত্তনদারি নিয়ে বিস্তর বিষয় সম্পত্তি জমিজমা হস্তগত করে কাঞ্চন-কৌলীন্যগর্বে সমাজপতির বেশে সবার উপর ছড়ি ঘোরাতেন।

মুস্কিল হলো, 'অবনত শ্রেণী'র প্রাথমিক তালিকাটি সরকারী বিজ্ঞপ্তি হিসেবে 'ক্যালকাটা গেজেট' এবং অন্যান্য সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়ে যাওয়াতে। এতদিন পর্যন্ত 'সেন্সাস রিপোর্টে'র প্রতিবেদনও তালিকার মধ্যেই ছাপার অক্ষরেই চাপা পড়েছিল। বিজ্ঞাপনে ডোম, বাউরী, বাগদী, হাড়ি, মুচি, চামার, সাঁওতাল, রাভা, ধাঙড় প্রভৃতি ৮০ / ৯০ টি তথাকথিত 'অস্পৃশ্য' 'শূদ্র'-দের সঙ্গে নিজ-নিজ 'জাতের নাম এক তালিকাভুক্ত দেখবেন কী করে! আহত আত্মসম্মানবোধে ফুঁসে উঠে বেশ কিছু জাতি-গোষ্ঠীর সমাজপতিরা ঐ তালিকা থেকে নিজেদের নাম প্রত্যাহার বা কেটে দেবার আবেদন জানাতে থাকেন। বলাবাহুল্য, শিক্ষায় দীক্ষায় এবং বৈষয়িক দিক থেকে এইসব জাতি একেবারে নীচের তলার কৃষক ও দিন মজুরদের অপেক্ষা অনেকটা উন্নত ও প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা ও 'পুণা চুক্তি'-র প্রধান অসঙ্গতি ও দোষত্রুটির সমালোচনা প্রসঙ্গে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 'প্রবাসী'-তে (অগ্রহায়ণ, ১৩৩৯ ॥ পৃ ৩০২) লিখলেন :

"প্রধান মন্ত্রীর ব্যবস্থার এবং হিন্দু নেতাদের মীমাংসার একটি প্রধান দোষ এই, যে, বহু সংখ্যক হিন্দুকে 'অস্পৃশ্য' 'অনাচারণীয়' বা 'অবনত' বলিয়া আত্মপরিচয় দিতে হইবে, তবে তাঁহারা সংরক্ষিত পদগুলির জন্য নির্বাচক ও প্রার্থী হইতে পারিবেন। এরূপ পরিচয় অস্পৃশ্যতা ও অনাচারণীয়তার সম্পূর্ণ বিনাশে বাধা ও বিলম্ব জন্মাইবে। তাছাড়া, এরূপ পরিচয় অপমানকর ও মনুষ্যত্বহ্রাসকারী।"

কথাটা মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। স্মরণ রাখা দরকার, সর্বজনীন অবশ্য-শিক্ষা, চাকরী বাকরীতে 'তফ্‌শীলী শ্রেণী'র আনুপাতিক হার নির্ধারণ এবং কৃষিতে

★ 'পরাশর সংহিতা'তেও এই ধরনের 'নবশায়ক'দের একটা তালিকা করা হয়েছে। কিন্তু 'সুবর্ণ' বণিক্‌দের মত উন্নত শ্রেণীকে বল্লালসেন জোর করে 'অবনত ও 'জল-অচল'-শ্রেণী করে দিয়েছিলেন।

সামন্ততান্ত্রিক শোষণের অবসান ক'রে ব্যাপক গণতান্ত্রিক ভূমিসংস্কার—সর্বোপরি দেশের স্বাধীনতা এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামো ও সংবিধান ইত্যাদি অত্যন্ত গুরুতর প্রশ্নগুলো তখনও পর্যন্ত এর সঙ্গে যুক্ত হয়নি। শুধুমাত্র ব্যবস্থা পরিষদ ও আইন সভায় প্রতিনিধি প্রেরণ বা ভোট দানের অধিকার লাভের জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত কয়েকজন ছাড়া, দেশের বিশাল তথাকথিত অবনত বা 'তফসিলী শ্রেণী'র মানুষের তেমন কিছু আগ্রহ আকর্ষণ থাকার কথা নয়। শুধু এইটুকু লাভের জন্য চিরকালের তরে 'অবনত শ্রেণী' বা 'তফ্‌সিলী শ্রেণী'র তালিকায় নিজেদের নাম তালিকাভুক্ত করাতে বেশ কিছু অবনত শ্রেণীর সমাজপতিরা তীব্র আপত্তি জানাতে থাকেন। গবর্ণমেণ্টের ফ্রাঞ্চাইস কমিটির ঐ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর সারা বাংলা জুড়ে ('তফ্‌সিলী তালিকাভুক্ত হওয়ার') তথাকথিত নানা অবনত শ্রেণীর জাতির মধ্যে বেশ কিছুটা অসন্তোষ ও বিক্ষোভ আলোড়ন শুরু হয়। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'প্রবাসী' পত্রিকায় এর বিস্তারিত যে তথ্যানুগ বিবরণ দিয়েছিলেন, তাতে এর একটা বাস্তব চিত্র প্রকাশ পেয়েছে। কৌতূহলী পাঠকের অবগতির জন্য এখানে তা উদ্ধৃত হলো (প্রেবাসী-ফাল্গুন ১৩৩৯ ॥ পৃ ৭৪৬-৫৪):

বঙ্গের অবনত শ্রেণীসমূহের তালিকা

বাংলা গবর্ন্মেণ্ট গত ১৯শে জানুয়ারীর কলিকাতা গেজেটে হিন্দু সমাজের অবনত জাতিদের একটি তালিকা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, যে, ইহা চূড়ান্ত নহে, সমালোচনার জন্য প্রকাশিত হইয়াছে। অর্থাৎ ইহা হইতে কোন কোন জাতিকে হয়ত বাদ দেওয়া যাইতে পারিবে, যেমন তালিকাটি প্রকাশিত করিবার পূর্ব্বেই কলু ও তেলীদিগকে এই কারণে বাদ দেওয়া হইয়াছে, যে, তাঁহারা অবনত শ্রেণী সমূহের অন্তর্গত হইবার বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট আপত্তি জানাইয়াছিলেন। মুসলমান ও খ্রীষ্টিয়ানদের মধ্যেও "অস্পৃশ্য" ও অবনত জাতি আছে। কিন্তু তাঁহাদিগকে অন্যান্য মুসলমান ও খ্রীষ্টিয়ানদিগের হইতে আলাদা করিয়া দেখাইয়া তাঁহাদের জন্য ব্যবস্থাপক সভাসমূহে আলাদা আসন রাখিবার বিধান গবর্ন্মেণ্ট করেন নাই। ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে আমরা অসমর্থ। কেবল হিন্দুসমাজের কতকগুলি জাতিকে এবং তাহার সঙ্গে কতিপয় আদিম জাতিকে তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে। এই জাতিগুলির নাম ও লোকসংখ্যা (১৯৩১ সালের সেন্সস অনুসারে) নীচে মুদ্রিত হইল।

★ বলাবাহুল্য, প্রবাসী সম্পাদকের দৃষ্টিভঙ্গী, বিচার-বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্তাদি সবটাই নির্ভুল কিংবা গ্রহণীয় নয়। তা সত্ত্বেও সমসাময়িক প্রতিক্রিয়া, কিছু মূল্যবান তথ্য ইত্যাদির একটা বাস্তব চিত্র এইসব বিবরণ থেকে পাওয়া যায়। —লেখক

অবনত জাতি ও তার লোকসংখ্যা

আগরীয়া ২৪০, বাগদী ৯৮৭৫৭০, বাহেলিয়া ৪৪৪৯, বাইতি ৮৮৮৮ বাউরী ৩৩১২৬৮, বেদিয়া ৭২৬৩, বেলদার ৩১৩৯, বেরুয়া ৩১৩৫, ভাটিয়া ৩২২, ভুঁইমালী ৭২৮০৪, ভুঁইয়া ৫০৪০৫, ভূমিজ ৮৫১৬১, বিন্দ ১৯৫১৮, বিঞ্জিয়া ৫০২, চামার ১৫০৪৫৮, ধেনুয়ার ৪৪, ধোবা ২২৯৬৭২ দোআই ১৯৬০, ডোম, ১৪০০৬৭, দোসাধ ৩৬৪২৩, গারো ৩৮২২৮, ঘাসি ৫৬৪০ গোনরি ৩১৪৯, হদি ১৪৩৩৪, হাজং ১৯৬৯৪, হালালখোর ৮৭৬, হাড়ি ১৩২৪০১, হো ২৬, জালিয়া কৈবর্ত ৩৫২০৭২, ঝালো, মালো ১৯৮০৯৯ কাদার ১১০০, খয়রা ৩৮২৮৭, কালওয়ার ১৩৫৪০, কান ৬৬, কাঁধ ১৫২৫, কান্দ্রা ৪৭২৯, কাওরা ১০৭৯০৮, কাপালী ১৬৫৫৮৯, কাপুরিয়া ১৭০, করেঙ্গা ৯৮৫৫, কান্হ ২৬০১, কাউর ১৮০১, খণ্ডাইত ৩৫০৮০, খটিক ১১৫৭, কচিক ২, কোচ ৮১২৯৯, কোনাই ৪১০৫৮, কোনওয়ার ১৩৩ কোঁড়া ৪৯২৬৫, কোটাল ৭৬৫১, লালবেগী ৪৯৬৫, লোধা ১১০০১, লোহার ৫০১৮২, মাহার ১৯৮৬, মাহলি ১৯১০৬, মাল ১১১৪২২, মাল্লা ২৬২৫৪, মালপাহাড়িয়া ১৩০২১, মেচ ৯৯৮৪, মেথর ২৩২৮১, মুচি ৪১৪২২১, মুণ্ডা ১০৮৬৮৬, মুসাহর ১১৭৮৪, নাগর ১৬১৬৪, নাগেসিয়া ২২৯১, নৈয়া ৪৮, নমশূদ্র ২০৯৪৯৫৭ নাথ (যোগী, যুগী ৩৮৪৬৩৪, সুনিয়া ২৮১০০, ওরাওঁ ২২৮১৬১, পালিয়া ৪৩১৬৩, পান ১৮৫৫, পাসি ১৮৯২৫, পাটনি ৪০৭৬৬, পোদ ৬৬৭৭৩১, পুণ্ডরী ৩১২৫৫, রাভা ৩০৫৬, রাজবংশী ১৮০৬৩৯০, রাজু ৫৬৭৭৮, রাজওয়ার ৩১৩৩৭, সাঁওতাল ৭৯৬৬৫৬, সাগির্দপেশা ৩৩৬, সুক্রি ৩৮৬০, শুঁড়ী ৭৬৯২০, তিয়র ৯৬৪১৩, তুরী ১৭৫০২।

ক্ল্যাপ্তিস্ কমিটি কেবল সেই সকল জাতিকে অবনত বলিয়া ধরিতে বলিয়াছিলেন "যাহারা স্পর্শ বা সান্নিধ্য দ্বারা ব্রাহ্মণাদি উচ্চ" জাতিকে অশুচি করে। মান্দ্রাজ, বোম্বাই ও মধ্যপ্রদেশগুলিতে এই সংজ্ঞা অনুসৃত হইয়াছে। অন্য সকল প্রদেশের বিষয় এস্থলে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা অনাবশ্যক। উত্তর-ভারতের কোন কোন প্রদেশে এই সংজ্ঞা অনুসৃত হইলে প্রধান মন্ত্রীর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন। সেই জন্য তিনি বলেন, যে এই সব প্রদেশে সংজ্ঞাটির পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইতে পারে। বংলা গবর্ন্মেণ্ট তাঁহার এই মন্তব্যের সুযোগ

গ্রহণ করিয়া এমন কতকগুলি জাতিকে তাঁহাদের তালিকাভুক্ত করিয়াছেন, যাঁহারা সরকারী মতে সামাজিক ও রাজনৈতিক নানা দিকে অনগ্রসর।

প্রধান মন্ত্রীর মন্তব্যটিরই আলোচনা প্রথমে করা যাক্। দক্ষিণ-ভারতের প্রদেশগুলিতে যে-সংজ্ঞা অনুসারে কতকগুলি জাতিকে অবনত গণনা করা হইল, উত্তর-ভারতে সেই সংজ্ঞা কেন অনুসৃত হইল না? ইহার একটা সহজবোধ্য কারণ এই, যে, উত্তর-ভারতে—যেমন বাংলা দেশে—উহা অনুসৃত হইলে এখানে অবনতদের সংখ্যা কম হয়। বঙ্গে অস্পৃশ্য অর্থে অবনতদের সংখ্যা কম হওয়ায় কি অসুবিধা বা ক্ষতি আছে, তাহা আমরা বুঝিতে অসমর্থ। যদি কোন প্রদেশে অস্পৃশ্য অর্থে অবনত একটি জা'ত বা একটি মানুষও না থাকে, তাহা ত ভালই। কিন্তু সম্ভবতঃ প্রধান মন্ত্রী মহাশয়ের মনে কোনও কারণে এই জেদ জন্মিয়া থাকিবে, যে, ভারতবর্ষে সর্ব্বত্র হিন্দু সমাজকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া নিচের ভাগটাকে ব্যবস্থাপক সভায় স্বতন্ত্র আসন ও স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনাধিকার দিতে হইবে। দক্ষিণভারতের প্রদেশগুলিতে অস্পৃশ্যতাকে অবনততার লক্ষণ বলিয়া ধরাতেই এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। উত্তর ভারতে কেবল বঙ্গের কথাই আমরা আলোচনা করিতেছি। বঙ্গে এমন কোন জা'ত নাই, খুব গোঁড়া ব্রাহ্মণদের মতেও যাঁহারা নিকটে আসিলে ব্রাহ্মণরা অশুচি হন; কিন্তু এমন জা'ত আছেন যাঁহারা ব্রাহ্মণকে ছুঁইলে ব্রাহ্মণ অশুদ্ধ হইয়া যান। কিন্তু এই সব জা'তের লোকসংখ্যা কম। সুতরাং কেবল এই লোকগুলিকে অবনত বলিলে বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের নীচের ভাগটা বড় ক্ষুদ্র হইয়া যায়, এবং তাহাদিগকে বেশী আসন দেওয়া যায় না। সেই জন্য, বঙ্গে সংজ্ঞাটা অন্য রকম করা হইয়াছে। এখানে বিভাগের ভিত্তি করা হইয়াছে সামাজিক ও রাজনৈতিক অনগ্রসরতা ("The list has been prepared on the basis of the social and political backwardness of these castes")। যাঁহাদের স্পর্শ বঙ্গে গোঁড়া ব্রাহ্মণদিগকে অশুদ্ধ করে, তাঁহারা ত বঙ্গে অবনত আছেনই; অধিকন্তু, যাঁহারা সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে অনগ্রসর তাঁহারাও এই প্রদেশে সরকার কর্ত্তৃক অবনত বলিয়া গণিত হইয়াছেন। মান্দ্রাজ, বোম্বাই এবং মধ্যপ্রদেশসমূহে যাঁহারা অস্পৃশ্য তাঁহারা ছাড়া অন্য কতকগুলি লোকও তথায় আছেন যাঁহারাও রাজনৈতিক ও সামাজিক হিসাবে অনগ্রসর। এখন জিজ্ঞাস্য এই, বঙ্গে যদি স্পৃশ্য অথচ সমাজে ও রাজনীতিতে অনগ্রসর লোকদিগকে স্বতন্ত্র আসন এবং কতকটা স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনের অধিকার দেওয়া ন্যায়সঙ্গত মনে হইল, তাহা হইলে মাদ্রাজ বোম্বাই ও মধ্যপ্রদেশে স্পৃশ্য অথচ সমাজে ও রাজনীতিতে অনগ্রসর জা'তদিগকে স্বতন্ত্র আসন ও কতকটা স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনের অধিকার কেন দেওয়া হইল না? প্রশ্নটা আর এক রকমে প্রকাশ করা যাক্। দক্ষিণ-ভারতে যদি কেবল অস্পৃশ্যদিগকেই স্বতন্ত্র আসনাদি দেওয়া রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থার পক্ষে যথেষ্ট হইয়া থাকে, তাহা হইলে বঙ্গে কেবল অস্পৃশ্যদিগকেই তাহা দেওয়া কেন যথেষ্ট হইল না? দক্ষিণ-ভারতে শিক্ষা, আর্থিক অবস্থা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, রাজনৈতিক

CENTRAL LIBRARY

প্রচেষ্টা, সামাজিক মর্য্যাদা প্রভৃতি বিষয়ে সমাজে অস্পৃশ্যদের স্থান যেরূপ, বঙ্গে স্পৃশ্য অথচ সরকারী মতে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে অনগ্রসর জাতিসমূহের স্থান তাহার অপেক্ষা উচ্চে।

এই সকল কারণে আমাদের মনে হয়, ঠিক সমশ্রেণীস্থ লোকদের সম্বন্ধে ন্যায্য ব্যবহার ও ব্যবস্থা করা প্রধান মন্ত্রীর ততটা অভিপ্রেত ছিল না, হিন্দুসমাজকে দুটা প্রধান স্বতন্ত্র অংশে বিভক্ত করা বা বিভক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করা যতটা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল। আমাদের এই অনুমানের আর একটা কারণ এই, যে, মুসলমান, খ্রীষ্টিয়ান ও শিখদের মধ্যেও অস্পৃশ্য ও অবনত জা'ত আছেন। কিন্তু তাঁহাদের জন্য আলাদা আসনাদির ব্যবস্থা করিয়া ঐ তিন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অখণ্ড বিবেচিত হইবার দাবি বিনষ্ট করা হয় নাই।

বাংলা দেশে সামাজিক ও রাজনৈতিক অনগ্রসরতার ভিত্তিতে হিন্দুসমাজকে দুটুকরা করা হইয়াছে। সামাজিক ও রাজনৈতিক অনগ্রসরতা আপেক্ষিক জিনিষ। ইহার কোন নির্দ্দিষ্ট ষ্ট্যাণ্ডার্ড বা মান নাই। গোঁড়া হিন্দুদের মতে সব হিন্দুই সদাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণদের পশ্চাদ্বর্ত্তী, দেবার্চ্চনা ও দেবদেবীর মূর্ত্তি ও বিগ্রহ স্পর্শ করিতে কেবল উক্ত ব্রাহ্মণেরাই অধিকারী। কিন্তু তা বলিয়া সমগ্র হিন্দুসমাজে সুব্রাহ্মণ ছাড়া আর সব জা'তকে অনগ্রসর বলা চলিবে না। বস্তুতঃ সামাজিক হিসাবে অগ্রসর ও অনগ্রসরের মধ্যে কোথাও রেখা টানা অসম্ভব। ব্রাহ্মণদের মধ্যেই সামাজিক মর্য্যাদায় হীন শ্রেণী অনেক আছে। ব্রিটিশ গবর্ম্মেণ্ট অনেক অনধিকার-চর্চ্চা করিয়া থাকেন। সামাজিক বিষয়ে তাঁহারা কেবল সেই সেই স্থলে হস্তক্ষেপ করিতে অধিকারী যেখানে হস্তক্ষেপ না করিলে নিষ্ঠুরতা হয়, বা দুর্নীতিকে প্রশ্রয় বা উৎসাহ দেওয়া হয়। সামাজিক হিসাবে হিন্দুসমাজে "নীচ জাত" কাহারা এবং "উঁচু জা'ত" কাহারা, এই অনধিকারচর্চ্চা ১৯০১ সালের সেন্সস্ রিপোর্টে করা হইয়াছিল। সমগ্র ভারতের সেন্সস্ রিপোর্ট সে বার রিজলী ও গেট সাহেবদ্বয় লিখিয়া পরিশিষ্টে সব জা'তকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। সেই শ্রেণীবিভাগে বাংলা ও উড়িষ্যাকে মোঙ্গোলো-দ্রাবিড়ীয় অঞ্চল ("Mongolo-Dravidian Tract) বলা হইয়াছিল। আমাদের মধ্যে যাঁহাদের "আর্য্যামি" আছে, তাঁহারা ইহাতে সন্তুষ্ট হইবেন না রিজলী ও গেটের এই শ্রেণীবিভাগে বাংলা ও উড়িষ্যার হিন্দু-দিগকে সাত শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া ময়লা-পরিষ্কারক ("scavengers") দিগকে এই সাত শ্রেণীরই বাহিরে ফেলা হইয়াছিল। শ্রেণীগুলি এই :—প্রথম শ্রেণীতে কেবল ব্রাহ্মণদিগকে ফেলা হইয়াছিল, তাঁহাদের কোন বর্ণনা দেওয়া হয় নাই ; দ্বিতীয় শুদ্ধ শূদ্রদের উর্দ্ধস্থিত জা'ত সকল ("Castes ranking above clean Sudras") ; তৃতীয়, শুদ্ধ শূদ্রসমূহ ; চতুর্থ, অবনমিত বা পতিত ব্রাহ্মণ পুরোহিত বিশিষ্ট জা'ত সকল ; পঞ্চম, যে-সব জা'তের জল গ্রহণীয় নহে ; ষষ্ঠ, যে-সব "নীচ" জা'ত গোমাংস, শূকরমাংস ও কুক্কুটাদির মাংস খায় না ; সপ্তম, যাহারা অশুচি জিনিষ খায়। এই সব বর্ণনা সেন্সস্ রিপোর্টের, আমাদের নহে। কোন্ কোন্

জা'তকে কোন্ শ্রেণীতে ফেলা হইয়াছিল, তাহা লিখিব না। পূর্ব্বে বলিয়াছি, ময়লা-পরিষ্কারদিগকে সকল শ্রেণীর বাহিরেও নীচে ফেলা হইয়াছিল। বঙ্গের মুসলমানদিগকে তিন শ্রেণীতে ফেলিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীকে চারটি উপশ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছিল।

প্রভৃতির উচ্চপদস্থ লোকদের তালিকা দেখিলেও বুঝা যাইবে যে, ব্রাহ্মণদের সামাজিক স্থান যাহাই হউক, সরকারী ও বেসরকারী রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁহাদের স্থান সকলের উপর নহে—তাঁহারা অনগ্রসর!

সামাজিক হিসাবে যাঁহারা সকলের উপরে রাজনৈতিক হিসাবে তাঁহারা অনেকের পশ্চাদ্বর্ত্তী হওয়ায়, গবর্ন্মেণ্ট তাঁহাদিগকে অবনত বলিয়া স্বীকার করিবেন কি?

ব্যবস্থাপক সভায় স্বতন্ত্র আসন কাহাদিগকে দেওয়া দরকার, গবর্ন্মেণ্ট মুখ্যতঃ তাহারই বিচার করিতেছেন। অতএব, যে-সব জা'তের লোকে অবাধ প্রতিযোগিতায় মিলিত নির্ব্বাচনদ্বারা ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে রাজনৈতিক হিসাবে অগ্রসর মনে করিলে অন্যায় হইবে না। বর্ত্তমান বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সকল নির্ব্বাচিত হিন্দু সভ্যের জা'ত আমারা জানি না। তাঁহারা সকলেই মিলিত নির্ব্বাচনের অবাধ প্রতিযোগিতায় ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিতে পারিয়াছেন। আমরা জিজ্ঞেস করিয়া যতটা জানিতে পারিলাম, তাহাতে তাঁহাদের মধ্যে দুই জন রাজবংশী, তিন বা চারিজন নমঃশূদ্র, এক জন মেথর, এবং আরও কয়েকজন অন্য তথাকথিত অস্পৃশ্য বা অনাচরণীয় জাতির। অসহযোগ আন্দোলন সংপৃক্ত পরিহাসের ফলে মেথর-জাতীয় সভ্যটি নির্ব্বাচিত হইয়া থাকিবেন। অন্যেরা প্রতিযোগিতায় জয়ী হইয়া নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। এই কারণে রাজবংশী, নমঃশূদ্র প্রভৃতি কয়েকটি জা'তকে রাজনৈতিক হিসাবে বাউরী, বেদিয়া, ডোম, খটিক প্রভৃতির মত অবনত বা অনগ্রসর বলা উচিত নহে। কোন-না-কোন বার কোচ, পোদ, চামার ও দোসাধ জাতির লোকেরাও প্রতিযোগিতা দ্বারা ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিয়াছেন। অথচ অবনতদের সরকারী ফর্দ্দে রাজবংশ, নমঃশূদ্র, কোচ, পোদ, চামার ও দোসাধদের নাম আছে। রাজবংশীদের সম্বন্ধে সরকারী 'ইণ্ডিয়ান ক্র্যাণ্ডিস কমিটির' রিপোর্টের ১১৭ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে:—

"A few days before our report was signed, we received a telegram from the local [Bengal] Government to the effect that up to the date of the telegram the revised figure for depressed classes in the province was 10·3 millions. This total includes the Rajbansis, numberings 1,804371, who have themselves asked for exclusior and who, it is generally agreed, should exclnded."

তাৎপর্য্য:—আমাদের রিপোর্ট স্বাক্ষরিত হইবার কয়েক দিন পূর্ব্বে বাংলা গবর্ন্মেণ্টের নিকট হইতে আমরা এই মর্ম্মের একটি টেলিগ্রাফ প্রাপ্ত হই, যে, ঐ

টেলিগ্রামের তারিখ পর্য্যন্ত বঙ্গে অবনত শ্রেণীসমূহের সংশোধিত লোকসংখ্যা এক কোটি তিন লক্ষ। ১৮,০৪,৩৭১ সংখ্যক রাজবংশী জাতির লোক এই সংখ্যার অন্তর্গত ছিল, যাহারা নিজে অবনতদের তালিকা হইতে আপনাদিগকে বাদ দিতে অনুরোধ জানাইয়াছিল এবং যাহাদিগকে তালিকা হইতে বাদ দেওয়া উচিত, ইহা সাধারণতঃ সকলের মত।

তালিকাটি চূড়ান্ত ও কায়েম করিবার পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট সমালোচনার জন্য উহা প্রকাশ করিয়াছেন। উহার সমালোচনা হইতেছেও, কিন্তু তাহার ফলে কোন জাতি বাদ পড়িবে কি-না, বলা যায় না। কোনও জাতি কি প্রকারে বাদ পড়িতে পারে, তাহার একটা সম্ভাবনার পথ গবর্ণমেণ্টের তালিকার সঙ্গে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি হইতে পরোক্ষভাবে অনুমিত হইতে পারে। তাহাতে লিখিত হইয়াছে :—

"It excludes some castes like the Telis Kalus from which definite objections have heer received against inclusion in any list of 'depressed classes'."

তাৎপর্য :—তেলী ও কলুদের মত কোন কোন জা'তকে এই তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে, যাহাদের নিকট হইতে অবনত শ্রেণীর তালিকাভুক্ত হওয়ার বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট আপত্তি পাওয়া গিয়াছে।

ইহা হইতে এরূপ আশা করা অসঙ্গত হয়না, যে কোন জাতি তালিকার অন্তর্গত হইতে আপত্তি করিলেই তাহার নাম তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইবে। কিন্তু ঐ প্রকার আশার বিরুদ্ধেও কিছু বলিবার আছে। আমরা আগে সরকারী ইণ্ডিয়ান ফ্র্যাঞ্চিস্ কমিটির রিপোর্ট হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি, যে, রাজ-বংশীরা তালিকাভুক্ত হইতে আপত্তি করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের আপত্তি অনুসারে তাঁহাদিগকে বাদ দেওয়া উচিত, এই মতও কমিটি প্রকাশ করিয়াছিলেন। তথাপি সরকারী কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত তালিকা হইতে তাঁহাদিগকে বাদ দেওয়া হয় নাই। ইহা হইতে আমাদের মনে একটা অনুমানের উদয় হইয়াছে। আমাদের মনে হয়, প্রধান মন্ত্রী এবং তাঁহার অনুবর্ত্তী লোকেরা দেখাইতে চান, যে বাংলা দেশে খুব বেশীসংখ্যক হিন্দু সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক্ দিয়া অবনত। সেই জন্য তাঁহারা সংখ্যাবহুল কোন জাতিকে তালিকা হইতে বাদ দিতে অনিচ্ছুক। এরূপ অনুমানের কারণ বলিতেছি। বঙ্গে কলু ও তেলীদের মোটসংখ্যা ২,৯৫,৩০৬, এবং রাজবংশীদের-সংখ্যা ১৮,০৬,৩৯০। সেই জন্য অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক কলু ও তেলীকে বাদ দেওয়া সহজ হইয়াছে, কিন্তু আঠার লাখের উপর রাজবংশীকে বাদ দেওয়া হয় নাই। ১৯০১ সালের সেন্সসে রিজলী ও গেটের তালিকায় সুবর্ণ বণিকদিগকে সেই পঞ্চম শ্রেণীতে ফেলা হইয়াছিল "যাহাদের জল গ্রহণীয় নহে" ("whose water is not taken")। তাঁহাদিগকে কিন্তু আলোচ্য তালিকায় অবনতশ্রেণীভুক্ত করা হয় নাই (তাহা ঠিকই হইয়াছে)। কিন্তু

তাঁহাদিগকে বাদ দিবার একটা কারণ এই অনুমান হয়, যে, তাঁহাদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম।

তাৎপর্য্য ঃ—কখন কখন এক একটি সমগ্র জাতি শিক্ষা বা চাকরির বিশেষ সুবিধা লাভের জন্য আপনাদিগকে অবনত বলিয়া ঘোষণা করে। সুতরাং ব্যবস্থাপক সভার সদস্য পদের লোভে লোকে যে আপনাদিগকে অবনত বলিবে তাহা অসম্ভব নহে।

ব্যবস্থাপক সভার সভ্যত্বের লোভে অবনতত্ব স্বীকার

শিক্ষালাভের ও চাকরিলাভের সুবিধা হইবে বলিয়া অবনতত্ব স্বীকার এবং ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হইবার লোভে অবনতত্ব স্বীকার, এই উভয়ে প্রভেদ আছে অবনত শ্রেণীর ছাত্রদিগকে শিক্ষালাভের যে সুযোগ দেওয়া হয়, তাহাতে অনেক ছাত্র বৃত্তি পায়, অনেকে অর্দ্ধ বেতনে, কম বেতনে বা বিনা বেতনে পড়িতে পায়। অবনত শ্রেণীর লোক বলিয়া চাকরিও বহুসংখ্যক পায় বা পাইতে পারে। কিন্তু ব্যবস্থাপক সভায় অবনতদের জন্য কেবল ৩০টি আসন রক্ষিত থাকিবে। নির্ব্বাচন হইবে তিন চার বৎসর অন্তর অন্তর। অবনতদের তালিকাভুক্ত আছে ৮৬ / ৮৭ টি জাত। ইহাদের মধ্যে কোন কোন জা'তের লোক একাধিক আসন দখল করিতে পারে। কিন্তু যদি তর্কের খাতিরে ধরিয়া লওয়া যায়, যে; কোন জা'তের লোকই একটির বেশী আসন পাইবে না, তাহা হইলেও ফল এই দাঁড়াইবে, যে, ৩০টি জা'তের এক এক জন লোক এক একটি করিয়া মোট ত্রিশটি আসন পাইবেন। বাকী ৫৬ / ৫৭ টি জা'তের একজন লোকও একটিও আসন পাইবেন না। সুতরাং এই ৫৬ / ৫৭ টি জা'তের লোকদের অবনত স্বীকার নিষ্ফল লাঞ্ছনারই কারণ হইবে। ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইতে পারিলেই, যে, মানুষের হীনতা স্বীকার করা উচিত বা সার্থক, এরূপ অসত্য কথা বলিতেছি না। তাহা উচিত নয়, তাহাতে কোন সার্থকতা নাই। কিন্তু অনেকে ভাবিতে পারেন, "পেটে খেলে পিঠে সয়"। সেইজন্য বলিতেছি, অধিকাংশ জা'তকে বৃথাই হীনতা স্বীকার করিতে হইবে।' অন্যদিকে, যদি যোগ্যতা থাকে তাহা হইলে যোগ্যতার জোরেই ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইতে পারা যায়। তাহাই বাঞ্ছনীয়। অপমান ও হীনতার বিনিময়ে ব্যবস্থাপক সভার সভ্যত্ব লাভ বাঞ্ছনীয় নহে।

যে-সব জা'তের দু-এক জন লোক কপালে হীনতার ছাপ লাগাইয়া ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইবেন, তাঁহাদেরও বাকী অনেক লাখ অনেক হাজার লোক কেবল দাগীই হইয়া থাকিবেন, "সভ্য" হইবেন না। ভাল। কিন্তু কেহ যদি বলেন, "অবনত" লোকদের নেতারা বা প্রতিনিধিরা উন্নত শ্রেণীর লোকদের চেয়ে "অবনত"দের হিতচেষ্টা অধিক করেন বা করিয়াছেন, তাহা হইলে এরূপ কথা সত্য বলিয়া মানিতে পারি না। এ পর্য্যন্ত বরং ইহার বিপরীতই বঙ্গদেশে সত্য বলিয়া

দেখা গিয়াছে। অনুন্নতদের উন্নতির জন্য সভাসমিতি "উচ্চ" শ্রেণীর লোকেরাই অধিকাংশ স্থলে চালাইয়া আসিতেছেন। আমরা এজন্য তাঁহাদের কোন প্রশংসা করিতে চাই না—বড়াই করিবার তাঁহাদের কোন কারণ নাই। আমরা উচ্চশ্রেণীর লোকদের এরূপ কাজের উল্লেখ কেবল এই জন্য করিতেছি, যে, তাঁহারাঅন্য কাহাদের চেয়ে চিন্তা কম করেন, ইহা এত্য নহে। তাঁহারা যে যথেষ্ট করেন, ইহা অবশ্য বলিতেছি না। নিম্নশ্রেণীয় লোকদের প্রতি বহু শত বৎসর ধরিয়া যে অন্যায় ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত উচ্চশ্রেণীর লোকদের করা উচিত। সে প্রায়শ্চিত্ত এ-পর্য্যন্ত সামান্যই হইয়াছে। নিম্নশ্রেণীর লোকদের পরিশ্রমে ও দুঃখ-স্বীকারে উচ্চশ্রেণীর লোকদের অনেক সুবিধা হইয়াছে। সেই জন্য উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা ঋণী হইয়া আছেন। এই ঋণ তাঁহারা অল্পই শোধ করিয়াছেন।

আদিম জাতিদের অবনতদের তালিকাভুক্তি

বাংলা-গবর্ম্মেণ্টের বিজ্ঞপ্তিটিতে আছে,

"It is to be noted that the list includes not only Hindu castes but also some groups of aboriginal derivation now resident in Bengal which profess tribal or mixed religions."

তাৎপর্য্য ঃ—ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে, যে, তালিকাটিতে কেবল যে হিন্দু জা'ত আছে তাহা নহে ; কিন্তু ইহাতে অধুনা বঙ্গের অধিবাসী কতকগুলি আদিম জাতিকে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে যাহারা স্বস্ব জাতির ধর্ম্মে বা মিশ্র ধর্ম্মে বিশ্বাস করে।

তালিকাতে যে-সব আদিম জাতির নাম নিবিষ্ট করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে অনেকে হিন্দু, অনেকে খ্রীষ্টিয়ান, এবং অনেকে আদিম কোন ধর্ম্মে বিশ্বাস করে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, গারোদের উল্লেখ করিতেছি। ইহাদের কতক টাইব্যাল (আদিম জাতীয়), কতক খ্রীষ্টিয়ান, এবং কতক হিন্দু ধর্ম্মে বিশ্বাস করে। ইহাদের সকলকেই হিন্দু সমাজের অবনত শ্রেণীর মধ্যে ফেলার কোন ন্যায্যতা নাই। তদ্রূপ সাঁওতালদের কতক লোক হিন্দু, কতক ট্রাইব্যাল, কতক খ্রীষ্টিয়ান ও কতক বৌদ্ধ ধর্ম্মে বিশ্বাসী। সকলকেই হিন্দু সমাজের অবনত শ্রেণীতে ফেলা অযৌক্তিক।

যখন হিন্দুদের সংখ্যা কম দেখাইবার প্রয়োজন হয়, তখন আদিম জাতির অনেক লোককে হিন্দুর সমষ্টি হইতে বাদ দেওয়া হয়। হিন্দু সমাজের অবনত শ্রেণীর সংখ্যাবাহুল্য দেখাইবার জন্য আদিমজাতীয় খ্রীষ্টিয়ানদিগকে তাহাদের তালিকাভুক্ত করা কি উচিত ?

ভারতবর্ষের আদিমনিবাসীদের কল্যাণচেষ্টা সামান্যই হইয়াছে—সরকারী বেসরকারী কোন রকম চেষ্টাই যথেষ্ট হয় নাই। এই জন্য ব্যবস্থাপক সভায় তাহাদের প্রতিনিধি থাকিলে ভাল হয়। কিন্তু তাহাদের প্রতিনিধিত্ব করিবার উপযুক্ত লোক

CENTRAL LIBRARY

পাওয়া কঠিন। এ-বিষয়ে ফ্র্যাঞ্চিস্ কমিটির রিপোর্টে অনেক কথা লেখা হইয়াছে। তাঁহারা বলেন, "এই লোকগুলি ভারতবর্ষের অন্য সাধারণ অধিবাসীদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জীবন যাপন করে, তাহাদের স্বার্থ ব্যবস্থাপক সভায় কার্য্যকর প্রতিনিধিত্ব দ্বারা রক্ষিত হওয়া খুব বেশী আবশ্যক; তাহা সম্ভব না হইলে নূতন শাসনবিধিতে অন্য কোন ব্যবস্থা দ্বারা তাহা করা কর্ত্তব্য।" (ইণ্ডিয়ান ফ্র্যাঞ্চিস্ কমিটির রিপোর্টের প্রথম ভলুম, ১৩৫ পৃষ্ঠা।) কিন্তু ফ্র্যাঞ্চিস্ কমিটি স্পষ্ট করিয়া ইহাও বলিয়াছেন, যে, আদিমনিবাসীদিগকে অবনত শ্রেণীসমূহের সহিত মিশাইয়া ফেলাও উচিত নহে। যথা—

'The only evidence which we have been able to hear on the subject was from the Chota Nagpur Improvement Society of Bihar and Orissa and from the Census Commissioner for India and the Census Superintendent of the Central Provinces. They pressed upon us the view that the aborignals are an entirely distinet community from the deprefsed casses, and that under no circumstances should the two communities be amalgamated for purposes of representation. We have already suggested that this view should be accepted."—Indian Franchise Committee's Report, vol. I, paragraph 342, Page 135.

তাৎপর্য্য :—আদিমনিবাসীদের প্রতিনিধিত্ব বিষয়ে আমরা কেবল ছোটনাগপুর উন্নতিবিধায়িনী সমিতি, ভারতবর্ষের সেন্সস কমিশনার এবং মধ্যপ্রদেশের সেন্সস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সাক্ষ্য শুনিতে পারিয়াছিলাম।
তাঁহারা এই মতের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, যে, আদিম নিবাসীরা অবনত শ্রেণীসমূহ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক জনসমষ্টি, এবং প্রতিনিধিত্বের জন্য কোন অবস্থাতেই তাহাদিগকে একত্র মিশাইয়া ফেলা উচিত নহে। আমরা ইতিপূর্ব্বেই সূচিত করিয়াছি, যে এই মত গৃহীত হওয়া উচিত।"

কিন্তু বাংলা গবর্ন্মেণ্ট এই মত গ্রহণ না করিয়া তাহার বিপরীত কার্য্যই করিয়াছেন।

আদিমনিবাসীরা প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করেন, ইহা আমরাও চাই।

কাহারা "অবনত" হইতে অসম্মত

অবনতদের সরকারী তালিকাভুক্ত কোন্ কোন্ জা'ত ঐ তালিকাভুক্ত থাকিতে অসম্মতি জানাইয়াছেন, তাহার সম্পূর্ণ ফর্দ্দ আমরা পাই নাই। কয়েকটি সংবাদ পাইয়াছি। মানকী (ডাকঘর ফুলকোচা, জেলা ময়মনসিংহ) হইতে শ্রীযুক্ত ডাক্তার মনোমোহন নাথ তাঁহাদের জাতির বৃহৎ সভায় শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী নাথ মহাশয়ের সভাপতিত্বে নিম্নলিখিত তিনটি প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাঠাইয়াছেন :—

CENTRAL LIBRARY

১। সম্প্রতি বাঙ্গালা গভর্ন্মেণ্ট যোগী (নাথ) জাতিকে অবনত শ্রেণীভুক্ত করিয়া অবনতশ্রেণীর যে এক তালিকা প্রচারিত করিয়াছেন, তাহাতে যোগী সমাজের সমাজিক মর্য্যাদা বিশেষ ভাবে আহত হইয়াছে। সেজন্য যোগীজাতিকে এবম্প্রকার অবনত শ্রেণীভুক্ত করার বিরুদ্ধে এই সভা তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

২। সমগ্র যোগী সমাজের পক্ষ হইতে এই সভা বাঙ্গালা গবর্মেণ্টকে অনুরোধ করিতেছেন, যেন অতি সত্বর উক্ত অবনত শ্রেণীর তালিকা সংশোধন কল্পে যোগী জাতিকে উক্ত তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হয় এবং বঙ্গদেশের পঞ্চায়েৎ সমূহকে উক্ত সংবাদ যেন সত্বর দেওয়া হয়।

৩। এই সভার গৃহীত প্রস্তাবসমূহ প্রচারার্থে বিভিন্ন সংবাদপত্রের সম্পাদক গণকে অনুরোধ করা হউক।

ইহা ছাড়া বাজু জাতি, বৈশ্য কপালী জাতি, শোলাঙ্কি (সুক্লি) সমাজ এবং বেরুয়া সম্প্রদায় হইতে এইরূপ প্রতিবাদ হইয়াছে বলিয়া সংবাদপত্রে খবর বাহির হইয়াছে। অন্য কোন কোন জাতিও যদি প্রতিবাদ করিয়া থাকেন, তাহা ২৭শে মাঘ পর্যন্ত আমাদের চোখে পড়ে নাই। যাঁহারা প্রতিবাদ করিয়াছেন, তাঁহাদের বিন্দুমাত্রও ক্ষতি হইবে না ; বরং তাঁহাদের নিজেদের ও অন্য সকলের বিবেচনায় তাঁহারা সম্মানার্হ হইবেন।

প্রবন্ধের প্রবাসী পত্রিকা থেকে উদ্ধৃতি প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় মন্তব্য

১। প্রবাসী পত্রিকা কোনো গবেষণা মূলক পত্রিকা ছিল না—তৎকালীন সমাজে এমনকি ব্রিটিশ রাজত্বের অন্তিম লগ্নেও ঐ তালিকাভুক্ত প্রত্যেকটি জাতি নিরতিশয় ভাবে সামাজিক নিপীড়ন ভোগ করেছেন, অস্পৃশ্য হিসাবে ব্যবহার পেয়েছেন।

২। গান্ধীজী কোনোক্রমেই মধ্যস্থতা করেন নি উপরন্তু তফসিলীদের জন্য পৃথক নির্বাচনের বিরোধিতা করেই তিনি জেলে অনশন করেছিলেন।

৩। শুধুমাত্র আইন সভায় আসন লাভের জন্য নেতৃবৃন্দ পৃথক তালিকা মেনে নিয়েছিলেন —তা নয়।

৪। ব্রিটিশ নিশ্চয় এই বিভেদকে কাজে লাগিয়ে সাম্রাজ্যকে দীর্ঘায়িত করতে চেয়েছিলো— কিন্তু সামাজিক ব্যবধান যে তীব্র ছিল এ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই।

৫। বস্তুতঃ মনুর যুগ থেকে মহাভারতের যুগেও এই অস্পৃশ্যতার নজীর পাওয়া যায়।

CENTRAL LIBRARY

॥ ড. বি. আর. আম্বেদকর : প্রস্তুতি পর্ব ॥

প্রাককথন ১. ১. কোন মানুষের অবদান যথাযথ ভাবে বুঝতে হলে আমাদের প্রথমেই জানতে হবে তাঁর কালকে ; কোন্ ইতিহাসের অধ্যায় পেরিয়ে এসেছে সে যুগ, তা বুঝতে হবে। জানতে হবে তার পরিবেশকে। যার মধ্যে তিনি জন্মেছেন। জানতে হবে তখনকার রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থাকে। তারই পথভূমিতে বিচার করতে হবে তার ব্যক্তিগত কাজকর্ম, সাফল্য ও দুর্বলতাকে —সংগ্রাম ও জয়-পরাজয়কে। সমাজ-সভ্যতার বিচার-বিশ্লেষণের এই সরল ও গভীর রীতিই প্রয়োগ করতে হবে আম্বেদকরের ক্ষেত্রেও।

১.২. আমরা যেমন রামমোহন-বিদ্যাসাগর কে তার যুগ পরিবেশের চাহিদা. সমস্যা ও সংগ্রামের আলোকে বিশ্লেষণ করি এবং বুঝতে চেষ্টা করি সতীদাহ বা বিধবা বিবাহের মতো জটিলও ভয়ংকর সমস্যা সমাধানে তাদের কি দুঃসহ যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। যা কেবল আজকের অতিক্রান্ত সময়ে দাঁড়িয়ে বোঝা যায় না। তার জন্য প্রয়োজন স্বচ্ছ দৃষ্টি, প্রজ্ঞা ও গভীর মনন।

১.৩. আম্বেদকরের অবদান বা পরিচিতি প্রদানের প্রাক্কালে আমাদেরও সেই মানসিকতা গ্রহণ করতে হবে—দেখতে হবে ও বুঝতে হবে তিনি যে সামাজিক দুরারোগ্য ব্যাধির বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন—সে সমস্যাকে। ভারতীয় সমাজের কত গভীরে নিহিত এর বীজ আর কত বেদনা-সৃষ্টিকারী তার বিষফল—তা অনুধাবন করতে হবে। তাহলেই সামান্য হলেও আম্বেদকর আলোচনার এ-প্রয়াস যথাযথ হতে পারবে।

কিন্তু ক্ষুদ্র পরিসরে সে ব্যাপক আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। তবুও যতটুকু না বল্লে নয়—তেমনি কিছু কিছু বিষয়—একটু বিক্ষিপ্ত হলেও এখানে উল্লেখ করছি. ড. বি. আর আম্বেদকরের জীবন পর্যালোচনার পটভূমি হিসেবে।

২.১. **আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট :** ভারতের ঐতিহ্যের সূত্রধরে আমরা যেমন অনেক মহান দৃষ্টান্ত দিতে পারি তেমনি তার অন্ধকারময় দিকগুলিও কম ভয়ংকর নয়। ১৯২৭ সালে অমরাবতীতে এক সম্মেলনে আম্বেদকর নিজেই বলেছিলেন, "হিন্দুত্বের গৌরব বৃদ্ধিতে কত মানুষ তাঁদের সাধনার ফল যোগ করে গেছেন, যাঁদের মধ্যে আছেন বশিষ্ঠের মতো ব্রাহ্মণ, কৃষ্ণের মতো ক্ষত্রিয়, হর্ষের মতো বৈশ্য আবার তুকারামের মতো শূদ্র।—এই যে হিন্দুত্ব যা দেয়াল দিয়ে ঘেরা নয়—যা গ্রহিষ্ণু, সহিষ্ণু, চলিষ্ণু. এর একপাশে আবার আছে আরেক হিন্দু সমাজ যেখানে অনুদার ব্রাহ্মণ্যবাদের একাধিপত্য। ধর্ম সেখানে মানবতার অধিকারকে পদেপদে নির্লজ্জভাবে খণ্ডিত করে চলেছে।

২.১ এরা একই সঙ্গে বলবে 'সর্ব জীবে শিব' আবার কোটি কোটি মানব-সন্তানকেই শূদ্রের ঘরে জন্মের অপরাধে 'অস্পৃশ্য' ঘোষণা করবে। মানবিক সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখার এইসব শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তের মধ্যেই রয়েছে হিন্দু ধর্মের এক গভীর শঠতা, ভণ্ডামী, নীচতা। যাকে চরমভাবে ঘৃণা করতেন আম্বেদকর।

২.২. আম্বেদকরের বাল্য ও কৈশোরের অভিজ্ঞতা যে সমাজের মধ্যে লালিত সেখানে যদিও বৃটিশ শাসন ছিল তাহলেও তার কেবলই আগে সেখানে ছিল পেশোয়াদের নেতৃত্বে মূলতঃ ব্রাহ্মণ্য শাসন। শাস্ত্রীয় বিধানের নাম করে সামন্ত শোষণের এক ভয়ংকর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল মহারাষ্ট্রের মাহার সহ অন্যান্য অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের মানুষ। এই সব সম্প্রদায়ের মানুষকে গলায় মাটির পাত্র বা কোমরে ঝাঁটা ইত্যাদি বেধে প্রকাশ্যে বের হতে হোত। পশুর চেয়েও এরা অনাদৃত, অপমানিত, লাঞ্ছিত। বিস্ময়ের কথা এই সব বর্ণহিন্দুর রান্নাঘরে তাদের পালিত কুকুর ঢুকলে সব অশুচি হয় না, কিন্তু একজন তথাকথিত নীচু-জাতের মানুষ ঢুকলে সব অশুচি হয়ে যায়—সব খাবার ফেলে দিতে হয়। এমনি ঘৃণ্য পাশবিক সব বিধান! শুধু নিয়ম মাত্রই নয়—তা না মানলে যে শাস্তি পেতে হয় 'তা যে কি নিদারুণ, হিংস্র ও ভয়ংকর তা বর্তমান ভারতও প্রত্যক্ষ করে প্রতিদিন।

২.৩. এই অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের মানুষদের কোন অধিকার ছিলো না জলাশয়, নলকূপ, কুয়া বা সর্ব সাধারণের ব্যবহার যোগ্য কোন জলাধার থেকে জলসংগ্রহের। এরা একই ধর্মের—অর্থাৎ হিন্দু। কিন্তু এদের আরাধ্য দেবতাও নাগালের বাইরে। মন্দিরে ঢুকবার, পূজাদেবার অধিকার পর্যন্ত এদের নেই। কোন ভাবেই কোন উৎসবে এরা যোগ দিতে পারবে না। এরা চাষ করবে। ময়লা পরিষ্কার করবে —শ্রমসাধ্য সব কাজ করবে, কিন্তু পড়াশুনা করতে পারবে না।

গ্রাম বা শহরের সবচেয়ে নোংরা অস্বাস্থ্যকর আর সব দিক থেকে খারাপ জায়গায় এদের বাস করতে হবে। নানা প্রথা এবং ঋণ-দাদনের নামে এদের একাংশের গ্রহণ করতে হবে দাসের জীবন। সামন্ত সমাজের মহান (!) ঐতিহ্যে আজও এরা যেন লাঞ্ছনা ও অত্যাচারের জীবন্ত প্রতীক।

২.৪. হিন্দু ধর্মের এইসব নিষ্ঠুর বিধানের বিরুদ্ধে অনেক ধর্মপ্রাণ মানুষ দাঁড়িয়েছিলেন—যেমন রামানুজ, চক্রধর, রামানন্দ, কবীর, চৈতন্য, একনাথ, তুকারাম, রুহিদাস প্রমুখ। তাদের বাণীর প্রধান সুরছিলো—সবার উপরে মানুষ সত্য, কিন্তু তা সত্ত্বেও নিম্নবর্ণের এই মানুষগুলির কাছে বিদ্যালয় শিক্ষা ছিলো অকল্পনীয় ব্যাপার। এমনকি সাতারার মহারাজাকে পর্যন্ত বেশীরাতে লেখাপড়া শিখতে হয়েছিল, কারণ তিনি উচ্চবর্ণের মানুষ ছিলেন না।

২.৫ সে যাই হোক মহারাষ্ট্রের তৎকালীন পেশোয়াদের শাসন অবসানে যখন ব্রিটিশের শাসন চালু হোল। এঁদের মনে হোল যেন দাসত্ব মোচন ঘটলো। আজ কয়েক শতাব্দী পরে এসে আমাদের কাছে এ ভাবনার মূল্যায়নে—যা-ই মনে হোক না কেন—এছিল সে যুগের নির্মম সত্য—কিন্তু দৃঢ় বাস্তব।

ব্রিটিশের আগমনে সেদিন সমাজের এই একেবারে তলাকার চির অবহেলিত মানুষ একটু একটু করে বাইরের আলোর স্পর্শ পেলো—সামান্য শিক্ষার সুযোগ এলো। এলো অবশ্য উপনিবেশ রক্ষা ও সম্প্রসারণের স্বার্থের তাগিদেই। সাম্রাজ্য বাদীরাও খুঁজছিলো—যে সমাজকে পদানত করে রাখবে তার বিভেদের সূত্র

কোথায়—সেই দুর্বল স্থানেই তারা চিহ্নিত করতে চাইলো। সচেতন অংশ কে আঘাত করতে সমাজের অসচেতন অংশকে সেই আঘাতের হাতিয়ার করে তুলল। তাই সেদিন ভারতে যে ব্রিটিশ সেনা বাহিনী গড়ে উঠেছিল তার সূচনা পর্বে এই নিম্ন-হিন্দুরাই ছিলো প্রধানশক্তি।

২·৬ সেজন্যই আমরা দেখতে পাই—ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আধিপত্যাধীন বাংলা, বোম্বে ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির জন্যে গঠিত দেশী ফৌজে নিয়োগের জন্য প্রধানত বেছে নেওয়া হয়েছে বিহারের দোনাদ দের, মহারাষ্ট্রের মহার দের ও অন্ধ তামিলনাড়ুর আড়িয়া দেব।

অবশ্য মাহার সম্প্রদায় ঐতিহ্যগত ভাবেই ছিল 'লেঠেলের জাত'। পূর্বেকার মারাঠা রাজাদের সৈন্য বিভাগেও এই সম্প্রদায়ের জন্য ছিল আলাদা রেজিমেণ্ট। ব্রিটিশ ভারতেও বেশ কিছু দিন এদের নিয়ে গঠিত আলাদা রেজিমেণ্ট ছিল। তবে এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইংরেজরা যে কূটবুদ্ধি নিয়ে ভারত জয় করেছিল তেমনি অজস্র নিষ্ঠুরতা আর নানা কুচক্রান্তের মধ্য দিয়ে এদেশকে দুশো বছরের ও বেশী দিন ধরে পদানত করে রেখেছিল। এবং এজন্য সেনা বাহিনীতে সামান্য কিছু দলিত মানুষদের নিয়োগ করলেও, তাদের পরে স্বদেশীয় উচ্চবর্ণের যে নিষ্ঠুর অবিচার—তার প্রতি তারাছিল নির্বিকার। 'এসব ধর্মীয় ব্যাপার'—বলে সব এড়িয়ে যেতো এবং কিছুই কোরতো না। বরঞ্চ প্রশাসন চালাতে, যে সব তথ্য-সামর্থ ও দেশীয় জ্ঞানের প্রয়োজন তাদের ছিলো তা এই সব উচ্চবর্ণের তথা শিক্ষিত মানুষদের কাছ থেকেই তারা নিতো, ফলে উচ্চজাতের হিন্দুদের সঙ্গে বিশেষ করে সামাজিক বিষয়ে কোন বিরোধেই তারা যেতে চাইতো না।

এমনকি সেনা বাহিনীতে যে অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষদের ঢুকবার যে সুযোগ ছিলো কিছুদিন পর ১৮৯২ থেকে তাও এই অভিজাত শ্রেণীকে তুষ্ট রাখতে বন্ধকরে দিলো। এর পেছনে অবশ্য অন্য কারণও ছিল। সে আলোচনা থাক।

এখানে একথা বলতেই হবে যে ব্রিটিশরা তাদের স্বার্থে হলেও সৈন্য-বাহিনীর প্রতিটি ক্যাম্পেই শিক্ষা দানের জন্য স্কুলের ব্যবস্থা করেছিল। এমন কি সেনা বাহিনীতে যারা যোগদিতেন তাদের এবং তাদের পরিবার বর্গের জন্যও শিক্ষা দানের ব্যবস্থা ছিল। এসবের ফলে নিম্নবর্ণের মানুষের কাছে শিক্ষা বিস্তারের সামান্য সুযোগ বৃদ্ধিপায়।

২·৭ ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ থেকে নিম্ন জাতের এই মানুষের মধ্যে শিক্ষার অভাব-বোধ গভীর ভাবে দানা বাঁধতে থাকে। তারা উপলব্ধি করেন যে শিক্ষার অভাবই অচ্ছুতদের প্রধান দুর্বলতা। এই দুর্বলতা রোধের মহান সংকল্প নিয়ে মহাত্মা জ্যোতিরাও ফুলে ১৮৪৮ সালে ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বপ্রথম অস্পৃশ্যদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বলা বাহুল্য এজন্যে তাঁকে, তাঁর স্ত্রীকে ও তার প্রায় সমস্ত আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবকে সমাজের বিভিন্ন দিক থেকে অপমান লাঞ্ছনা বিদ্রূপ ও অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে।—এই সব নানা উদ্যোগের ফলে নিম্নবর্ণের মানুষের মধ্যে সামান্য পরিমানে হলেও শিক্ষার সুযোগ

এলো। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার যে জীবিকার ক্ষেত্রে অপৃশ্যরা শিল্পায়নের পূর্বেও ছিল শ্রম-দাস বা শ্রমজীবী। কয়েকটি জাত ভিত্তিক পেশা (যেমন ধোপা, নাপিত, দর্জি, কামার, ছুতোর) ছাড়া অন্যান্য অস্পৃশ্যরা গ্রাম-সমাজেও অন্তর্ভুক্ত ছিল না। তাদের বসবাসের জন্য গ্রামের বাইরে সামান্য জমি দেওয়া হোত যাতে তাদের থেকে সহজে শ্রম পাওয়া যায়। এরা কৃষককেও শ্রম দিতো। কিন্তু নিজেরা চাষ করবার জন্য জমি পেতো না। অর্থাৎ অস্পৃশ্যরা আগে যেমন ভূমিহীন ছিলো; এখনো তেমনি আছে। ফলে তারা অন্যান্যদের তুলনায়—জীবিকার জন্য চাকুরীর উপর বেশী নির্ভর শীল।

২·৮ অস্পৃশ্যরা ১৯৩১ সাল পর্যন্ত পুলিশ বাহিনীর কাজ পেতো না। ১৮৯২ থেকে ১৯৩২ পর্যন্ত সেনা বাহিনীতে পর্যন্ত নাম লেখাতে পারতো না। এবং ১৯১৭ সাল পর্যন্ত ঝাড়ুদার, মুচি, সহিস এবং মালি ছাড়া কোন নিচু স্তরের সরকারী কাজও এদের দেওয়া হোত না। (যদিও একাজগুলিও গ্রাম্য হিন্দু অস্পৃশ্যদের বংশগত জীবিকা ছিল)।

স্বাধীনতার পূর্বে যেমন পরেও তেমনি দেশে শিল্পায়নের ফলে যে কাজের সুযোগ এলো তাতেও অস্পৃশ্যরা অচ্ছুতই রইল। এমনকি ছিটে ফোটা যা সুযোগ জুটলো—তাতেও নানা বিভাজন। যেমন সুতাকলের তাঁত বিভাগে অস্পৃশ্যদের নিয়োগ করা হোত না। এমনকি "১৯৫০ সাল পর্যন্ত গান্ধীর অনুগামীদের কারখানায়ও এই নিয়মই চালু ছিল।"

২·৯· এই পটভূমিতে ডঃ বি. আর. আম্বেদকর জন্মগ্রহণ করেন এবং অজস্র সহস্র প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে ভারতের ইতিহাসে তার সংগ্রামের স্বাক্ষররাখেন।

শৈশব ও শিক্ষাজীবন—৩·১ ☐ ১৮৯১ সালের ১৪ই এপ্রিল ড. ভীমরাও রামজী আম্বেদকরের জন্ম হয়। পিতামাতার শেষ সন্তান তিনি। পিতা সুবেদার রামজী শকপাল। মাতা ভীমা বাই। জন্মস্থান—পিতার তখনকার কর্মস্থান—মধ্যভারতের তথা মধ্যপ্রদেশের 'মৌ' নামক এক সেনাবাহিনীর হেড কোয়ার্টারের তাঁবু।

৩·২ মা পিতৃহীনা হলেও মায়ের ছয় কাকাই ছিলেন সেনাবাহিনীর সুবেদার মেজর। তারা ছিলেন মানা জেলার মুরথবাদের বাসিন্দা।

পিতামহ মালোজী শকপাল ছিলেন কোঙ্কনের লোক। তিনিও সেনা বিভাগে কাজ করতেন। তাদের আদিনিবাস বোম্বাই প্রদেশের রত্নগিরি জেলার আম্বাদাবাদ গ্রামে। মালোজী শকপালের একমাত্র পুত্র রামজী শকপাল। তিনি মারাঠী ও ইংরেজী ভাষায় ছিলেন সুদক্ষ। সুস্বাস্থ্য, প্রখর স্মৃতিশক্তি ও মেধার অধিকারী রামজী ছিলেন কবীর পন্থী এক উদার চেতা ও প্রগতিশীল মানুষ। সততার সঙ্গে তার চরিত্রে সংযুক্ত হয়েছিল নিয়মানুবর্তিতা, দৃঢ়তা ও অনমনীয় সংগ্রামশীলতা। তিনি নর্মাল স্কুল থেকে ট্রেনিং প্রাপ্ত শিক্ষক ছিলেন। সেনা-বাহিনীতে তার পদমর্যাদা হয়েছিল সুবেদার মেজর পর্যায়ের। মহাত্মা ফুলের সঙ্গে ছিল তার বন্ধুত্ব। পুত্রের সুশিক্ষার পেছনে কেবল পিতা হিসেবেই নয়—শিক্ষক হিসেবেও তার ভূমিকা ছিলো অনন্য। আর শুধু পুত্রের জন্য নয়—সমাজের কল্যাণমূলক কাজেও ছিলো তাঁর সচেতন উদ্যোগ।

CENTRAL LIBRARY

১৮৯২ সালে মাহারদের যখন সেনাবাহিনীতে গ্রহণ করা নিষিদ্ধ হয়ে গেল—তখন তার প্রতিবাদে সরকারের কাছে প্রেরিত গণ দরখাস্তের তিনি ছিলেন উদ্যোক্তা। এমনকি সরকার যখন কিছু বাসস্থান তৈরি করে বিলি করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে—তখন তিনি ও তাঁর বন্ধুরা দাবি করেন—ঐসব আবাসনের একটি অংশ অন্তত অস্পৃশ্যদের জন্য রাখা হোক।

শিক্ষারম্ভ ৪·১ : শিশু আম্বেদকর তথা ভীমের যখন মাত্র দুই বছর বয়স তখন পিতা তার মিলিটারী বিভাগের (প্রধান শিক্ষকের) কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং দাপোলিতে চলে যান। এখানের স্কুলে ভীম যাতায়াত শুরু করলেও স্কুলে আনুষ্ঠানিকভাবে ভর্তি হন সাতারায় গিয়ে। রামজী পি. ডব্লিউ. ডি দপ্তরে একটি চাকুরী জোগাড় করেন সেই সূত্রেই পুরো পরিবার সহ সাতারায় স্থানান্তরিত হন। অবশ্য এই বছরই ভীম মাতৃহারা হন। তার মাত্র ৬ বছর বয়সে মাতা ভীমা বাই মারা যান। এবং জীবিত পাঁচ সন্তানের দেখাশোনার জন্য পিসিমা মীরাকে বাবা নিয়ে আসেন। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই পিতা দ্বিতীয় বার বিয়ে করেন। ভীম দ্বিতীয় মাতা জীজাবাঈ কে কখনোই মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারেন নি। ফলে দারিদ্র্যের সঙ্গে মাতৃস্নেহের অভাবও এলো ভীমের জীবনে। যা অনেকখানি পূরণ করেন পিসিমা।

৪·২ সাতারায় স্কুল জীবন স্বল্প-দীর্ঘ। কিন্তু তার লাঞ্ছনার অভিজ্ঞতার ইতিহাস সু-দীর্ঘ। এখানেই ভীমরাও প্রথম প্রত্যক্ষ করেন সমাজের অমানবিক হিংস্র, নিষ্ঠুর ও পাশবিক রূপ। স্কুলে তাকে ভর্তি করা হয় সত্য কিন্তু তাকে অন্য ছাত্রদের সঙ্গে একসঙ্গে বেঞ্চিতে বসতে দেওয়া হোত না। বসতে হত দূরে (বাড়ি থেকে বয়ে নিয়ে যাওয়া) চটের আসনে। তার ক্লাশে কথা বলার অধিকার ছিলো না—যাতে মুখের বাষ্পে শ্রেণীকক্ষ অপবিত্র হয়। তার খাতা শিক্ষকরা হাত দিয়ে স্পর্শ করতেন না—দূর থেকে দেখে দিতেন। এমনকি তাকে সংস্কৃত বা মাতৃভাষা পাড়ার সুযোগ দেওয়া হয়নি। এছাড়া স্কুলে যতক্ষণ ক্লাশ চলতো জল পানের কোন ব্যবস্থা পর্যন্ত ছিলো না এ অস্পৃশ্য সন্তানের জন্য। মুখে জল চাওয়াও যাবে না—উপরের দিকে মুখ হা করে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে—কোন ছাত্র বা কারো যদি হৃদয়ে দয়ায় উদ্রেক হয় এবং সে উপর থেকে জল ঢেলে দিলে তবে তার তৃষ্ণা নিবারণ হবে। এমনি সব নৃশংস বিধানের শরাঘাতে আহত রক্তাক্ত হৃদপিণ্ড নিয়ে ভীমের স্কুলজীবন কেটেছে। এর ফলে এক অন্য ভারতের নাগরিক তথা নির্যাতিত এক ভারতাত্মা এই শিশুর মধ্যে জেগে উঠেছে ; —যে প্রতিজ্ঞায় দৃঢ়, সাধনায় অটল, বিজয়ে বিশ্বাসী। তবে কেবল মরুভূমির উষর বালুরাশিই নয়—তার অভিজ্ঞতার এই মরুপথে মিলেছে দু একটি মরুদ্যানেরও দেখা।

৪·৩ **জনৈক সহৃদয় শিক্ষক** □ আম্বাদাবাদের রামজী শকপালের পুত্র ভীমরাও রামজী শকপাল যখন সাতারার স্কুলে ভর্তি হল—তখন দক্ষিণ ভারতের নামকরণের রীতি অনুসারে তার নাম হ'ল ভীমরাও রামজী আম্বাবাদেকর। কি কারণে জানিনা এই অস্পৃশ্য ছেলেটিকে মনে ধরলো এক ব্রাহ্মণ শিক্ষকের।

CENTRAL LIBRARY

তিনি এত অত্যাচার ও লাঞ্ছনার খর রৌদ্রে একখণ্ড জলদ মেঘের মতো ভীমের কাছে মাঝে মাঝেই নিয়ে আসেন জননী-হারা। নিজের টিফিনের অংশ তাকে গোপনে খাওয়ান। তাকে ভালোবাসেন—নিজের সন্তানের মতো। আর সেজন্যই নিজেই ভর্তির খাতায় নামকরণের 'আম্বাবাদেকর' উপাধি পরিবর্তন করে আম্বেদকর করে দেন। 'আম্বেদকর' উপাধি ছিলো—ঐ ব্রাহ্মণ শিক্ষকের নিজের উপাধি। সারা জীবন যিনি ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন—তিনিই আবার সারা জীবন বহন করে ফিরেছেন—তারই প্রিয়তম এক ব্রাহ্মণ শিক্ষকের উপাধি। যা তাকে জগৎবিখ্যাত করেছে—যে নামে বিশ্ব চিনেছে ভীমরাও রামজী শকপালকে।

৪·৪ **একটি অভিজ্ঞতা** □ এই সাতারা স্কুলে ভীম তার প্রাইমারী স্কুল জীবন শেষ করে হাইস্কুল শিক্ষা শুরু করেন। সঙ্গে ছিলেন অগ্রজ বলরাম রাও। ঐ সময়েই আম্বেদকর অর্জন করেন জীবনের সেই গভীর বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা।

বাবা তখন খাজাঞ্চীর কাজ করেন গোরে-গাঁও-এ। তার সঙ্গে দেখা করার জন্য দুই ভাই যাত্রা করেছেন। প্রথমে পাদলি স্টেশান থেকে মন্তুর পর্যন্ত গেলেন। তার পরও অনেক পথ যেতে হবে। বাবাকে আগে চিঠি দিয়েছিলেন যাতে স্টেশানে আসেন। কিন্তু চিঠি না পাওয়ায় বাবা আসেননি। ফলে দুই স্কুল বালক ভীষণ বিপদে পড়লেন। কোনমতে একটি গরুর গাড়ি ভাড়া করা হোল। গ্রীষ্মের দুপুরে পথে নামলো গাড়ি। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই কথায় কথায় গাড়োয়ান যখন জানতে পারলো যে গাড়ীর আরোহীরা 'অস্পৃশ্য' তখনই তাদের ঘাড় ধরে নামিয়ে দিলো—আর জিনিসপত্র সব ছুড়ে ফেললো। অবশেষে দ্বিগুন টাকায় ফয়সালা হোল, গাড়ী নিজেরাই চালিয়ে নেবে। এবং গাড়োয়ান পাশে হেঁটে যাবে। এই দীর্ঘ পথে দুই অস্পৃশ্য বালকের জন্য জুটলো না একফোটা তৃষ্ণার জল—সামান্য আহার।

বোম্বের জীবন ৫·১ বোম্বে শহরে বাবার নতুন কাজ জুটলে সপরিবারে তিনি সেখানে যান। ভীমেরও স্কুল পরিবর্তন হয়। কিন্তু দরিদ্র ও নিম্ন বিত্ত পিতার ভাগ্যে বোম্বে শহরে ঘর জোগাড় করাই ভাগ্যের ব্যাপার—তাই তাদের আশ্রয় নিতে হয় পারেলেন এক চাওয়ালে বা শ্রমিক বস্তিতে। আলো হাওয়ার প্রবেশের সুযোগহীন এক-কামরার বাসা। অনেকগুলো পরিবারের জন্য দুটোমাত্র জলের ট্যাপ আর দুটি মাত্র পায়খানা।

৫·২ ভীমদের ঘরটিতে পরিবারের সমস্ত লোকজন, আসবাবপত্র, রান্নার ব্যবস্থা, শোয়ার ব্যবস্থা, রান্নার জ্বালানি—সব জড়িয়ে ভয়ংকর এক অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতি। কেবল বাস করাই যেখানে কষ্টকর—সেখানে ভীমকে পড়াশুনা চালাতে হোত প্রচণ্ড কষ্টে। ভীমকে বাবা আগে ঘুম পাড়িয়ে দিতেন এবং শেষরাতে তাকে পড়াশুনা করার জন্য ডেকে দিয়ে তার জায়গায় নিজে গিয়ে শুয়ে পড়তেন। তখন কে জানতো যে—চিমনি ছাড়া কেরোসিন প্রদীপের সেই আলোতে ঘিঞ্জি ঘরে বড় হচ্ছেন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ডঃ আম্বেদকর!

৫·৩ **বোম্বের ছাত্রজীবন** □ বোম্বে আসার পর দাদা আনন্দ রাও ও ভীমকে

CENTRAL LIBRARY

প্রথমে মারাঠা হাইস্কুলে ভর্তি করা হয়। কিন্তু একসঙ্গে দুই ছেলেকে পড়ানোর সঙ্গতি ছিল না বাবার, তাই রামজী বড় ছেলের পড়া বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন। আনন্দ রাও কারখানায় ছোট খাটো একটি চাকরী পান। সব মিলিয়ে পরিবারের সমবেত চেষ্টায়, ত্যাগে আন্তরিকতায় আম্বেদকরের পড়াশুনা চলতে থাকে। তাকে ভর্তি করা হয় বোম্বের বিখ্যাত এলফিন্‌ স্টোন হাইস্কুলে। এটি সরকারী স্কুল বলে একটু কম হলেও অর্থাৎ সাতারার মতো না হলেও, এখানেও তাকে অস্পৃশ্য বলে কম লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা সহ্য করতে হয়নি। উপরন্তু শ্রমিক এলাকায় বসবাস বলে তাকে ঠাট্টা বিদ্রূপও সহ্য করতে হয়েছে। তবে পিতার মতোই খেলাধুলায় ভালো ছিলেন বলে স্কুলে কিছুটা প্রভাব বিস্তার করতে পারেন। এখানে তাকে সংস্কৃত পড়তে দেওয়া হয়নি—তাই তাকে পার্সি ভাষা নিয়ে পড়তে হয়। (অবশ্য পরে কিছুটা নিজের চেষ্টায় কিছুটা অন্যদের সাহায্যে সংস্কৃত ভাষা তিনি শিখেছিলেন কারণ তিনি মনে করতেন সংস্কৃত ভাষায় রয়েছে মহাকাব্যের অজস্র স্বর্ণ-স্বল্পদ, সুসংহত ব্যাকরন, রাষ্ট্রনীতি, দর্শন, নাটক, সমালোচনা আর যুক্তি বিজ্ঞানের বিপুল সম্ভার।)

৫'৪ যাইহোক ১৯০৭ সালে ঐ এল্‌ফিনস্টোন হাইস্কুল থেকে আম্বেদকর ম্যাট্রিক পাশ করেন। পরীক্ষায় পার্শি ভাষায় সবচেয়ে বেশী নম্বর পান। অস্পৃশ্য সমাজের এই শিক্ষা লাভকে অন্যদের কাছে প্রেরণা সৃষ্টির উৎস হিসেবে চিহ্নিত করে এস. কে বোলের নেতৃত্বে আম্বেদকরকে স্বর্মধনা দেওয়া হয়।

৫'৬ অন্যদিকে আর্থিক অনটন চোখের অসুখ ও অন্য অসুস্থতার জন্য এক বছর পড়াশুনাই বন্ধ হয়ে যায়। এসময়ে এগিয়ে আসেন কয়েকজন সুহৃদ। বিশেষ করে এ. কে. কেলুসকারের প্রচেষ্টায় আম্বেদকর বরোদার মহারাজা সায়াজী রাও গায় কোয়াডের কাছে যান এবং আম্বেদকরের জ্ঞানের স্পৃহায় মহারাজা খুবই তৃপ্ত হন; মাসে পঁচিশ টাকা করে বৃত্তির ব্যবস্থা হয়। এইভাবে আম্বেদকর এলফিন স্টোন কলেজে ভর্তি হন। সামান্য আর্থিক সাচ্ছন্দ্যের ফলে তারা প্যারেলের একটি দুই কামরা (মুখোমুখি) বিশিষ্ট ফ্লাট ভাড়া করেন। এর ফলে আম্বেদকরের পড়াশুনার সুযোগ অনেকাংশে বেড়ে যায়।

৫'৫ এর আগেই সমাজের প্রচলিত রীতির চাপে ও বৃদ্ধপিতার ইচ্ছায় ভীম দাপোলির কাছেই ওয়ানঙ্গের ভিক্ষু ধুত্রের কন্যাকে বিয়ে করেন। আম্বেদকরের বয়স তখন মাত্র ১৬ এবং রামীর বয়স মাত্র ৯। বিয়ের অনুষ্ঠান হয় বোম্বের বাই-কুল্লা বাজারের মাছপট্টির উঁচু চাতালে। বিয়ের পর রামীর নাম রাখা হয় রমাবাই। তবে বিয়ের বাধা আম্বেদকরকে পড়াশুনার গতিপথ থেকে দূরে সরিয়ে নিতে পারেনি। তার জ্ঞান স্পৃহা এত তীব্র ছিলো যে তার জন্য বই সংগ্রহ একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো। তাও রামজী যখন যতটা সম্ভব বই কিনে দিতেন। কারণ লাইব্রেরীতে ঢুকবার অনুমতি ছিলো না অস্পশা আম্বেদকরের।

৫'৬ কিন্তু প্রকৃতির নিয়মেই লবনাক্ত সমুদ্রেও যেমন থাকে শ্যামলদ্বীপ তেমনি এলফিন্‌ স্টোন বিদ্যালয়েও আম্বেদকর পেলেন অধ্যক্ষের সহযোগিতা আর

CENTRAL LIBRARY

অধ্যাপক মুলারের অকৃপণ সহায়তা। তিনি ভীমকে খুলে দিলেন তার ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারের অমূল্য সংগ্রহ। যার ফলে আম্বেদকর নিজেকে গড়ে তুললেন যথার্থ শিক্ষিত হিসেবে—ব্যাপক পরিধি আর গভীর জ্ঞান স্পৃহায়।

এই কলেজ থেকে ১৯১২ সালে বি. এ. পাশ করেন তিনি। এবং পিতার দারিদ্র্যে অংশ নেবার আশায় সঙ্গে সঙ্গে কাজ নিলেন বরোদার রাজার অধীনে। লেফটন্যাণ্ট-এর চাকুরী। কিন্তু পিতার অসুস্থার সংবাদ পেয়ে ছুটে এলেন বোম্বে। মৃত্যু শয্যার পাশে এসে দাঁড়ালেন। ১৯১৩ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী পিতার মৃত্যু হল। অবসান হল একটি যুগের।

উচ্চশিক্ষা ☐ ৬.১ বরোদার মহারাজা ঘোষণা করলেন কিছু মেধাবী ছাত্রকে উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে পাঠাবেন (তাদের বৃত্তি দানের মাধ্যমে)। একথা শুনে আম্বেদকর মহারাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন আর আগে থেকেই আম্বেদকরকে জানতেন—তাই সহজেই তার আবেদন মঞ্জুর হয়ে গেল। শর্ত হল পড়াশেষে ১০ বছর চাকুরী করতে হবে রাজার এস্টেটে। ১৯১৩ সালের ৪ঠা জুন চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হোল। জুলাই মাসে আমেরিকা পৌঁছুলেন আম্বেদকর। যোগ দিলেন কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে।

৬.২ ☐ এই প্রসঙ্গে কোলাপুর ও বরোদার রাজাদের প্রসঙ্গেও একটু আলোচনা করা যাক। 'কোলাপুর শাসকদের উত্তর পুরুষ শিবাজীর বংশধর। শিবাজীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এদের রাজপুত মর্যাদা লুপ্ত হয় এবং মারাঠা-কৃষক-জাতি সত্তায় ফিরে যায়। বরোদা, ইন্দোর এবং গোয়ালিয়রের রাজ পরিবার গুলির জাতি পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন ছিল।

এই রাজ পরিবার গুলি অস্পৃশ্যতা দূর করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে ছিলেন। জাত পরিচয়ের এই অস্পষ্টতাই তাঁদেরকে অস্পৃশ্যদের প্রতি আন্তরিক করে তুলেছিলো। এখানে উল্লেখ্য ১৮৮৩ সালে বরোদায় অস্পৃশ্যদের জন্য কিছু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন মহারাজা সায়াজীরাও গাইকোয়াড। আর আম্বেদকর তার জীবনের প্রস্তুতি পর্বে ও সংগ্রামের পথে নানা সময়েই এদের সাহায্য সহ যোগিতা পেয়েছিলেন।

৬.৩. কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে আম্বেদকরের পাঠ্য বিষয় গুলির মধ্যে ছিল 'রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, দর্শন ও অর্থনীতি। পাশ্চাত্যের এই জ্ঞানকেন্দ্রে এসে আম্বেদকর যেন নবজন্ম এক পৃথিবীকে দর্শন করলেন। এখানে ভারতীয় সমাজের অভিশাপ—তার জন্মসূত্রে প্রাপ্ত অস্পৃশ্যতার কালিমা তার পেছনে ভূতের মতো ছুটে বেড়ায় না। এ যেন মুক্ত আকাশের তলায় প্রকৃতির এক আনন্দ-ময় ভুবন। মনুষ্যত্বের অবমাননা হীন এক দেশ। আম্বেদকর তার মেধা ও জ্ঞান স্পৃহা নিয়ে এই প্রথম মানুষ হিসেবে নন্দিত হলেন—যা ভারতের কোন অস্পৃশ্য সন্তানের স্বপ্নেরও অতীত অভিজ্ঞতা।

৬.৪ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে আম্বেদকর লাভ করেন প্রোফেসর এডুইন সেলিগম্যান-এর মতো মহান পণ্ডিতের শিষ্যত্ব। কেবল এক ক্লাশ থেকে অন্য ক্লাশে

তাঁকে অনুসরণই নয় গভীর জ্ঞান তৃষ্ণা নিয়ে তাঁকে অজস্র জিজ্ঞাসা। আর শুধু সেলিগম্যানই নয় নৃতত্ত্বের অধ্যাপক ড. গোল্ডেন ভাইশারের আহূত সেমিনারেও আম্বেদকর আদরণীয় ছিলেন। সেখানে তিনি পেশ করেন ভারতীয় জাত-বিভাগ নিয়ে তার বিখ্যাত গবেষণা সন্ধর্ভ। আসলে উচ্চশিক্ষার সুযোগ লাভ ক'রে আম্বেদকর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করতে চান নি—কারণ তার অস্পৃশ্যতা-লাঞ্ছিত জীবনের নির্মম কষাঘাত আর দারিদ্র্যপীড়িত জীবনের কঠিন অভিজ্ঞতা তাঁকে দিয়েছিলো অর্জুনের 'কেবল পক্ষীচক্ষু'-একাগ্রতা। তাই, প্রিয় শিক্ষক সেলিগম্যানের বন্ধু লালা লাজপতরায়ের প্রভাব ওআকর্ষণ তিনি বিনয়ের সঙ্গে সরিয়ে রেখেছিলেন।

৬·৫ কিন্তু তাঁর ডিগ্রী অর্জনের শিকার সাথে সাথে তিনি আরম্ভ করছিলেন ভারতের জাত-পাত বৈষম্যের মূলোৎপাটনের রাজনৈতিক শিক্ষা। অধ্যয়ন করেছিলেন—আয়ত্ত করছিলেন লিঙ্কন, ওয়াশিংটন, জেফার্সনের জীবনী। শিক্ষা নিচ্ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবক, শিক্ষাবিদ ও নিগ্রোস্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা বুকার টি. ওয়াশিংটনের জীবন, চিন্তা-ধারা ও সংগঠন-পদ্ধতি থেকে। তাঁর কর্মধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে আম্বেদকর অনুন্নত মানুষের সার্বিক শিক্ষার নীতি জীবনের অন্যতম আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেন। তবে এসব ছিলো তার চেতনার গভীরতম স্তরে—তিনি এই সময়ে একাডেমিক শিক্ষা তথা ডিগ্রী অর্জনের জন্যই মূলতঃ তাঁর সমস্ত সময় ব্যয় করেন। এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটান বিভিন্ন লাইব্রেরীতে আর রাতের পর রাত জেগে কাজ করেন নিজের ঘরে। এবং এভাবেই তিনি ১৯১৫ সালে অর্জন করেন অর্থনীতিতে এম-এস, সি—ডিগ্রী। এবং ১৯১৬ সালে 'ভারতের জাতীয় লভ্যাংশ' বিষয়ক থিথিসের জন্য পি-এইচ, ডি উপাধি।

৬·৬ আমেরিকার কাজ করার গতি ও গভীরতা এত বেশী ছিলো যে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই কাজ শেষ হয়ে যায়। নতুন পরিকল্পনা নিয়ে আরো কিছুদিন বৃত্তির সময় বৃদ্ধির আবেদন জানিয়ে—আম্বেদকর নতুনতর শিক্ষার জন্য লণ্ডন যাত্রা করেন—১৯১৬ সালের জুনমাসে।কারণ লণ্ডন তখন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানতীর্থ।

সেখানে গিয়েই অক্টোবরে ভর্তি হন বিখ্যাত লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স এণ্ড পলিটিক্যাল সায়েন্স'-এ এবং একই সঙ্গে ব্যারিণ্টারীর জন্য ভর্তি হন গ্রেস-ইন' (Gray's Inn)-এ। অর্থনীতি বিষয়ে তাঁর ব্যাপক পড়াশুনা থাকার জন্য অর্থনীতিতেই, ডি, এস-সি, করার অনুমতি পান তিনি। কিছুদিন কাজও করেন। কিন্তু মহারাজার কাছে অতিরিক্ত সময়ের যে আবেদন আম্বেদকর করেছিলেন তা প্রত্যাখ্যাত হয় এবং গবেষণার কাজ অসমাপ্ত রেখে দেশে ফিরতে হয় তাঁকে।

৬·৭ আসবার সময় তার অনাহারে-অর্জিত-অর্থে-সংগৃহীত অমূল্য গ্রন্থরাজী (সংখ্যায় প্রায় দুই হাজার) জাহাজবন্দী করে পাঠান স্বদেশে। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কবলে ভূমধ্য সাগরে ডুবলো 'টমাস কুল এণ্ড সন্স'এর জাহাজ—জার্মানী বোমায়। আর ধ্বংস হল আম্বেদকরের মহান সম্পদ সম্ভার।

৬·৮ কিন্তু কাজ শেষ করার জন্যে তার আকাঙ্ক্ষা এত তীব্র ছিল যে দেশে ফিরে গিয়ে কিছু রোজগার করে অর্থ সংগ্রহ করে আবার লণ্ডনে এসে উদ্দেশ্য সিদ্ধ

করার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং সেইমত অধ্যাপক কাম্মানকে ধরে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিশেষ অনুমতি যোগাড় করলেন যাতে ১৯১৭ সালের অক্টোবর মাস থেকে চার বছরের মধ্যে তাঁর কাজ আবার শুরু করতে পারেন।

৬·৭ অবশ্য এই ইনসিওর করা বই এর জন্য বোম্বে এসে যে সামান্য টাকা আম্বেদকর পেলেন তাই সম্বল করে ভারতের মাটিতে তাঁর নতুন জীবনের সূত্রপাত। বাড়িতে সামান্য অর্থ দিয়ে—বাকী অংশ নিয়ে যাত্রা করলেন বরোদার দিকে মহারাজার শর্ত পূরণের জন্য চাকরীর জন্য। সেপ্টেম্বর মাস ১৯১৭ সাল।

৬·৯ স্মরণ যোগ্য যে এর অল্পদিনের মধ্যেই সংগঠিত হয় রুশবিপ্লব! পৃথিবীর নতুন অভিজ্ঞতার প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ সোভিয়েত ইউনিয়ন গড়ে ওঠে। কিন্তু অর্থনীতি বিশেষজ্ঞ ও সমাজতত্ত্ববিদ আম্বেদকরের দৃষ্টি মূলতঃ নিবদ্ধ ছিল ভারতেরই দিকে—বিশেষ করে ভারতের দলিত মানুষের প্রতি।

এছাড়া আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসও যে সাদা কালোর দ্বন্দ্বে ও দাস তন্ত্রের নিষ্ঠুরতায় কালিমা লিপ্ত—সে রকম ঘটনা হয়তো তার প্রবাস জীবনে প্রত্যক্ষ করতে হয়নি ; তাই তার চোখে ওদেশের এক স্বর্নোজ্জ্বল গণতান্ত্রিক রূপই শুধু প্রতিভাত হয়েছিল।

১০·১ **বরোদায় চাকুরী** ☐ বৃত্তির শর্তানুসারে আম্বেদকর বরোদার রাজার সেনা বাহিনীর সামরিক সচিব হিসেবে নিযুক্ত হন। মহারাজার উদ্দেশ্য ছিলো পরে তাকে অর্থমন্ত্রী করবেন। কিন্তু এখানের চাকুরীর যে অভিজ্ঞতা তাও ছিল খুবই তিক্ত এবং কর্কশ। রাজার নির্দেশ সত্ত্বেও স্টেশানে কোন রাজ কর্মচারী আসেননি আম্বেদকরকে স্বাগত জানাতে। অন্য দিকে বরোদায় নেমে তার দাদা বলরামরাও এবং আম্বেদকর পড়লেন বিপদে—থাকবেন কোথায়! অন্য ধর্মীয়দের জন্য হোটেলে জায়গা থাকলেও হিন্দু-অস্পৃশ্যের জন্য কোন স্থান নেই। হোটেল, পান্থশালা, ধর্মশালা, কোথাও তাদের জন্য জায়গা নেই।

১০·২ অবশেষে একটি পার্শী হোটেলে নিজের নাম পরিবর্তন করে আম্বেদকর জায়গা নিলেন। কিন্তু তাতেও শেষ রক্ষা হল না। অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়ে বিতাড়িত হতে হল। মাত্র কদিন অফিসে কাজ করেছিলেন তারও অভিজ্ঞতা বড়ই বেদনা দায়ক ও করুণ। এই সময় অফিসের কর্মচারীরা পর্যন্ত আম্বেদকরকে অপমান করতো—ফাইল ছুঁড়ে দিত টেবিলে, খাবার জল দিতো না।—সব মিলিয়ে চাকুরী করাই কঠিন হয়ে ওঠে। তবে বৃত্তি প্রদান কারীর কাছে কথার খেলাপ না হয়, সেজন্য তিনি বন্ধু কেলুসকার কে পর্যন্ত সব জানান। কিন্তু কোন সুরাহা হল না। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে তিনি বোম্বাই ফিরে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মাধ্যমে মহারাজাকে সব জানিয়ে চিঠি লেখেন কিন্তু এবারও মহারাজার কোন উত্তর না আসায় তার চাকুরীতে আর ফিরে যাওয়া সম্ভব হয়নি।

১০·৩ প্রসঙ্গত উল্লেখ্য আম্বেদকর ১৯১৭ সালের ২৪শে আগষ্ট ভারতে পৌঁছুলেন। সে সময় ভারতে স্বায়ত্ব শাসনের দাবি জোরদার হওয়ায় ভারত সচিব মণ্টেগু ঘোষণা করেছিলেন যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে ভারতকে ধাপে ধাপে স্বায়ত্ব

শাসন দেওয়া হবে, সেই মতো তিনি ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে নিজে ভারতে এসে দেশবাসীর বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধিদের সাথে তাদের দাবি দাওয়া নিয়ে আলোচনা করলেন। এই প্রথম অচ্ছুতদের বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিরা সরাসরি সরকারের কাছে তাদের সমস্যা নিয়ে হাজির হতে পারলেন। কিন্তু আম্বেদকরের মতের সাথে না মেশায় তিনি ওতে তেমন উৎসাহ দেখালেন না। কারণ মূলতঃ তারা ব্রাহ্মণও উচ্চবর্ণের অত্যাচার থেকে তাদের বাঁচবার জন্য ক্ষমতা হস্তান্তরের বিরোধিতা করেছিলেন।

জীবিকার সন্ধানে ১১·১ বরোদার চাকুরী জীবনের বিষময় অভিজ্ঞতা নিয়ে বোম্বে ফিরে আম্বেদকর চাকরীর সন্ধানে ঘুরতে থাকেন। বিপুল পড়াশুনো, বিদেশী ডিগ্রী থাকা সত্ত্বেও তার এই অনিশ্চয়তা, হিন্দুসমাজের বঞ্চনার মূল যে কত গভীর পর্যন্ত প্রোথিত তারই প্রমাণ। অনেক চেষ্টার পর তিনি দুটি টিউশানী পান। শুরু করেন স্টক শেয়ার কারবারের পরামর্শ দাতার কাজ। একটু পসার জমলেই—তার ব্যবসা গুটিয়ে নিতে হয় কারণ ততদিনে অনেকেই জেনে গেছেন তার 'অস্পৃশ্য' পরিচয়। এই সময়ে তিনি এক ব্যবসায়ীর হিসাব রক্ষকের কাজ পর্যন্ত করেন। অবশেষে বোম্বাইয়ের প্রাক্তন গভর্নর লর্ড শীডেনহামের সুপারিশে শীডেনহাম কলেজে অধ্যাপকের কাজ পান ১৯১৮ সালের নভেম্বরে।

১১·২ প্রথমদিকে বর্ণ হিন্দু ছাত্ররা এই অস্পৃশ্য শিক্ষকের ক্লাশ বয়কট পর্যন্ত করে। দিনেদিনে তার পাণ্ডিত্য, সুব্যবহার—তাকে ব্যাপক ছাত্র সমাজের কাছে গ্রহণীয় করে তুলল, এমনকি অন্য কলেজের ছাত্ররাও তার ক্লাশে ভিড় করতে লাগলো। কিন্তু তাহলে কি হবে—অধ্যাপকদের বিশ্রামাগারে একই কলসী থেকে জলপানে তার অধিকার ছিল না।

১১·৩ এই সময়ে মণ্টেগু চেম্বার্স ফোর্ড রিফর্মস-এর ভিত্তিতে নির্বাচন বিষয়ে গঠিত 'সাউথ বরো কমিটির' সামনে তার মতামত উপস্থাপনের জন্য আমন্ত্রণ পান। অবনতশ্রেণীর পক্ষে তিনি এই আমন্ত্রণ পান। তিনি অবনতশ্রেণীর মানুষদের জন্য পৃথক নির্বাচন ও সংখ্যানুপাতিক আসন সংরক্ষণের দাবি করেন। এবং এর পর ১৯১৯ সালেই নির্যাতিত শ্রেণীর জন্য প্রতিনিধি মনোনয়নের অধিকার স্বীকৃত হয়।

১১·৪ অন্যদিকে কোলাপুরের মহারাজের উদ্যোগ—(i) চাকুরীতে অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের লোক নিয়োগ (ii) তাদের ছাত্রদের জন্য ছাত্রাবাস সহ স্কুল প্রতিষ্ঠা এবং (iii) আম্বেদকরের নেতৃত্বে বঞ্চিত জনতার মুখপত্র রূপে 'মুকনায়ক' নামে একটি মারাঠি পাক্ষিক পত্রিকার প্রকাশ (৩১।৫।২০) শুরু হয়। (iv) ২১শে মার্চ কোলাপুরের মানগাঁও-এ আম্বেদকরের সভাপতিত্বে অস্পৃশ্য সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এবং মহারাজার পৃষ্ঠপোষকতা ও উপস্থিতিতে সম্মিলিত ভোজের ব্যবস্থা করা হয়। (v) এরই সূত্র ধরে মার্চ মাসে নাগপুরে অনুষ্ঠিত হয় অপৃশ্যদের মহাসম্মেলন। সভাপতিত্ব করেন মহারাজা নিজে। এই সময় আম্বেদকরের নেতৃত্বে মাহারদের ১৮টি সম্প্রদায় বিভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধ হয়।

CENTRAL LIBRARY

লণ্ডন যাত্রা ১১'৪ সমাজ সেবার কাজে কম বেশী অংশ গ্রহন কবলেও আম্বেদকরের মনে সারাক্ষণ জেগে থাকে অসমাপ্ত শিক্ষা সমাপ্ত করার ধ্রুব-প্রতিজ্ঞা। অবশেষে জ্ঞান স্পৃহারই জয় হল। কোলাপুরের সায়াজী মহারাজের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য, বন্ধু 'নাভাল ভাঠেনার' কাছ থেকে ঋণ সাহায্য ও অধ্যাপনার দ্বারা উপার্জিত সঞ্চিত অর্থ নিয়ে আম্বেদকর রওনা দিলেন লণ্ডনের দিকে, ১৯২০ সালের জুলাই মাসে।

১২'২ অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরার জন্য প্রথমেই যোগ দিলেন লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স্ এ্যাণ্ড পোলিটিক্যাল সায়েন্স'-এ। এবং সঙ্গে সঙ্গে 'গ্রেজ ইন'-এ ব্যারিস্টারির জন্য ভর্তি হলেন। আবার শুরু হল তার যোগীর তপস্যা। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্ঞানভাণ্ডার লণ্ডন মিউজিয়াম, লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীসহ শহরের অন্যান্য গ্রন্থাগার, সংগ্রহশালায় তার একান্ত অধ্যয়ন চলতে থাকে। সামান্য খাবার, সাধারণ পোশাক. তবুও সকাল থেকে রাত পর্যন্ত যেমন নানা লাইব্রেরীতে একটানা পড়াশুনা ; তেমনি দিনের পর দিন সারারাত জেগে একই কাজ।—এইভাবে ব্রিটিশভারতে সাম্রাজ্যবাদীপুঁজির প্রদেশ-ভিত্তিক বণ্টন নামে গবেষণা সন্দর্ভের জন্য M. Sc ডিগ্রী লাভ (জুন ১৯২১)। এবং পরের বছর ১৯২২ সালের অক্টোবরের মধ্যেই অধ্যাপক উইন কান্নানের অধীনে জমা দেন তার পি, এইচ ডি'র থিসিস— 'টাকার সমস্যা'।

১২'৩ এখানে তিনি দেখিয়েছিলেন কিভাবে টাকা ও পাউণ্ডের বিনিময় ক্ষেত্রে ব্রিটিশরা সুক্ষ্মও কুটিল কৌশলে ভারতকে শোষণ করছে। নিবন্ধে সরকারের সমালোচনাও ছিলো। এই সময় তিনি ব্যারিস্টারি পরীক্ষাতেও সসম্মানে উত্তীর্ণ হন।

১২'৪ এর পরই যান জার্মানীতে। বণ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করে পড়াশুনাও শুরু করেন। এমনকি ওখান থেকে সংগ্রহ করেন বহু দুর্লভ ও মূল্যবান গ্রন্থ—যদিও তার আর্থিক অবস্থা ছিল খুবই সঙ্গীন।

১২'৩ বণে আসবার আগে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদে একটি লেখা তিনি পাঠকরেন—যার শিরোনাম ছিলো—**Responsibilities of a Responsible Goverment in India.**"—ভারতে একটি দায়িত্ব পূর্ণ সরকারের দায়িত্ব বিষয়ক এই নিবন্ধের যে অভিব্যক্তি তাতে অনেকেই তাকে বিপ্লবী পার্টির লোকবলে সন্দেহ করতে থাকেন। অন্যদিকে তিনি কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক সেলিগম্যানের প্রিয় ছাত্র। আর সেলিগম্যান ছিলেন ভারতখ্যাত লালা লাজপাত রায়ের ঘনিষ্ট বন্ধু। ফলে তার গবেষণাপত্রে সরকার বিরোধী মন্তব্য ভিন্ন তাৎপর্য নিয়ে প্রতিভাত হ'ল। পরীক্ষকেরা থিসিস্টি পুনরায় লিখবার জন্য বল্লেন। গাইড Prof Edwin Cannan—তাকে সঙ্গে সঙ্গে ডেকে পাঠালেন। কিন্তু অর্থের অভাবে লণ্ডনে থেকে থিসিসটি পুনর্লিখনের সুযোগ পেলেন না। দেশে ফিরে এলেন। এবং কিছুদিনের মধ্যেই পুনর্লিখিত গবেষণাপত্র ডাকযোগে পাঠালেন লণ্ডন। ১৯২৩ এর নভেম্বর মাসে লাভ করলেন সম্মানীয় উপাধি 'ডক্টর অব সায়েন্স।' এমনকি উচ্চপ্রশংসিত হল তার গবেষণা সন্দর্ভ।

১২'৫ ড. আম্বেদকরের আনুষ্ঠানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা পর্ব তথা প্রস্তুতি পর্বের এখানেই সমাপ্ত ; কিন্তু সংগ্রামী জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়গুলির এরপর থেকেই শুরু। যা প্রতিদিন তাকে করেছে প্রাজ্ঞ থেকে প্রাজ্ঞকর।

CENTRAL LIBRARY

বাবাসাহেব আম্বেদকর ঃ জীবনপঞ্জী

১৮৯১ □ ১৪ই এপ্রিল·পিতা সুবেদার রামজী শক্‌পালের কর্মস্থল মধ্য ভারতের (MHOW) মিলিটারী হেড কোয়াটার অফ্‌ ওয়র-এর এক সামরিক ছাউনীতে ড· ভীমরাও রামজী আম্বেদকরের জন্ম। মাতা ভীমাবাঈ! পিতামাতার চতুর্দশ ও শেষ সন্তান তথা জীবিত ৫ম সন্তান।

১৮৯৩ □ পিতার সামরিক স্কুলের প্রধান শিক্ষকের চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ ও মধ্য ভারত থেকে দাপোলি (Dapoli)তে প্রত্যাবর্তন।

১৮৯৬ □ মাতা ভীমাবাই-এর মৃত্যু। (□ স্ত্রী রমাবাই এর জন্ম।) □ দাপোলির এক প্রাথমিক স্কুলে ভীমরাও যাতায়াত শুরু করেন। কিন্তু পিতা পুনরায় সাতারা জেলার গোরেগাঁও-এ P W D বিভাগে যোগদান করায় ও সপরিবারে সাতারায় স্থানান্তরিত হওয়ার ফলে এখানে আবার ভীমকে স্কুলে ভর্তি করা হয়।

১৮৯৮ □ পিতার পুনরায় বিবাহ (দ্বিতীয় মাতা—জীজাবাঈ)।

১৯০০ □ ৭ই নভেম্বর—ভীমরাওকে গর্ভমে'ন্ট মিড্‌ল স্কুলে ভর্তি করা হয়। এই সময়েই এক সহৃদয় ব্রাহ্মণ শিক্ষকের সান্নিধ্যে আসেন যিনি আম্বেদকরকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তিনিই ভীমের আম্বাবাদেকর (Ambavadekar) উপাধি পরিবর্তন করে আম্বেদকর (Ambedkar) করে দেন।

১৯০১ □ সপরিবারে সাতারা থেকে বোম্বে স্থানান্তর। সেখানে প্রথমে মারাঠা হাইস্কুল ও পরে বোম্বাইয়ের এল্‌ফিনস্টোন হাইস্কুলে ভর্তি।

১৯০৬ □ এপ্রিল—পিতার ইচ্ছায় দাপোলির ওয়ানন্দের ভিকু ধুত্রের কন্যা রামী বা রমাবাঈ-এর সঙ্গে বিবাহ।

১৯০৭ □ বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এলফিন্‌স্টোন হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ।

১৯০৮ □ ৩রা জানুয়ারী—বোম্বাইতে এলফিনস্টোন কলেজে ভর্তি।

১৯১০ □ ঐ কলেজ থেকে আই· এ· পাশ ক'রে বরোদার মহারাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং শিক্ষার জন্য মাসিক ২৫ টাকা করে বৃত্তি লাভ।

১৯১২ □ পুত্র—যশোবন্ত রাও-এর জন্ম। অর্থনীতি ও 'রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিষয় সহ বোম্বে ইউনিভার্সিটি থেকে বি· এ· পাশ করেন।

১৯১৩ □ ২৩ শে জানুয়ারী—বরোদায় মাত্র ১১ দিনের জন্য লেফটেন্যা'ন্ট পদে চাকুরী গ্রহণ।

CENTRAL LIBRARY

১৯১৩ □ ২রা ফেব্রুয়ারী—পরষট্টি বছর বয়সে পিতা রামজীশকপালের মৃত্যু।

□ ২০শে জুলাই—বরোদার মহারাজা সয়াজীরাও গায়কোয়াডের প্রদত্ত বৃত্তিনিয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি।

□ শিশুপুত্র রমেশের মৃত্যু।

১৯১৫ □ ২রা জুন—'প্রাচীন ভারতের ব্যবসা বাণিজ্য' বিষয়ে একটি থিসিস্ লিখে কলম্বিয়া বিশ্ব বিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম. এ. ডিগ্রী লাভ।

১৯১৬ □ ৯ই মে—প্রোফেসর গোল্ডেন ভাইশারের নৃতত্ব বিভাগীয় ছাত্রদের সামনে একটি সেমিনারে 'ভারতের জাতিভেদ' বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ।

□ জুন—কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ভারতে জাতীয় লভ্যাংশ একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ' শীর্ষক একটি গবেষণা সন্দর্ভ উপস্থাপন ও পি-এইচ, ডি—ডিগ্রী লাভ।

□ অক্টোবর—নিউইয়র্ক থেকে লণ্ডনে গমন।

১৯১৭ □ ২১শে আগষ্ট--মহারাজা গায়কোয়াড প্রদত্ত বৃত্তি শেষ হয়ে যাওয়ায় অর্থনীতিতে (ডি, এস-সি)-র জন্য থিসিস লেখার কাজ অসমাপ্ত রেখেই আম্বেদকরকে ভারতে ফিরে আসতে হয়।

□ সেপ্টেম্বর—বৃত্তির শর্ত অনুসারে বরোদার মহারাজার সামরিক সচিব পদে চাকুরী তে যোগদান। কিন্তু অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের লোক বলে তাকে যেমন অফিসে নানা লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয় তেমনি বিতাড়িত হতে হয় হোটেলের আবাস থেকেও।

□ নভেম্বর—বরোদার চাকুরী ত্যাগ করে বোম্বে প্রত্যাবর্তন। বিমাতা জীজাবাই ও সহোদর আনন্দরামের মৃত্যু।

১৯১৮ □ নভেম্বর—বোম্বাইয়ে সিডেনহ্যাম কলেজ অব কমার্স-এ অর্থনীতির অধ্যাপক পদে যোগদান এবং ১১-৩-১৯২০ পর্যন্ত চাকুরীতে বহাল।

১৯১৯ □ ২৭শে জানুয়ারী—বৃটিশ ভারতের নির্বাচন ইত্যাদি বিষয়ক সাউথবুরো কমিটির সামনে নির্যাতিতদের জন্য পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থা ও জনসংখ্যার সমানুপাতে আসন সংরক্ষণের দাবি জানিয়ে তথ্যাদি সহ দাবিপত্র পেশ।

□ কোলাপুরের মহারাজা শূদ্রদের জন্য আলাদা স্কুলব্যবস্থা রদ করে একই স্কুলে তাদের পড়বার অধিকার ঘোষণা করেন। এমন কি অফিস, পুকুর, ধর্মশালায় তাদের প্রবেশাধিকার প্রদান করে আদেশ জারি করেন।

১৯২০ □ ৩১শে জানুয়ারী—কোলাপুরের শাহু মহারাজার অর্থানুকুল্যে তিনি 'মুক নায়ক' নামে একটি মারাঠী পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করেন।

□ ৩০শে মে—নাগপুরে অনুষ্ঠিত নির্যাতিত শ্রেণী সমূহের সর্বভারতীয় সম্মেলনে যোগদেন। পুনরায় অধ্যয়নের জন্য লণ্ডন যাত্রা করেন।

□ ৫ই জুলাই—বিলেত যাত্রা। স্কুলঅব ইকনমিক্স এণ্ড পলিটিক্যাল সায়েন্সে ও গ্রেজ ইনসটিটিউশানে যোগ দান।

১৯২১ □ জুন—'বৃটিশ ভারতে পুঁজির প্রদেশভিত্তিক বণ্টন' বিষয়ে থিসিসের জন্য এম., এস.-সি. ডিগ্রী লাভ করেন।

□ ১৫ই জুলাই—ছত্রপতি শাহু কোলাপুরে মাহার বাতান (Mahar Vatan) নামক দাসত্বের প্রথার অবলুপ্তি ঘোষণা করেন।

১৯২২ □ এপ্রিল—ভারত বিদ্যায় উচ্চশিক্ষার জন্য জার্মানির বণ বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন ও মাসাধিককালের মধ্যেই লণ্ডনে প্রত্যাবর্তন।

□ নভেম্বর—মহারাষ্ট্রের পুনেতে প্রথম নির্যাতিত ছাত্রদের জন্য সরকারী ছাত্রাবাস স্থাপন করা হয়।

১৯২৩ □ ৩রা এপ্রিল—ভারতে প্রত্যাবর্তন ও (৫ জুলাই থেকে) বোম্বে হাইকোর্টে ব্যারিণ্টারী ব্যবসা শুরু। (এখানেও অন্য ব্যারিণ্টারেরা তার সঙ্গে এক টেবিলে চা পান করতেন না)।

□ নভেম্বর—টাকার সমস্যা (The Problem of Rupee), বিষয়ক থিসিসের জন্য ডি, এস-সি ডিগ্রীলাভ করেন।

১৯২৪ □ ৯ই মার্চ—'বহিস্কৃত হিতকারিনী সভা' গঠন করা হয়।

□ এপ্রিল—'মুকনায়ক' প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়।

□ ১৪ই জুন—পুত্র রাজরত্নের জন্ম হয়।

□ ২০শে জুলাই—বহিস্কৃত হিতকারিনী সভার একটি সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনের মুখ্য উদ্দেশ্য বা প্রধান ঘোষণাগুলির মধ্যে ছিল :—

ক. নির্যাতিত শ্রেণীর লোকেদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার ও ছাত্রাবাস স্থাপন।

খ. স্ট্যাডি সার্কেল, ক্লাশ, কমিউনিটি সেণ্টার ও পাঠাগার স্থাপনের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক বিকাশ।

গ. শিল্প ও কৃষি বিদ্যালয়ের মাধ্যমে নির্যাতিত মানুষের আর্থিক উন্নতি।

ঘ. নির্যাতিত লোকেদের উপর উৎপীড়নের বিষয়ে প্রচার করার ব্যবস্থা।

ঙ. এই সম্মেলনেই ধ্বনি তোলা হয়—শিক্ষা, আন্দোলন, সংগঠন (Educate-Agitate-Organise) গড়ে তোলার।

□ ১০ই মে—পুনে গভর্নমেণ্ট কলেজের সুপারিনটেনডেণ্ট এন. কে. কদম এর সমর্থনে 'অস্পৃশ্যতা নিবারণ' বিষয়ে প্রবন্ধ লেখেন।

□ ৪ঠা ডিসেম্বর—'বহিস্কৃত ভারত প্রকাশক সংস্থা'র ভিত্তি স্থাপন। বম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের রিফর্ম কমিটির সামনে বক্তব্য পেশ।

★ ১. এই সময়ে (১৬-৪-১৯২১) শিবরাম জানবা কামলে প্রতিষ্ঠা করেন 'অস্পৃশ্যতা রোধক মণ্ডল'। এরা তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী (ডঃ আর পি, পারঞ্জপী) র কাছে দাবি করেন—(১) বাধ্যতামূলক শিক্ষা (২) নির্যাতিত শ্রেণীর শিক্ষক সংখ্যা বৃদ্ধি (৩) প্রাথমিক ও উচ্চবিদ্যালয়ে নির্যাতিত শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য ছাত্রবৃত্তি প্রদান (৪) প্রত্যেক জেলায় স্কুল স্তরে এদের ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা।

★ ২. এই সময় (৩-৮-২৩) বোম্বে আইন সভা এস. কে. বোলের প্রস্তাব অনুসারে সিদ্ধান্ত করে যে অস্পৃশ্যরা এখন থেকে জনসাধারণের জন্য নির্মিত জলাশয় বা পানস্থান; কুয়ো, ধর্মশালা স্কুল, কোর্ট, অফিস ও চিকিৎসা কেন্দ্রে অন্যদের মতোই যেতে পারবেন।

১৯২৫ □ ৪ঠা জানুয়ারী—বহিস্কৃত হিতকারিণী সভার মাধ্যমে শোলাপুরে একটি ছাত্রাবাসের উদ্বোধন। নিপানীতে নির্যাতিত শ্রেণীর এক প্রাদেশিক সম্মেলনে নেতৃত্ব দান।

□ এপ্রিল—নিপানী সম্মেলনের সূত্র ধরে বি. এইচ্ ব্যারেলের তত্ত্বাবধানে বেলগাঁও-এ নির্যাতিত ছাত্রদের একটি হষ্টেল স্থাপন।

□ ১০ই জুন—বার্ট্লি বয়েজ এ্যাকাউন্টেন্সি ট্রেনিং ইন্স্টিটিউট-এ বাণিজ্যিক আইন বিষয়ে খণ্ডকালীন অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত হ'ন ও ৩১. ৩. ১৯২৮ পর্যন্ত কাজ করেন।

□ ১৫ই ডিসেম্বর—রয়েল কমিশনের সামনে ভারতীয় মুদ্রাব্যবস্থার উপর বক্তব্য পেশ। □ বোম্বাই বিধান পরিষদের সদস্য মনোনীত।

১৯২৬ □ ১৯শে জুলাই—শিশু পুত্র রাজরত্নের মৃত্যু।

□ ৫ই আগষ্ট—৪. ৮. ১৯২৩ সালের বোলে প্রস্তাব অনুসারে মাহাদ মিউনিসিপ্যালিটিতে প্রস্তাব পেশ।

□ অক্টোবর—জাসটিস্ পার্টি দ্বারা মনুস্মৃতি দাহন।

□ ডিসেম্বর—বোম্বে বিধান পরিষদে পুনরায় সদস্য মনোনীত।

১৯২৭ □ ১৯-২০ মার্চ—চৌদারপুকুর সত্যাগ্রহ। মহারাষ্ট্রের কোলাবা জেলায় দুইদিন ব্যাপী সমাবেশ ও সভার পর মিছিলে দশহাজার অনুগামী সহ চৌদার পুকুরে গমন ও জলপান। (মতান্তরে) এখানেই জনতা তাকে বাবাসাহেব বলে অভিহিত করেন।

□ ২১শে মার্চ—ব্রাহ্মণেরা হাজার পাত্র পবিত্র জল, গোবর, দুধ ইত্যাদি সহ পুজো পার্বণ করে এ পুকুরের জল পুনরায় পবিত্র (?) করে নেয়।

□ ৩রা এপ্রিল—'বহিস্কৃত ভারত' নামক পাক্ষিক পত্রিকার পুন প্রকাশ।

□ ৮ জুন—কলোম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ, ডি ঘোষণা।

□ জুন—ঠাকুরদ্বার মন্দিরে চরমভাবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত।

□ ২৮ জুন—বম্বের ল-জার্নালের সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য হিসাবে মনোনীত। আগষ্ট—১৯২৮ পর্যন্ত ঐ পদে বহাল।

□ ৩রা জুলাই—'বহিস্কৃত হিতকারিণী সভার' পক্ষ থেকে এক সম্মেলনে অস্পৃশ্য মাহারদের বিষয়ে আলোচনা।

□ ২৭শে জুলাই—বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয়-বিল প্রসঙ্গে বোম্বে আইন সভায় মূল্যবান বক্তব্য উত্থাপন। সিনেটে নির্যাতিত শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব দাবি করে বক্তব্য।

□ ৪ আগস্ট—মাহাদ মিউনিসিপ্যালিটির ১৯২৪ এর ৫ই জানুয়ারীর প্রস্তাব প্রত্যাহার এবং চৌদার পুকুরে অস্পৃশ্যদের জন্য আবার জলপান নিষিদ্ধ।

□ ২১শে আগস্ট—অমরাবতীর অম্বাদেবী মন্দিরে অস্পৃশ্যদের প্রবেশের চেষ্টা নাকচ।

CENTRAL LIBRARY

□ ১১ই সেপ্টেম্বর—দামোদর হলে 'মাহাদ সত্যাগ্রহ কমিটি' গঠন।

□ ১৫ই সেপ্টেম্বর—২৫ ও ২৬ ডিসেম্বর চৌদার পুকুরে সত্যাগ্রহ করা বিষয় মাহাদ সত্যাগ্রহ কমিটির সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

□ সেপ্টেম্বর—সি. বি. খৈর মোদি, ড. আম্বেদকরকে বাবাসাহেব উপ নামে ডাকার জন্য অভিমত জানান। —যা ১৯৩০ সাল থেকে বাস্তবে রূপায়িত হয়।

□ ২৬শে সেপ্টেম্বর—পুনের অহল্যা আশ্রমের নির্যাতিত শ্রেণীর ছাত্রদের সম্মেলনে সম্ভাষণ।

□ ১০ই অক্টোবর—'ভারতে খণ্ড খণ্ড ভূমি ব্যবস্থা' বিষয়ে বিধান পরিষদে বক্তব্য পেশ।

□ ২৫শে ডিসেম্বর—চৌদার পুকুর সত্যাগ্রহের দ্বিতীয় পর্যায়ে মাহাদ সম্মেলন ৪ টায় শুরু হয়। এখানেই সন্ধ্যা ৭ টা নাগাদ মনুস্মৃতি দাহ করা হয়।

□ ২৬শে ডিসেম্বর—সরকারী প্রতিনিধিদের আশ্বাসদানে সত্যাগ্রহ স্থগিত রাখা হয়।

□ ২৭ ডিসেম্বর—চামার সম্প্রদায়ের জমায়েতে ভাষণ।

□ ২৮শে ডিসেম্বর—নারী সমাবেশে ভাষণ।

১৯২৮ □ ৩রা ফেব্রুয়ারী—বৃটিশ ভারতের নানা সমস্যা বিষয়ে জন সাইমন-এর নেতৃত্বে যে কমিশন গঠিত হয়েছিল,— তারা বোম্বে আসেন।

□ ২৯শে মে—কমিশনের কাছে বহিস্কৃত হিতকারিণী সভা'র পক্ষ থেকে দাবি সনদ পেশ করেন। তাতে শূদ্রদের শিক্ষা, চাকুরী, রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা বিষয়ে নানা অভিমতও ছিল।

□ ২১শে জুন—বোম্বে গভর্মেণ্ট কলেজের অধ্যাপক পদে যোগদান।

□ ২৯শে জুন—নির্যাতিত শ্রেণী ও বর্ণহিন্দুদের মধ্যে সামাজিক সমতা সৃষ্টির জন্য সম্পাদক দেবরাও বিষ্ণু নায়কের সঙ্গে যৌথউদ্যোগে মাসিক 'সমতা' পত্রিকা প্রকাশ।

□ ২৮শে জুলাই—চাকুরীরতা নারীর প্রসবকালীন ছুটির জন্য বিধান-সভায় বক্তব্য পেশ।

□ ৩রা আগস্ট—নির্যাতিত শ্রেণীর শোষণকারী 'মাহার ভাতান' দাস প্রথা থেকে তাদের মুক্তি দেবার উদ্দেশ্যে বোম্বাই বিধান পরিষদে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিল উত্থাপন।

□ ৫ই আগস্ট—সাইমন কমিশনের পক্ষে কাজ করার জন্য বোম্বাই প্রাদেশিক কমিটির দ্বারা নির্বাচিত।

□ ২৩শে অক্টোবর—সাইমন কমিশনের কাছে অস্পৃশ্যদের স্বতন্ত্রতার দাবি পেশ। এবং বোম্বাই প্রাদেশিক সভায় ১২টি আসন দাবী।

□ ২৮শে অক্টোবর—বোম্বে সরকার কর্তৃক 'নির্যাতিত শ্রেণীর ছাত্রাবাস স্কীম' পাশ এবং ৫টি ছাত্রাবাস খোলার অনুমতি প্রদান।

১৯২৮ □ ৫ই নভেম্বর—অস্পৃশ্য ও আদিবাসী উপজাতির লোকদের শিক্ষাগত, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা সমীক্ষা ও পর্যালোচনার জন্য বোম্বে সরকার ৯ জনের একটি কমিটি করেন। আম্বেদকর কমিটির সদস্য মনোনীত হন। ১৯৩০-এর মার্চের মধ্যে রিপোর্ট পেশ করেন।

১৯২৯ □ মার্চ—সরকারী আইন কলেজের অধ্যাপক পদ থেকে বিদায় নেন।

□ ১৩ই এপ্রিল—বড় বোন তুলসার মৃত্যু।

□ ১৩ই জুন—মাহাদ সত্যাগ্রহ কেসে নির্যাতিতদের পক্ষে কোর্টের রায়।

□ ৯ই জুলাই—খুলনা কালীমন্দিরে অস্পৃশ্যদের দ্বারা সত্যাগ্রহ।

□ সেপ্টেম্বর—পুনার পার্বতী মন্দিরে নির্যাতিত শ্রেণীদের প্রবেশাধিকারের জন্য সত্যাগ্রহ কমিটি গঠন।

□ ১৩ই অক্টোবর—উক্ত সত্যাগ্রহ শুরু ও আম্বেদকরের সমর্থন।

□ ২৪শে অক্টোবর—পুনার কালেক্টর দ্বারা পার্বতী মন্দিরে সর্ব জাতির জন্য প্রবেশাধিকার ঘোষণা।

□ ১৫ই নভেম্বর—'বহিস্কৃত ভারত' পত্রিকার শেষ সংখ্যা প্রকাশ।

□ ৩০শে নভেম্বর—'জনতা' পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ আরম্ভ।

১৯৩০ □ ২রা মার্চ—নাসিকের কলারাম মন্দিরে প্রবেশের জন্য বি. কে, গায়কোয়াডের নেতৃত্বে সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু এবং আম্বেদকরের সমর্থন।

□ মে—সাইমন কমিশনের রিপোর্ট পেশ।

□ ৮ই জুলাই—বোম্বাই ইউনিভার্সিটি (সংশোধনী) বিলের সিলেক্ট কমিটির সদস্য মনোনীত।

□ ৮ই ও ৯ই আগস্ট—আম্বেদকরের পৌরহিত্যে নাগপুরে নির্যাতিত শ্রেণীর সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত।

□ ২রা অক্টোবর—লণ্ডনে গোল টেবিল বৈঠকে যোগদানের প্রাকমুহূর্তে ড. পি. জি. সোলাঙ্কির তত্ত্বাবধানে আম্বেদকরকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন।

□ ৪ঠা অক্টোবর—গোল টেবিল বৈঠকে যোগদানের জন্য লণ্ডন গমন।

□ ডিসেম্বর—লণ্ডনে (১) অস্পৃশ্যদের রাজনৈতিক অধিকার (২) ও অস্পৃশ্যদের সৈন্য বাহিনীতে নিযুক্তির আবেদন জানিয়ে দুটি স্মারকলিপি প্রস্তুত ও তার দু হাজার কপি মুদ্রণ ও বিতরণ।

□ ১৯শে জানুয়ারী—প্রথম গোল টেবিল বৈঠক সমাপ্ত। বৈঠকে সমস্ত বক্তাদের মধ্যে যুক্তিবাদী ও বলিষ্ঠ বক্তা হিসাবে স্বীকৃতিলাভ এবং এর জন্য বরোদার মহারাজা দ্বারা অভিনন্দিত।

□ ১৩ই ফেব্রুয়ারী—লণ্ডন থেকে ভারতে প্রত্যাবর্তন।

১৯৩১ □ ১৬ই মার্চ—একজন দেশপ্রেমিক এর পক্ষে 'চির্ণার ফায়ারিং কেস'-এ সওয়াল। পুলিশ বিভাগে নির্যাতিত শ্রেণীর লোক নিয়োগের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত।

□ জুলাই—আম্বেদকর দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকের সদস্য মনোনীত।

CENTRAL LIBRARY

১৯৩১ □ ১৪ই আগস্ট—মণি ভবনে গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ। দুইজনের মধ্যে ১ম গোল টেবিল বৈঠকের প্রসঙ্গ নিয়ে কথাবার্তা। অনগ্রসর সম্প্রদায়ের মানুষদের বিশেষ করে অস্পৃশ্যদের সম্পর্কেও মত বিনিময়। এই প্রসঙ্গে হিন্দুধর্ম, বর্ণাশ্রম প্রথা, গান্ধীজীর 'হরিজন'-আন্দোলন সম্পর্কে বিশ্লেষণ ও বিতর্ক। আম্বেদকর দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেন—মাহাদ ও নাসিকের সত্যাগ্রহের সময় যারা অস্পৃশ্যদের পরে আক্রমণ ক'রে তাদের নেতৃত্বে ছিলো কংগ্রেস। নাসিকর জেলা কংগ্রেসের সভাপতি এই গুণ্ডামীর অগ্রভাগে ছিলো।'

□ ২৯শে আগস্ট—২য় গোল টেবিল বৈঠকে যোগদানের জন্য লণ্ডনে উপস্থিতি। ঐ দিনই বোম্বে থেকে গান্ধীর লণ্ডন যাত্রা।

□ ৭ই সেপ্টেম্বর—২য় গোল টেবিল বৈঠক শুরু।

□ ৮ই অক্টোবর—মাইনরিটিজ্ প্যাক্ট স্বাক্ষর।

□ ৫ই নভেম্বর—নাসিক কলারাম মন্দির সত্যাগ্রহ পুনারারম্ভ।

□ ১০ই নভেম্বর—লণ্ডনে ইনষ্টিটিউট অব ইনণ্টারন্যাশনাল এফেয়ারস্ এ বক্তৃতা দান।

□ ২১শে নভেম্বর—নির্যাতিত শ্রেণীর নেতা কেলাপ্পানের নেতৃত্বে কেরলের গুরু ভায়ুরের মন্দিরে প্রবেশ আন্দোলন শুরু। এক বছর পর্যন্ত এই আন্দোলন চলেছিল।

□ ১লা ডিসেম্বর—দ্বিতীয় RTC (গোল টেবিল বৈঠক) মুলতুবি। এখানে আম্বেদকরের উত্থাপিত দাবিগুলি হল—(১) জনসংখ্যানুপাতে আসন সংরক্ষণ (২) পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থা (৩) হরিজনের পরিবর্তে 'অবর্ণ হিন্দু' বা প্রোটেস্টাণ্ট বা নন কনফর্মিস্ট হিন্দু নামের ব্যবহার করতে হবে।

□ ৫ই ডিসেম্বর—RTCর সমাপ্তি ও পুরনো শিক্ষক ও বন্ধুদেব সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আম্বেদকরের নিউয়র্ক গমন।

□ ২৭ শে ডিসেম্বর—লর্ড লোথিয়ানের নেতৃত্বে গঠিত ভারতীয় ফ্রান্সাইজ কমিটির সদস্য মনোনীত।

□ ২৮শে ডিসেম্বর—RTC শেষে গান্ধীজীর বোম্বে প্রত্যাবর্তন। গান্ধীজীকে নির্যাতিত শ্রেণীর লোকেদের দ্বারা কালো পতাকা প্রদর্শন।

□ ৩১শে ডিসেম্বর—'রত্নগিরি জেলা বহিস্কৃত পরিষদ' এর চিপলুনের সমাবেশে গান্ধীজীর বিরুদ্ধে জনগণের সামনে চার্জসীট প্রদান।

১৯৩২ □ ৪ঠা জানুয়ারী—আম্বেদকরের নিউইয়র্ক থেকে লণ্ডনে আগমন। গান্ধীজী ও বল্লভ ভাই প্যাটেল যারবেদা (Yeravada) জেলে আটক।

□ ২৯ জানুয়ারী—সৌকত আলি এবং ফ্রানসাইস কমিটির (Franchise committee) অন্যান্য বৃটিশ সদস্যদের নিয়ে বোম্বে আগমন।

□ ফেব্রুয়ারী থেকে এপ্রিল—ফ্রানসাইস কমিটির সঙ্গে বিহার, কলকাতা এবং অন্যান্য স্থানে সমীক্ষা-সফর।

□ ১৪ই এপ্রিল—নাসিকের কলারাম মন্দিরে প্রবেশের আন্দোলন তৃতীয়

CENTRAL LIBRARY

ভরে উপনীত হলে দাদাসাহেব গায়কোয়াড়, অমৃত রাও রণখাম্বে কে এ্যারেষ্ট করা হয়।—[আম্বেদকর সিদ্ধান্ত করলেন মন্দিরে প্রবেশ আন্দোলনের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল রাজনৈতিক আন্দোলন।]

১৯৩২ □ ১লা মে—ফ্রান্সাইস কমিটির কাছে Note of Dessent প্রদান।

□ ৭ ও ৮ই মে—মুনীস্বামী পিল্লাই এর নেতৃত্বে নাগপুরে নির্যাতিত শ্রেণীর বিরাট সর্বভারতীয় সম্মেলন।

□ ২২শে মে—এ. বি ল্যাথের সভাপতিত্বে সংগঠিত সভায় ড. আম্বেদকরের মিছিল সহ যোগদান। সভায় পৃথক নির্বাচনের দাবীর সমর্থনে প্রস্তাব গৃহীত।

□ ২৪শে মে—বেলগায়ে দেওয়ান বাহাদুর লাথের সভাপতিত্বে ড. আম্বেদকরকে এক দৃঢ় চিত্ত জাতীয়তাবাদী ("a strong nationalist at heart) হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়।

□ ৭ই জুন—লণ্ডনে গমন ও বৃটিশ প্রধানের কাছে স্মারক লিপি পেশ।

□ জুন-জুলাই—ড্রেসডেনের ড. মোলারের তত্বাবধানে জার্মান স্বাস্থ্য নিবাসে প্রায় এক মাস অতিবাহিত।

□ ৪ঠা আগষ্ট—ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে নির্যাতিত শ্রেণীর লোকদের পৃথক নির্বাচক মণ্ডলীর (কমিউন্যাল এ্যাওয়ার্ড) ঘোষণা।

□ ১৭ই আগষ্ট—ইংল্যাণ্ড থেকে প্রত্যাবর্তন।

□ ১৮ই আগষ্ট—কমিউন্যাল এ্যাওয়ার্ড (সম্প্রদায়গত বাঁটোয়ারা)-র বিরুদ্ধে গান্ধীজীর আমরণ অনশন ঘোষণা।

□ ১৯শে সেপ্টেম্বর—মদন মোহন মালবিয়ার নেতৃত্বে গান্ধীজীর অনশন নিয়ে বোম্বেতে হিন্দু নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ। গান্ধীজীর আমরণ অনশনের বিষয়ে প্রেস-বিবৃতি প্রদান। গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্য আম্বেদকর এবং অন্য হিন্দু নেতাদের পুনে গমন।

□ ২০শে সেপ্টেম্বর—গান্ধীজীর আমরণ অনশন শুরু।

□ ২১শে সেপ্টেম্বর—পুনরায় এম. আর. জয়াকার, বিড়লা, চুনীলাল মেহতা এবং সি. গোপালাচারী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ সহ আম্বেদকরকে যারবেদা জেলে নিয়ে গিয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ।

২৪ শে সেপ্টেম্বর—গান্ধীজীর জীবন রক্ষার জন্য পুনা চুক্তিতে (বিকেল ৫ টায়) স্বাক্ষর এবং সংযুক্ত নির্বাচনী-ক্ষেত্র ব্যবস্থা গৃহীত।

বোম্বের ওয়াদালাতে গণপতি উৎসবে বর্ণভেদ জর্জর হিন্দু ধর্মের প্রতি আম্বেদকরের নিদারুণ বিরক্তি প্রকাশ।

□ ২৬শে সেপ্টেম্বর—ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীর দ্বারা পুণা চুক্তি সংশোধন।

৩০শে সেপ্টেম্বর—অস্পৃশ্যতা বিরোধী লীগের প্রতিষ্ঠা।

□ ৬ই অক্টোবর—বোম্বাই বিধান পরিষদে গ্রাম পঞ্চায়েত আইনের উপর বক্তব্য পেশ। নির্যাতিতদের যোগদানে নিশ্চয়তা দানের প্রসঙ্গ উত্থাপন।

CENTRAL LIBRARY

□ ২৮শে অক্টোবর—'রুশী সমাজের আয়োজিত বোম্বের এক সভায় বক্তব্য পেশ। যার মূলকথা 'রামচন্দ্রের' চেয়ে যে 'রুটি চন্দ্রের' দামবেশী—তা সাধারণ মানুষকে বুঝতে হবে।

□ ৭ই নভেম্বর—৩য় গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের জন্য লণ্ডন যাত্রা।

১৭ই নভেম্বর—বৈঠক শুরু। Communal Safeguards Committee ও পার্লামেণ্টের উভয় House এ Joint Select Committee-র সদস্য মনোনীত।

১৯৩৩ □ ২৪শে জানুয়ারী—লণ্ডন থেকে বোম্বে প্রত্যাবর্তন।

□ ৪ঠা ফেব্রুয়ারী—গান্ধীজীর টেলিগ্রাম পেয়ে যারবেদা জেলে দেখা করেন। Dr. Stanley Jones র উপস্থিতিতে আলোচনা হয়। আম্বেদকর বলেন নির্যাতিত শ্রেণীর লোকেরা মন্দির প্রবেশ নিয়ে সন্তুষ্ট নয়। তাদের কাছে সামাজিক উন্নতি এবং শিক্ষাই বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

□ ফেব্রুয়ারী—বোম্বের মজগাঁওয়ের এক সভায় বক্তব্য পেশ। নির্যাতিত লোকেদের দাসত্ব বন্ধন থেকে মুক্তি এবং প্রাপ্য অধিকার দাবি। অত্যাচার, অবিচার এবং মিথ্যা প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনের আহ্বান।

□ ১৪ই এপ্রিল—বোম্বের নাসিকে এবং পুনাতে আম্বেদকরের প্রথম জন্মদিবস অনুষ্ঠান পালিত।

□ ১১ই জুলাই থেকে ২৮শে জুলাই এবং ৩রা অক্টোবর থেকে ৭ই নভেম্বর —লর্ড লিনলিথগো-এর সভাপতিত্বে Indian constitutional Reforms সংক্রান্ত Joint Parliamentary committee-র কাজে যোগদান।

□ ২৩শে অক্টোবর—ইংল্যাণ্ডে উইনস্টোন চার্চিলের সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

□ ১৯৩৩—১৯৫০ বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে ফ্যাকালটি অফ্ আর্টস্ এণ্ড ল এর ফেলো ছিলেন।

১৯৩৪ □ ৮ই জানুয়ারী—লণ্ডন থেকে বোম্বে আগমন।

□ ৩রা মার্চ—দাদাসাহেব গাইকোয়াড়কে নাসিক কলারাম মন্দির প্রবেশ সত্যাগ্রহ ত্যাগ করতে আম্বেদকরের পত্র।

□ জুন—বোম্বে গভর্মেণ্ট ল কলেজে আংশিক সময়ের অধ্যাপক পদে যোগদান।

□ ১৪ই অক্টোবর—দাদা কেলুস্কারের মৃত্যু।

১৯৩৫ □ ২৭শে মে—পত্নী রমাবাঈ-এর মৃত্যু।

□ ১লা জুন—বোম্বে গভর্মেণ্ট ল কলেজের অধ্যক্ষ এবং Parry Professor of Jurisprudence পদে নিযুক্তি।

□ ১৩ই অক্টোবর—ইয়ালা সম্মেলনে হিন্দু ধর্ম ত্যাগের ঘোষণা।

১২ই ডিসেম্বর—লাহোরের 'জাতপাত তোড়ক মণ্ডল'-এর সম্মেলনে সভাপতিত্বের জন্য আমন্ত্রিত।

CENTRAL LIBRARY

১৯৩৫ ঃ বাম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের Academic Council ও Syndicate-এর সদস্য মনোনীত, ১৯৩৭ পর্যন্ত ছিলেন।

□ এপ্রিল—শিখ সম্প্রদায়েয় সম্মেলনে যোগদান।

□ ২৭শে এপ্রিল—সভাপতির ভাষণ পরিবর্ত্তন করতে বলায় লাহোর জাতপাত তোড়ক মণ্ডলের সভায় না যাওয়ার সিদ্ধান্ত।

□ ১৫ই মে—জাতপাত তোড়ক মণ্ডলের সভায় প্রদত্ত ভাষণ, "জাতপাতের বিলোপ সাধন" বক্তৃতাটি প্রকাশিত হয়।

□ মে—জুন—ইয়েয়োলায় ধর্মান্তকরণের সমর্থনে প্রদত্ত ভাষণ সম্বন্ধে প্রতিক্রিয়া জানার উদ্দেশ্যে মহারদের নিয়ে ড. আম্বেদকর দাদার-এ একটি সভা ডাকেন। এই সভায় কট্টর ধর্মানুগামীরা মস্তক, দাড়ি, গোঁফ মুণ্ডন করে আসেন। ড. আম্বেদকর এই সভায় "অস্পৃশ্যদের মুক্তি কোন্ পথে"-শীর্ষক বক্তৃতাটি দেন।

□ দামোদর হলে এক জন সভায় দেবদাসী, পত্রজ, ভুতেশ, আরধি এবং জগতি সম্প্রদায়ের লোকেরা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের উদ্দেশ্যে জমায়েত হন।

□ ১৫ই আগষ্ট—১৯৩৫-এর আইনানুযায়ী সাধারণ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার উদ্দেশ্যে তিনি 'স্বাধীন শ্রমিকদল' গঠন করেন।

১৯৩৬ ঃ ১২ ডিসেম্বর—ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজ নিম্নবর্ণের লোকেদের মন্দিরে প্রবেশের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ভারতে এই সিদ্ধান্তই প্রথম।

১৯৩৭ ঃ ১৭ ফেব্রুয়ারী—ভারত সরকারের ১৯৩৫★ এর আইন অনুযায়ী সাধারণ নির্বাচনে অন্যান্যদের সঙ্গে অংশ গ্রহণ করে শ্রমিক দলের প্রতিনিধি হিসাবে ডঃ আম্বেদকর নির্ব্বাচিত হন।

□ ১৭ই মার্চ—বিচারপতি ব্রুমফিল্ড ও বিচারপতি এন, জে, বাদিয়া মাহাদ-চৌদার পুকুর মামলায় নিম্নবর্ণের লোকেদের পক্ষে রায় দেন।

□ ২৩ আগষ্ট—মন্ত্রীদের মাহিনা সম্বন্ধে ড. আম্বেদকর বোম্বাই বিধান সভায় বক্তব্য রাখেন। স্বাধীনদেশের সাধারণ নাগরিকদের আর্থিক সংগতির সঙ্গে সমতা রেখে এই বেতনক্রম নির্দ্ধারণের নীতি তিনি পেশ করেন। মাসিক ৫০০ টাকা থেকে মাত্র ৭৫ টাকা করতে বলেন।

১৯৩৭ □ ১৭ সেপ্টেম্বর—বোম্বাই বিধানসভায় খোতি প্রথা বিলোপ সম্বন্ধে তিনি বক্তব্য রাখেন। অন্য একটি বিলে মাহার ভাতান নামক দাসপ্রথা সম্বন্ধেও প্রতিবাদমূলক বক্তব্য রাখেন।

১৯৩৮ □ ১৮ জানুয়ারী—'লোকাল বোর্ড'—আইনের পরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে বোম্বাই বিধান সভায় আলোচনার সময়ে অনুন্নত সম্প্রদায়কে 'হরিজন'

★ **প্রসঙ্গত উল্লেখ্য**—এই Govt of India act—1935 অনুসারেই ভারতে শোষিত ও অনুন্নত শ্রেণীর চাকুরী, শিক্ষা ও নির্ব্বাচনী অধিকারের জন্য তালিকা (Schedule) তৈরী হয়। এরাই Schedu'ed Castes নামে পরিচিত। scheduled tribes এর সঙ্গে পরে সংযুক্ত হয়।

বলায় বি. কে. গায়কওয়াড আপত্তি জানালে ড. আম্বেদকর তাঁকে সমর্থন করেন। কিন্তু শাসক গোষ্ঠী চাপ দিলে ড. আম্বেদকর সদলবলে সভাকক্ষ ত্যাগ করেন।

১৯৩৮ □ ২৩শে জানুয়ারী—আমেদনগরে এক কৃষকসভায় ভাষণ দেন।

□ ফেব্রুয়ারী—নাসিক জেলার মানমাদে, রেলওয়ের নিম্নবর্ণের কর্মীদের সভায় তিনি সভাপতিত্ব করেন। ভাষণে পুঁজিবাদ ও ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সংগঠিত হওয়ার আহ্বান জানান।

□ ২৭শে এপ্রিল—পুলিশ আইন সংশোধনী বিলের ওপর বিধানসভায় বক্তব্য রাখেন। তফসিলী জাতির শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন।

□ এপ্রিল—জাতীয় স্বার্থে পৃথক কর্ণাটক প্রদেশ গঠনের বিরোধিতা করেন।

□ মে—সরকারী 'ল' কলেজের অধ্যক্ষপদে ইস্তাফা দেন।

□ মে—কোঙ্কন জেলায় সফরে বেরিয়ে জঘন্য শূদ্র-শোষণ-মূলক খোতি প্রথার বিরুদ্ধে তিনি প্রচার চালান।

□ আগষ্ট—মধ্যপ্রদেশ মন্ত্রীসভায় অগ্নিভোজ নামে তফসিলী জাতির এক ব্যক্তির অন্তর্ভুক্তির বিরুদ্ধে প্রচাররত মহাত্মাগান্ধীর মুখোশ খুলে দেবার উদ্দেশ্যে বোম্বাইয়ের আর. এম. ভাট উচ্চ বিদ্যালয়ে একটি সভা ডাকেন।

□ সেপ্টেম্বর—পুনেতে নিম্নবর্গের ছাত্রসংঘের সম্মেলনে ভাষণ দান।

□ সেপ্টেম্বর—বোম্বাই বিধান সভায় শিল্প বিরোধ বিলের ওপর বক্তব্য রাখেন এবং শিল্পশ্রমিকদের অধিকার ও স্বাধীনতা খর্ব করার প্রচেষ্টাকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন।

□ ৬ই নভেম্বর—যমুনাদাস মেহাটার সভাপতিত্বে শিল্পশ্রমিকদের ষাটটি সংগঠন মিলিত হয়। ড. আম্বেদকর সহ বহু বিশিষ্ট নেতা ঐ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। আসন্ন ধর্মঘটকে সফল করার জন্যে তাঁর দলের বিধায়কদের তিনি অনুরোধ করেন। এবং যমুনাদাস মেহাটার সভাপতিত্বে রামগড় ময়দানে শ্রমিক সম্মেলনও করা হয়।

□ ৭ নভেম্বর—ধর্মঘটে রত শ্রমিকদের সমাবেশে ড. আম্বেদকরের ভাষণ।

□ ১০ নভেম্বর—ড. আম্বেদকরের নির্দেশে তাঁর দলের বিধায়ক পি. জে. রোহম বিধান সভায় জন্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষে প্রস্তাব পেশ করেন।

□ ডিসেম্বর—হায়দারাবাদে নিজামের রাজ্যে নিম্নবর্ণের প্রথম সম্মেলনে তিনি বক্তৃতা দেন।

১৯৩৯ □ ১৮ই জানুয়ারী—তফসিলী জাতির সমস্যা সম্বন্ধে সমীক্ষার উদ্দেশ্যে ড. আম্বেদকর রাজকোট আসেন ও ঠাকুর সাহেবের সঙ্গে আলোচনা করেন। ঐ দিনই "সংঘ বনাম স্বাধীনতা" বিষয়ে পুনেতে বক্তৃতা দেন।

□ ১৭ই মার্চ—বোম্বাইয়ে মিল শ্রমিকদের ওপর পুলিশের গুলি চালনার প্রতিবাদ জানিয়ে স্থানীয় বিধান সভায় বক্তব্য রাখেন।

CENTRAL LIBRARY

□ জুলাই—বোম্বাইয়ের আর. এম. ভাট. বিদ্যালয়ের একটি সভায় ড. আম্বেদকর বক্তব্য রাখেন এই বলে যে, নিম্নবর্ণের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভেতর কোনও মত পার্থক্য থাকা উচিত নয়। কোনও একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্যে নয়, সমস্ত সম্প্রদায়েই তাঁর সমাজসেবা চিহ্নিত।

□ অক্টোবর—কংগ্রেসের যুদ্ধ-উপসমিতির সভাপতি জহরলাল নেহরুর সঙ্গে বোম্বাইতে তাঁর প্রথম মুখোমুখি আলোচনা। তিনি জানিয়ে দেন তফসিলী জাতি রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও বর্তমান অবহেলিত অবস্থাটা মেনে নেবে না।

১৬ই ডিসেম্বর—আমেদনগর জেলায় হারে গাঁওয় বাতাঁডায় মাহারদের সম্মেলনে ড. আম্বেদকর সভাপতিত্ব করেন। এবং জুদি করপ্রথার বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন।

১৯৪০ □ মে—তিনি এই সময়ে মাহার পঞ্চায়েৎ প্রতিষ্ঠা করেন।

□ ২৭শে জুলাই—বোম্বাইয়ে সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে ড. আম্বেদকরের সাক্ষাৎ হয়। প্রস্তাবিত 'ফেডারেশন' গঠনের ব্যাপারে তিনি সুভাষ বসুর মতামত জানতে পারলেও তফসিলী জাতি সম্বন্ধে সুভাষ বসু ঐ আলোচনায় কোন মন্তব্য করেন নি।

১৯৪১ □ জানুয়ারী—সেনাবাহিনীতে তফসিলী জাতির নাগরিকদের অন্তর্ভুক্তির প্রশ্নটি তিনি তোলেন এবং ৪৯ বছর পরে মাহার বাহিনী গঠিত হয়।

□ ৭ই মে—বুদ্ধজয়ন্তীর রাজনৈতিক তাৎপর্য্য বিষয়ে এক সম্পাদকীয়তে তিনি লেখেন—ব্রাহ্মণ্যধর্মে গণতন্ত্রের প্রত্যাখ্যান স্পষ্ট গণতন্ত্রের সঙ্গে-এর কোন সম্পর্ক নেই। চতুর্বর্ণে গণতন্ত্রে কোন স্থান নেই।

□ জুলাই—ভারতের প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা পর্ষদের সদস্য মনোনীত হন।

□ আগষ্ট—নাসিক জেলার সিন্নারের সম্মেলনে মাহার বাতানদের উপর ধার্য করের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ডাক দেন। তিনি রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করেন ও কর প্রত্যাহার করা হয়।

১৯৪২ □ এপ্রিল—পি. এন. রাজভোজকে সাধারণ সম্পাদক ও এন শিবরাজকে সভাপতি ক'রে তিনি সারা ভারতে তফসিলী ফেডারেশন গড়ে তোলেন।

□ জুলাই—নাগপুরে সর্বভারতীয় তফসিলী জাতি সম্মেলনে বক্তৃতা দেন।

২০শে জুলাই—ভাইসরয়ের কর্মসমিতিতে (মন্ত্রীসভায়) শ্রম সদস্য হিসাবে ড. আম্বেদকরকে নেওয়া হয়। যে পদটি তিনি জুন, ১৯৪৬ পর্যন্ত অলংকৃত করেছিলেন। প্রথম বছরেই তিনি বিদেশে পড়াশুনার জন্যে তফসিলী জাতির ছাত্রদের বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করেন। (তবে কংগ্রেস এই প্রথা ১৯৪৬ সালে বন্ধ করে দেয়)।

CENTRAL LIBRARY

□ নভেম্বর—আকাশবাণীর বোম্বাই কেন্দ্রে 'ভারতীয় শ্রমিক ও যুদ্ধ'—নামে একটি ভাষণ দেন।

১৯৪৩ □ ১৮ই জানুয়ারী—মহাদেব গোবিন্দ রানাডের ১০১তম জন্ম বার্ষিকীতে ভাষণ। (পরে এটি 'রানাডে-গান্ধী-জিন্নহ' শিরোনামে প্রকাশিত হয়)।

□ অক্টোবর—প্রতিরক্ষা বাহিনীতে তফসিলী জাতির লোকেদের নিয়োগের বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় প্রস্তাব গৃহীত হয়।

□ "শ্রমও সংসদীয় গণতন্ত্র" বিষয়ে তিনি একটি বক্তৃতা দেন।

১৯৪৪ □ জানুয়ারী—কানপুরে তফসিলী জাতি সংঘের সম্মেলন হয়।

□ জুলাই—বোম্বাইতে তপসিলী জাতি উন্নয়ন অছি পরিষদ গঠিত হয়।

১৯৪৫ □ ৮ই মে—বোম্বাইয়ের প্যারেলে তফসিলী জাতি ফেডারেশনের বাৎসরিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে "সাম্প্রদায়িক সংকট সমাধানের উপায়"—সম্বন্ধে ভাষণ দেন।

□ জুন—"অস্পৃশ্যদের জন্যে কংগ্রেস ও গান্ধী কী করেছে ?—শিরোনামে আম্বেদকরের এই বইটি প্রকাশিত হয়।

□ ২৬শে জুন—সানফ্রানসিস্কোয় সম্মিলিত জাতি পুঞ্জের সনদ স্বাক্ষরিত হয়।

□ জুলাই—বোম্বাইয়ের "পিপল্‌স্ এডুকেশান সোসাইটি" স্থাপনা করেন।

□ আগষ্ট—পুনেতে রাজনীতি বিষয়ক বিদ্যালয়ের উদ্বোধনী ভাষণ দেন।

১৯৪৬ □ জানুয়ারী—বৃটিশ সংসদীয় প্রতিনিধিবর্গের কাছে তিনি সাক্ষ্য দেন।

৩রা মার্চ—বোম্বাইয়ে নারে পার্কে তফসিলী জাতি ফেডারেশনের নির্বাচনী সভায় ভাষণ দেন।

□ ১১ই মার্চ—বোম্বাইয়ের ওরলিতে তফসিলী জাতির লোকেরা গান্ধীকে কালো পতাকা সহ বিক্ষোভ দেখায়।

□ ৫ এপ্রিল—বৃটিশ ক্যাবিনেট মিশনের কাছে ড. আম্বেদকর বিভিন্ন প্রস্তাব পেশ করেন।

□ মে—তাঁর সমর্থক ও বর্ণ হিন্দুদের সঙ্গে সংঘর্ষে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত ভারত ভূষণ ছাপাখানা পুড়ে যায়।

□ ১৬ই মে—বৃটিশ ক্যাবিনেট মিশন তাঁদের নীতি ঘোষণা করে। তফসিলী জাতির দাবি উপেক্ষিত হওয়ায় ড. আম্বেদকর ভীষণ ক্ষুব্ধ হন।

□ ১৭ই জুন—তফসিলী জাতির যথাযথ প্রতিনিধিত্বের দাবিতে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীকে তারবার্তা প্রেরণ। "ক্যাবিনেট মিশন প্রদত্ত প্রস্তাবের একটি সমালোচনা" এই নামেও একটি লিখিত প্রতিবাদ প্রেরণ এবং ক্যাবিনেট মিশন কর্তৃক সংবিধান সমিতি স্থাপনের কথা ঘোষণা।

□ ২০শে জুন—বোম্বাইয়ে সিদ্ধার্থ কলেজ স্থাপন করেন।

□ ৩০শে জুন—ক্যাবিনেট মিশন লণ্ডনে ফিরে যায়।

CENTRAL LIBRARY

□ জুন—ভাইসরয়ের কর্মসমিতি (মন্ত্রী পরিষদ) থেকে পদত্যাগ করেন।
□ জুলাই—পুনের তফসিলী জাতি সংঘের একটি সভায় ভাষণ দেন এবং কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ শুরু করেন।
□ ৪ঠা নভেম্বর—চার্চিলের (কেন্টের) গ্রামের বাড়ীতে তিনি তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। লণ্ডনে প্রধান মন্ত্রী এটলির সঙ্গেও তিনি দেখা করেন।
□ ৫ই নভেম্বর—হাউস অব কমনস-এ কনজারভেটিভ দলের সভায় তিনি বক্তৃতা দেন। পুনা চুক্তির উচ্ছেদ ও ম্যাকডোনাল্ড-এর সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা রায়ের পুনরুদ্ধারের জন্যেও তিনি বক্তব্য রাখেন।
□ নভেম্বর—যুক্ত বাংলা থেকে সংবিধান সমিতিতে তিনি নির্বাচিত হন।
□ ১৫ই ডিসেম্বর—সংবিধান সমিতিতে প্রদত্ত তাঁর প্রথম ভাষণ।

১৯৪৭ □ ২৭শে মার্চ—'রাষ্ট্র ও তার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়' রচনা প্রকাশিত।
□ ২৯শে এপ্রিল—অস্পৃশ্যতা সংক্রান্ত সংবিধানের ১৭ ধারা পাশ হয়।
□ ২২শে জুলাই—কংগ্রেসের ড. এম. আর. জয়কারের পদত্যাগের ফলে সৃষ্ট শূন্যস্থানে সংবিধান সমিতিতে তিনি পুনর্নির্বাচিত হন।
□ ৩রা আগষ্ট—ড. আম্বেদকরকে আইন মন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত ক'রে নেহরু ক্যাবিনেটের নাম ঘোষিত হয়।
□ ১৫ই আগস্ট—ভারত স্বাধীনতা লাভ করে ও পাকিস্তান সৃষ্টি হয়।
২৯শে আগস্ট—সংবিধান সমিতির খসড়া প্রস্তুত উপসমিতি গঠিত হয়, যার সভাপতি হন ড. আম্বেদকর।

১৯৪৮ □ ২৫শে জানুয়ারী—লক্ষ্ণৌয়ে তফসিলী জাতি সংঘের সম্মেলন আহ্বান।
□ ৩০শে জানুয়ারী—নাথুরাম গডসে দ্বারা মহাত্মা গান্ধী খুন হন।
□ ফেব্রুয়ারী—ড. আম্বেদকর খসড়া সংবিধান সম্পন্ন করেন।
□ ১০ই মার্চ—অধ্যাপক পি এল নারাসুর "দি এসেন্স অব বুদ্ধিসম্" গ্রন্থের ভূমিকা লিখে দেন।
□ ৯ই এপ্রিল—হিন্দু কোড বিল বিচার করার উদ্দেশ্যে তাঁকে সভাপতি করে একটি সিলেক্ট কমিটি গঠিত হয়।
□ ১৫ই এপ্রিল—তাঁর দ্বিতীয় বিবাহ—ডা. মিস্ শারদা কবিরের সঙ্গে।
□ ২১শে জুলাই—সংবিধান সমিতির সভাপতি ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ হিন্দু কোড বিলের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন।
□ ২২শে জুলাই—প্রধান মন্ত্রী জহরলাল নেহরু (রাজেন্দ্র প্রসাদের বিরুদ্ধে) হিন্দু কোডবিলের প্রতি সমর্থন জানিয়ে তার অভিমত রাখেন।
□ ১৪ই অক্টোবর—ধর কমিটির কাছে "মহারাষ্ট্রকে ভাষাভিত্তিক রাজ্য" হিসাবে গঠনের জন্য স্মারকলিপি দেন।
□ ৪ঠা নভেম্বর—সংবিধান সমিতিতে খসড়া সংবিধান পেশ করেন।

CENTRAL LIBRARY

□ ২৮শে নভেম্বর—সংসদে প্রধানমন্ত্রী নেহরু ঘোষণা করেন যে, হিন্দু কোড বিল কার্যকর করার দায়িত্ব তাঁর সরকারের।

১৯৪৯ □ ২৫শে নভেম্বর—সংবিধান সমিতিতে প্রদত্ত তাঁর বিদায়ী ভাষণ উচ্চ প্রশংসিত হয়।

□ ২৬শে নভেম্বর—সংবিধান গৃহীত হয়।

১৯৫০ □ ২রা মে—শ্রীলংকার ক্যান্ডিতে যান ও সেখানে বৌদ্ধ উৎসব ও অনুষ্ঠান দেখেন।

□ ৬ই জুন—কলম্বো ভ্রমণ করেন ও ইয়ং মেন্‌স বুদ্ধিষ্ট এ্যাসোশিয়েশন-এ ভাষণ দেন। তাঁর মতে ভারতে বৌদ্ধধর্ম বিলোপের কারণ—বৈষ্ণব ও শৈব ধর্মের উত্থান এবং আলাউদ্দিনের নেতৃত্বে ইসলামের অনুপ্রবেশ।

১৯৫১ □ ৫ই ফেব্রুয়ারী—সরকারের তরফে সংসদে হিন্দু কোড বিল পেশ।

□ মে—জন-প্রতিনিধিত্ব বিলটি তিনি সংসদে পেশ করেন।

□ ১১ই জুন—হিন্দু কোড বিল সম্বন্ধে তিনি সিদ্ধার্থ কলেজের ছাত্র সংসদে বক্তৃতা দেন।

□ জুলাই—ভারতীয় বৌদ্ধ জনসংঘ প্রতিষ্ঠা করেন।

□ ১০ই আগষ্ট—প্রধানমন্ত্রী নেহরু আম্বেদকরকে হিন্দু কোডবিলের রূপকার হিসাবে বর্ণনা করেন। কিন্তু সংসদে হিন্দু কোড বিল পাশ হওয়া সত্ত্বেও রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ অনুমোদন দানে বিরত থাকেন।

□ ১৯শে সেপ্টেম্বর—সংসদে বিবাহ ও বিচ্ছেদ নিয়ে প্রচুর বাকবিতণ্ডা হয়।

□ ১১ অক্টোবর—হতাশাগ্রস্ত হ'য়ে নেহরু-মন্ত্রীসভা থেকে তিনি ইস্তফা দেন।

১৯৫২ □ ৫ই জানুয়ারী—সাধারণ নির্বাচনে একজন অখ্যাত কংগ্রেস প্রার্থী এন. এস. কাজরোলকর-এর কাছে তিনি পরাজিত হলেন।

□ ৯ই মার্চ—বোম্বাই প্রদেশ থেকে রাজ্য সভায় তিনি নির্বাচিত হন।

□ ২রা জুন—কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনের সাম্মানিক ডকটরেট উপাধি নেবার উদ্দেশ্যে তিনি নিউ ইয়র্ক যান।

□ ৫ই জুন—'ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাগরিক, বিখ্যাত সমাজ সংস্কারক ও মানবিক মূল্যবোধের উদগাতা'—এই আখ্যায় কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ভূষিত করে।

□ ১৬ই জুন—নিউয়র্ক থেকে বোম্বাই ফিরে আসেন।

□ ২২শে ডিসেম্বর—পুণে বারের একটি সভায় "গণতন্ত্রের সফল রূপায়নের পূর্বে"—এই নামে একটি বক্তৃতা দেন।

□ ২৪ ডিসেম্বর—কোলাপুরে রাজারাম কলেজে ছাত্রদের বার্ষিক সম্মেলনে তিনি ভাষণ দেন। কোলাপুরের মহিলারা তাঁকে অভিনন্দন পত্র দেন।

১৯৫৩ □ ১২ই জানুয়ারী—ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সাম্মানিক ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত করে।

এপ্রিল—সংসদে অস্পৃশ্যতা নিবারণ বিল পেশ হয়।

১৯৫৩ □ জুন—বোম্বাই সিদ্ধার্থ কলেজে অব কমার্স-এর উদ্বোধন করেন।

১৯৫৪ □ ৯ঠা জানুয়ারী জ্যোতিরাও ফুলের ওপর চলচ্চিত্র উদ্বোধন করেন।

□ ২৪শে জানুয়ারী—বোম্বাই অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় সাই ভক্তদের সম্মেলন উদ্বোধন।

এপ্রিল—ভান্দারা থেকে লোকসভায় সংরক্ষিত আসনে প্রতিদ্বন্দিতা করেন।

□ মে—বুদ্ধ জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে তিনি রেঙ্গুন ভ্রমণ করেন। সেখানেই তিনি ভান্দারা নির্বাচনে হেরে যাওয়ার খবর পান।

□ ১২ই সেপ্টেম্বর—অস্পৃশ্যতা (নিবারণী) বিল সম্বন্ধে রাজ্যসভায় বক্তৃতা। তাঁর মতে নাম হবে, "অস্পৃশ্যদের নাগরিক অধিকার বিল।"

□ ডিসেম্বর—তৃতীয় বিশ্ব বৌদ্ধ সম্মেলনে যোগ দিতে রেঙ্গুন যান।

১৯৫৫ □ মে—বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হবার ঘোষণা।

১৯৫৬ □ ফেব্রুয়ারী—"বুদ্ধ ও তাঁর ধর্ম," "প্রাচীন ভারতে বিপ্লব ও প্রতি বিপ্লব" "বুদ্ধ ও মার্ক্স"—এই গ্রন্থগুলি তিনি লিখে শেষ করেন।

□ মে—"আমি কেন বৌদ্ধধর্ম পছন্দ করি"—এই নামে বি. বি. সি. তে বক্তৃতা। তিনি ভয়েস অব আমেরিকাতেও 'ভারতে গণতন্ত্রের সম্ভাবনা' বিষয়ে বক্তৃতা দেন।

□ ১০ই জুন—দিল্লীতে তিনি ধম্মপাদের সঙ্গে গীতার তুলনা করেন। ধম্মপাদের প্রেক্ষিতে জাতপাতের সম্বন্ধেও উল্লেখ করেন।

□ ২৩শে সেপ্টেম্বর—বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত।

□ ৩০শে সেপ্টেম্বর—রিপাব্লিকান পার্টি অব ইণ্ডিয়া গঠনের কথা ঘোষণা করেন। খসড়া কর্মসূচীও প্রস্তুত করেন।

□ ১৪ই অক্টোবর—নাগপুরে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের বিরাট অনুষ্ঠান হয়। ২২টি অনুশাসন মেনে তিনি ও তাঁর স্ত্রী মহাস্থবির চন্দ্রমণির কাছে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন।

□ ১৫ই নভেম্বর—কাঠমাণ্ডুতে বিশ্ব বৌদ্ধ সম্মেলনে যোগ দেন ও বুদ্ধ ও মার্কস সম্বন্ধে বক্তব্য রাখেন।

□ ৬ই ডিসেম্বর—দিল্লীস্থ বাসভবনে আম্বেদকরের নির্বান লাভ।

CENTRAL LIBRARY

প্রসঙ্গ কথা

সংগ্রামী জীবন যাঁদের, যাঁরা কেবল লেখক মাত্র নন, তাঁদের লেখাকে তাঁদের জীবন সংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। কারণ বহুক্ষেত্রেই এই সব রচনা একাডেমিক গবেষণার সীমায় আবদ্ধ থাকে না—তা হয়ে ওঠে আন্দোলনের দাবি সনদ, যৌক্তিকতার ভিত্তি পত্র, —চিন্তা সূত্রের দার্শনিক দলিল।

আম্বেদকর তাঁর সমকালের পৃথিবীর এবং ভারতের ইতিহাসের এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রাজ্ঞপুরুষ। তাই তার অগাধ পাণ্ডিত্য-প্রসূত সম্ভাষণ ও বিভিন্নক্ষেত্রে উত্থাপিত দাবি সনদ গুলিও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইতিহাস-নন্দিত ধ্রুপদী গ্রন্থের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দার্শনিক বা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের মধ্যে মতের ও মতবাদের ঐক্য বা বৈপরীত্য থাকা স্বাভাবিক। সেদিক থেকে বিবেচনা করলে আম্বেদকরের মত ও পথের সঙ্গে অনেকেই একমত নাও হতে পারেন কিন্তু তার সুকঠোর জীবন যুদ্ধ, বিরল পাণ্ডিত্য, তার নিরলস অধ্যবসায়—অর্জিত প্রজ্ঞা তথা দর্শন, আইন, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, নৃতত্ত্ব, সমাজ-বিজ্ঞান, ভারততত্ত্ব সহ বিচিত্র বিষয়ে সাবলীল বিচরণ ও গভীর পর্যবেক্ষণ তাঁকে, যে কোন যথার্থ শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষের কাছেই, শ্রদ্ধার পাত্র করে তুলেছে।

এই বিশাল মনীষীর ব্যক্তিত্ব বিধৃত হয়ে আছে তাঁর রচনাবলীর মধ্যে। যেখানে বিভিন্ন বিষয়ে ভাষণ সহ নানা ক্ষেত্রের প্রাথমিক উপস্থাপনার[১] সূত্রে তাঁর রচিত যে অজস্র প্রবন্ধাদি তা আজও সব সংকলিত হয়নি। আর যা সংকলিত হয়েছে—এখানে তারও পূর্ণাঙ্গ প্রাজ্ঞ-পরিচিতি প্রকাশের পরিকল্পনা আমাদের নেই।

১। যেমন গোটা সংবিধানের যে বিশাল উপস্থাপনা—প্রথমতঃ তিনিই তা করেছিলেন তাঁর প্রবাদ-প্রতীম দক্ষতায় ও পাণ্ডিত্যে পরে গণ পরিষদের তথা তৎকালীন রাজনৈতিক ক্ষমতাধরদের ইচ্ছায় অনিচ্ছায় তা গ্রহণ বর্জন হয়েছে—কিন্তু ভারতবর্ষ এই একক মানুষের পাণ্ডিত্যে সেদিন বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হয়েছিল।

CENTRAL LIBRARY

আমরা কেবল তাঁর বিশিষ্ট রচনা গুলির খুব সংক্ষিপ্ত একটা নাম-পরিচিতি মাত্র এখানে তুলে ধরেছি। কারণ তাতে অগণিত সাধারণ পাঠক অন্ততঃ তাঁর মূল্যবান রচনা গুলির বিষয়ে জানতে পারবেন এবং তরুণ প্রজন্ম, যারা তাকে জানতে চান—এর দ্বারা তারাও উপকৃত ও অনুপ্রাণিত হবেন বলে আমাদের বিশ্বাস।

★ ★ ★

তবে বিতর্কিত অথবা ভ্রান্ত-তথ্য-উৎসের জন্য যদি কোন ত্রুটি থেকে যায় তার জন্য যেমন আমরা ক্ষমা প্রার্থী, তেমনি সুধী পাঠক বর্গের প্রতি অনুরোধ তারা যেন সে সব ত্রুটি সংশোধনের জন্য তাদের লিখিত অভিমত আমাদেরকে অনুগ্রহ করে জানান। যা পরবর্তী সময়ে সাহায্য করবে সঠিক-বিষয় ও তথ্য উপস্থাপনে। গ্রন্থ পরিচিতির সূত্রে আমরা গভীর ভাবে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি—

(ক) মহারাষ্ট্র সরকারের শিক্ষা বিভাগের প্রতি, তাদের প্রকাশিত (—Dr. Babasaheb Ambedkar : Writings and Speeches :—Compiled by Vasant Moon : 1982—1991)—১০ খণ্ড রচনাবলীর জন্য। এক্ষেত্রে তাঁরা অভিনন্দন যোগ্য কাজ করেছেন।

(খ) এ ছাড়া বিভিন্ন তথ্য, অভিমত ও ধারণা তৈরীর জন্য প্রখ্যাত আম্বেদকর-জীবনীকার ধনঞ্জয় কীরের (1) Dr. Ambedkar ; Life and Misson— 1990, (2) Dr. Bhim Rao Ambedkar : His life and work—by M, L, Shahare (NCERT—1988). (3) Dr. Babasaheb Ambedkar and •significance of his movement : A Chronology—Compiled and Edited—by K. N. Kadam—সহ সম্প্রতি কালে পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত রচনাদিরও সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

গ্রন্থ পরিচিতির জন্য আমরা যাঁদের কাছে সরাসরি সাহায্য ও সহযোগিতা পেয়েছি তাদের মধ্যে বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি বিশিষ্ট আম্বেদকর অনুরাগী শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মণ্ডল (এডভোকেট), রবীন্দ্র ভারতীর প্রাক্তন সহকারী কিউরেটর—শ্রীশিশির মুখার্জী, শ্রী জ্যোতি দত্ত ও ড. মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় সহ অন্যান্য শ্রদ্ধেয় বন্ধুদের প্রতি।

—নীতীশ বিশ্বাস

CENTRAL LIBRARY

1915 □ Castes in India : Their Mechanism, Genesis and Development—**ভারতে জাতিভেদ প্রথা প্রসঙ্গে** এ আলোচনায় ড. আম্বেদকর প্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষে যে সামাজিক বিধি-ব্যবস্থা ও শাস্ত্রীয় অনুশাসনাদি প্রচলিত আছে তার বিশ্লেষণ করেছেন। নারীপুরুষের অবস্থান, বিবাহ-বিধি, জাত-পাত ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনায় তিনি প্রাজ্ঞ নৃতাত্ত্বিকের দৃষ্টি গ্রহণ করেছেন। □ কলোম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবন্ধটি তিনি প্রথম পাঠ করেন। Indian Antiquity পত্রিকায় পরে এটি মুদ্রিত হয়। বর্তমানে রচনাবলীর [২] ১ম খণ্ডে স্থান পেয়েছে।

1917 □ The National Dividend of India : A Historical and Analytical Study □ এটি কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে Ph. D-র জন্য উপস্থাপিত আম্বেদকরের গবেষণা-সন্দর্ভ। **জাতীয় লভ্যাংশ** বিষয়ক এ সন্দর্ভটি প্রথম প্রকাশিত হয় Evolution of Provincial Finance in British India নামে ১৯২৫ সালে লণ্ডনে। বর্তমানে রচনাবলীর ৬ষ্ঠ খণ্ডে সঙ্কলিত হয়েছে।

1918 □ Small Holdings in India and Their Remedies □ **ভারতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূখণ্ড** বিষয়ক-সমস্যার মূল নিহিত সমাজের ভ্রান্ত আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায়। যার ফলে এই সব জমিজমা সংহত করা ও সু-সংরক্ষণ করা বিরাট এক সমস্যা। লেখকের মতে এই সব ভূখণ্ড সংহত করে ও কৃষি-ব্যবস্থার শিল্পায়ণের মাধ্যমেই এইসব সমস্যার সমাধান সম্ভব।

□ A Review of Bertrand Russells' Principles of Social Reconstruction □ মহামতি রাসেলের সমাজ পুনর্গঠনের শর্তাদি বিষয়ে আম্বেদকরের মূল্যবান সমালোচনা। রচনাবলীর ১ম খণ্ডে সংকলিত।

1919 □ A Statement Submitted to Southborough Committee on Franchise (নির্বাচন নীতি বিষয়ক সাউথ বরো কমিটিতে প্রদত্ত সাক্ষ্য)। এই সাক্ষ্য উপস্থাপনে লেখক দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন যে—'জনপ্রিয় সরকার গঠনের ভিত্তিভূমি যে নির্বাচনী নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত—সেই নীতি, কংগ্রেসের বৈষম্যমূলক আচরণে পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে পড়েছে, যার ফলে বর্ণ হিন্দুর প্রতিনিধিরা দুর্বল শ্রেণীর লোকেদের অবদমিত করে রাখছে'—এই

২। এখানে রচনাবলী বলতে "মহারাষ্ট্র সরকার-প্রকাশিত" Dr. Babasaheb Ambedkar : Writings and speeches (2nd Edition) 1990 বোঝানো হয়েছে।

পটভূমিকায় নিপীড়িত শ্রেণীর জনসংখ্যার ভিত্তিতে সংরক্ষিত আসনের দাবি জানিয়ে লর্ড সাউথ বরোর সভাপতিত্বে গঠিত নির্বাচনী নীতি নির্ধারক কমিটির সামনে ড. আম্বেদকর যে ভাষণ দেন—আলোচ্য গ্রন্থে তা স্থান পেয়েছে। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার রক্ষার জন্য মুসলীম লীগ ও শিখ সম্প্রদায় যে সুযোগ পেয়েছে, এ তারই অনুরূপ এক দাবি মাত্র বলে তিনি উল্লেখ করেছেন।

1922 □ The Problem of the Rupee : **টাকার সমস্যা** বিষয়ক এই আলোচনাই আম্বেদকরের D. Sc ডিগ্রীর গবেষণা সন্দর্ভ। লণ্ডনে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২৭ সালে। পরে Indian Currency and Banking (vol—1) নামে এটি ১৯৪৭ সালে বোম্বে থেকে প্রকাশিত হয়। বর্তমানে রচনাবলীর ৬ষ্ঠ খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত।

1936 □ Annihilation of Caste : **জাতপাত প্রথার বিলুপ্তি** বিষয়ে আম্বেদকরের এই মূল্যবান গ্রন্থ—(১) Mahatma Ganadhi's Vindication of Caste (মহাত্মা গান্ধীর জাতি বিদ্বেষ মূলক মনোভাব) এবং (২) Reply to Mahatma' (মহাত্মার প্রতি উত্তর) এই দুটি প্রবন্ধ সহযোগে ১৯৩৭ সালে পুনরায় প্রকাশিত হয়।

বিভিন্ন জাতির ইতিহাস বিশ্লেষণ করে এবং ভারতীয় অভিজ্ঞতায় আম্বেদকর দেখিয়েছেন যে জাতিভেদ প্রথা তথা বর্ণ বৈষম্য কেবলমাত্র শ্রম বিভাজন নয়, এই ব্যবস্থা শ্রমিককেও বিভক্ত করে রেখেছে এবং ভারতীয় অর্থ নীতিতে বহুতর জটিলতা সৃষ্টি করেছে। আর সমাজে বিদ্যমান বর্ণাশ্রম, অস্পৃশ্যতা, অসমতা, বিভেদ, শোষণ ও বঞ্চনা—ভারতীয় জাতীয় ঐক্যকে ভিতর থেকে আঘাত করেছে। তাই তিনি এই প্রথা রোধে উচ্চবর্ণের মানুষের হৃদয়ের পরিবর্তন, অসবর্ণ বিবাহ, পংক্তি ভোজনের মতো কিছু বিষয়ের প্রবর্তনের কথা বলে অবশেষে আহবান জানিয়েছেন —বৈষম্য হীন গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার।

1939 □ Federation Verses Freedom : **সংঘ বনাম স্বাধীনতা** শিরোনামের এই ভাষণটি তিনি স্বাধীন ভারতের প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো সম্পর্কে, দেশীয় রাজ্য সমেত ভারতীয় ফেডারেশন গঠনের যে পরিকল্পনা হয়েছিল, সে সম্পর্কে ১৯৩৯ সালের জানুয়ারী মাসে বোম্বে গোখেল ইনসটিটিউটের একসভায় প্রদান করেন। যাতে তিনি দেশীয় রাজ্যগুলিকে ভারতে অঙ্গীভুত হবার প্রস্তাব দেন।

1940 □ Thoughts on Pakistan : গ্রন্থটি দেশবিভাগের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর **পাকিস্তান প্রস্তাব বিষয়** আলোচনা। এটিকে তখনকার দিনে গান্ধীজি এবং জিন্না সাহেবও সবচেয়ে প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে স্বীকার করতেন। সাম্প্রদায়িক

CENTRAL LIBRARY

পরিস্থিতি, দ্বিজাতিতত্ত্ব, ভারত বিভাজনের পক্ষে ও বিপক্ষে বিভিন্ন মতামত —উক্ত বিভাজনের সম্ভাব্য ফলাফল নিয়ে গবেষকের দৃষ্টিতে আম্বেদকর আলোচনা করেছেন। গ্রন্থটি ১৯৪৫ সালে Pakistan or the Partition of India **পাকিস্তান অথবা ভারত বিভাগ** নামে বোম্বে থেকে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি রচনাবলীর ৮ম খণ্ডে বিধৃত।

1942 ☐ Problems of Scheduled Castes (**তফশিলী জাতি সমূহের সমস্যা**) তবে (১৯৪৩-এ বোম্বে থেকে **গ্রন্থাকারে** প্রকাশের সময়) পরিবর্তিত নাম ছিল Gandhi and the Emancipation of Untouchables (গান্ধীও অস্পৃশ্যদের মুক্তি)। প্রথমে প্রবন্ধটি পাঠ করা হয় উত্তর আমেরিকার কুইবেকে (Quebec)-এর Mont Tremblant-এ অনুষ্ঠিত Institution of Pacific Relations' এর একটি সম্মেলনে ১৯৪২ সালে। গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল, জাতিতে জাতিতে নিষ্ঠুরতা, মানুষে মানুষে অমানুষিক জাতি বিদ্বেষ-বিষয়ক সমস্যা ও তার সমাধানের পথ। এরই পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দুসমাজের জাতিভেদ, বর্ণ-বৈষম্যর অস্পৃশ্যতার সমস্যা ও তাদের মুক্তির বিষয় আলোচ্য প্রবন্ধে স্থান পেয়েছে। এই ভয়াবহ অবস্থা সম্বন্ধে বহির্বিশ্বকে অবহিত করাই এই সমাজ সংস্কারক প্রাবন্ধিকের উদ্দেশ্য। লেখকের ভাষায়, 'গোড়া হিন্দুদের মতে অস্পৃশ্যদের কোন অধিকার অর্জনেরই অধিকার নেই, কারণ হিন্দু সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠার কোনও অভিপ্রায় নেই। বর্ণ হিন্দুদের মতে অস্পৃশ্যতা কোনও নৈতিক বা সামাজিক অপরাধ নয়।' প্রসঙ্গত এ প্রবন্ধেও আম্বেদকর বলেছেন, 'গান্ধী ও তাঁর কংগ্রেসের আন্দোলন জনগণের স্বাধীনতার জন্যে নয়, রাজ্য শাসন কুক্ষিগত করার জন্যে।' গান্ধীর উদ্দেশ্য হিন্দু ও হিন্দুত্বের জন্য ভারতকে নিরাপদ রাখা। তাঁর মনে অস্পৃশ্যদের জন্যে চাকুরিতে আসন সংরক্ষণ, শিক্ষার সুযোগ—ইত্যাদি বিষয়গুলি কখনোই স্থান পায় নি।

1943 ☐ Ranade, Gandhi and Jinnah : **রানাডে, গান্ধী এবং জিন্নাহ'** নামক গ্রন্থটি আসলে ১৯৪৩ সালের জানুয়ারী মাসে বিশিষ্ট সমাজ সংস্কারক বিচারপতি রানাডের জন্মের ১০১তম জন্ম বার্ষিকীতে প্রদত্ত ভাষণ। ঐ বছর এপ্রিল মাসেই এটি বোম্বে থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। অন্ধ ধর্ম বিশ্বাস ও সমাজ আনুগত্যের নামে যে শোষণ ও নিষ্পেষণ সমাজে প্রচলিত, তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন যিনি—সেই রানাডের স্মৃতি সভায় দাঁড়িয়ে আম্বেদকরের এই ভাষণে প্রকাশিত হয়েছে তৎকালীন রাজনীতির এক বিশিষ্ট চিত্র। যেসব অজ্ঞ মানুষ অস্পৃশ্যতার শিকার, তাদের কথা না বলে, এখানে লেখক আক্রমণ করেছেন সমস্ত হিন্দু সমাজ ও তার

বিদগ্ধ পণ্ডিত মণ্ডলীকে ; যারা অস্পৃশ্যতা, বর্ণবৈষম্যকে 'আদর্শ ব্যবস্থা' হিসেবে প্রশংসা ক'রে জাতিভেদ প্রথাকে সুদৃঢ় করতে সক্রিয়। অর্থাৎ ভ্রষ্ট আদর্শবাদের বিরুদ্ধে তার মানবিক সংগ্রামের বাণী এখানে উচ্চারিত হয়েছে। এ সঙ্গেই এসেছে স্বৈরাচারী সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতাপে বিপন্ন আদর্শবান সংখ্যালঘু মানুষের বাঁচবার সমস্যা ও তার মুক্তির উপায় প্রসঙ্গ।

1945 ☐ What Congress and Gandhi have done to the Untouchables ? (**অস্পৃশ্যদের জন্য গান্ধী ও কংগ্রেস কি করেছে ?**)

সমকালীন রাজনীতি প্রেক্ষাপটে এ গ্রন্থে আম্বেদকর অস্পৃশ্য তথা ভারতের পদদলিত মানুষের স্বার্থে কংগ্রেস ও গান্ধীজী কি করেছেন—কতটা তারা আন্তরিক ছিলেন অথবা কতটাই বা ভণ্ডামী, ইত্যাদি বিষয়ে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছেন। তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন গান্ধীজীর চেষ্টায় অস্পৃশ্যতা বিষয়টি প্রচার পেয়েছে, কিন্তু এ সমস্যা সমাধানে কংগ্রেসের কোন আন্তরিক ইচ্ছা ছিল না। তাই কংগ্রেস ও গান্ধীজী মুসলমান ও শিখদের জন্যে পৃথক নির্বাচনের দাবি সমর্থন করলেও নিম্নশ্রেণীর জন্য আলাদা নির্বাচনের দাবি তারা মানেন নি। তাই ড. আম্বেদকর এদের জন্যে রাজনৈতিক অধিকারের দাবি করেন। গান্ধীজী নিম্নশ্রেণীর স্বার্থের বিরুদ্ধেও সংগ্রাম করেছেন। আরো বহু প্রয়োজনে অনেকে সত্যাগ্রহ করলেও অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে কাউকে যে সত্যাগ্রহ করতে দেখা যায় নি,—এইসব তথ্যে এই গ্রন্থ সমৃদ্ধ।

১৯৩৭ সালের নির্বাচনের ফলাফল বিকৃতভাবে কংগ্রেস দেখায় এবং সকল শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বের দাবি করে। আম্বেদকরের মতে, যার কোনও সঙ্গত ভিত্তি ছিল না। গান্ধীজী ও কংগ্রেস কিভাবে নিম্নশ্রেণীর মুক্তি আন্দোলনে ও সমাজ সংস্কারের প্রচেষ্টায় পদে পদে বাধার সৃষ্টি করেছে, তাও তিনি এখানে দেখিয়েছেন। গ্রন্থটি রচনাবলীর ৯ম খণ্ডে স্থান পেয়েছে।

1945 ☐ The Communal Deadlock : A Way to Solve It ; (**সাম্প্রদায়িক অচলাবস্থা ও তার সমাধানের একটি উপায়**)।

ভারতের সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান সূত্র হিসেবে এই গ্রন্থের প্রাসঙ্গিকতা তদানীন্তন কালে এক মূল্যবান অধ্যায়। ১৯৪৫ এর জাতিগত হাঙ্গামার সময়ে প্রকাশিত এই বই-য়ে আম্বেদকরের মতামত হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের জন্যই ছিল একটি আদর্শ প্রস্তাব। তফসিলী জাতির পক্ষ থেকে উত্থাপিত তাঁর এই প্রস্তাব রাজনৈতিক ক্ষমতার ওপর এক ধরণের ভারসাম্য বজায় রাখা বা 'চেক ও ব্যালান্স নীতি' প্রয়োগ করে ভারতকে অখণ্ড রাখার একটি উল্লেখযোগ্য

প্রয়াস। স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স্‌ ও স্যার তেজ বাহাদুর সপ্রুর দুটি প্রস্তাব যাচাই করে তাঁর মনে হয়েছিল, সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে উভয় প্রস্তাব সাম্প্রদায়িক সমস্যাকে জিইয়ে রাখতে সাহায্য করবে। এই বইয়ে তিনি আরও জানান, ভারতে সংখ্যাগুরুদল সাম্প্রদায়িক এবং তাদের রাজনৈতিক দলে পরিণত হবার সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ। তিনি মনে করেছিলেন, তাঁর প্রস্তাবিত নীতি প্রয়োগের ফলে পাকিস্থানে মুসলমানেরা তাঁদের নিজেদের স্বার্থেই সেখানকার অমুসলমানেদের স্বার্থ রক্ষা করবে, আবার বিভক্ত ভারতে, অমুসলমানেরাও নিজেদের স্বার্থে একই ভাবে মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষা করবে। এটাই তাঁর 'চেক ও ব্যালান্স' নীতির মূল কথা এবং আম্বেদকরের মতে সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের প্রকৃত উপায়।

1946 ▫ **Who were the Shudras ? How they came to be the Fourth varna in the Indo-Aryan Society—শূদ্রকারা ? কিভাবে তারা ইন্দো-আর্য সমাজে চতুর্থ-বর্ণে পরিণত হল**—ইত্যাদি বিষয়ে এ আলোচনা গ্রন্থ আম্বেদকরের নিরলস পরিশ্রম ও মেধার ফসল। প্রাচীন শাস্ত্রাদি তথা বেদ পুরাণের অতলে অবগাহন করে তিনি এর জন্য তথ্য সন্ধান করেছেন। এবং দেখিয়েছেন যে পূর্বে চতুর্থ বর্ণ ছিল না। শূদ্র নামে আজ যাঁরা পরিচিত তারা ক্ষত্রিয়েরই অংশ। তিনি প্রাচীন কাহিনী তুলে দেখিয়েছেন এক সময় সূর্যরাজবংশ ও ব্রাহ্মণদের মধ্যে দীর্ঘকাল ব্যাপী সংগ্রাম হয়, যার ফলে ব্রাহ্মণেরা নানাভাবে নির্যাতিত ও অপমাণিত হয়। তারই প্রতিবাদে ব্রাহ্মণেরা শূদ্রদের উপনয়ন ইত্যাদি অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করতে অস্বীকার করে এই অস্বীকারের ফলে শূদ্ররা ক্ষত্রিয় গোষ্ঠীচ্যুত হয়ে চতুর্থ বর্ণে পরিণত হয়। ▫ রচনাবলীর সপ্তম খণ্ডে সংকলিত।

1947 ▫ **States and Minorities : রাষ্ট্র ও তার সখ্যালঘু সম্প্রদায়** শীর্ষক গ্রন্থটি মূলতঃ একটি দাবিপত্র। নিখিল ভারত তফসিলী জাতির পক্ষ থেকে তাদের রাজনৈতিক অধিকার রক্ষার দাবিতে তিনি গণপরিষদের নিকট ১৯৪৬ সালে এটি পেশ করেন। আর ১৯৪৭ এর মার্চেই এটি প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এখন রচনাবলীর ১ম খণ্ডে স্থান পেয়েছে। ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক অধিকার, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার রক্ষার দায়িত্ব এবং বিধানসভা ও স্থানীয় সভাসমিতিতে তফসিলী জাতির প্রতিনিধিত্ব ইত্যাদি বিষয়ে এই বইয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এর উপমাগুলি তিনি সংগ্রহ করেন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রহ্মদেশ সহ বিভিন্ন দেশ থেকে। অর্থনৈতিক শোষণ, সামাজিক উৎপীড়ন, দারিদ্র্য ও বঞ্চনার হাত থেকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের রক্ষা-কবচের উল্লেখ এই রচনায় আছে। আর আছে এ সমস্যার প্রতিকার লেখকের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব।

1948 □ The Untouchables : Who were they and why they became Untouchables (**অস্পৃশ্য কারা, কেমন ক'রে তারা অস্পৃশ্য হল** ?) এ গ্রন্থটি লেখকের বিশিষ্ট রচনা 'শূদ্র কারা' এ বিষয়ক আলোচনারই পরিশিষ্ট অংশ। যদিও এখানে সব মিলিয়ে উপস্থাপিত হয়েছে ভারতের বিচিত্র অস্পৃশ্যতা-সমস্যার এক গবেষণামূলক মৌলিক ও পূর্ণাঙ্গ আলোচনা। অস্পৃশ্যতা প্রবর্তনের পূর্বে হিন্দু ও অস্পৃশ্যদের মধ্যে কোনও পার্থক্য ছিল না। আদিম অবস্থায় কিছু গোষ্ঠী-বিচ্যুত মানুষের গো-মাংস ভক্ষণ-জাত স্বভাবের ফলে এবং ব্রাহ্মণদের শত্রুতা, বিদ্বেষের ফলে যে অস্পৃশ্য-সমাজের উদ্ভব,—তারই ব্যাখ্যা এই বইয়ের প্রতিপাদ্য বিষয়। লেখক দেখিয়েছেন অস্পৃশ্য মানুষ ও অপবিত্র মানুষ এক নয়। অপবিত্র মানুষের অস্তিত্ব ধর্মশাস্ত্রের পাতায় পাওয়া গেলেও অস্পৃশ্য মানুষের আবির্ভাব খ্রীষ্টপূর্ব চারশো শতাব্দীতে এবং চতুর্বর্ণের প্রভাবে।

1948 □ Maharastra as a Linguistic Province : **ভাষাভিত্তিক প্রদেশ হিসেবে মহারাষ্ট্র**—নামক এ রচনাটি ভাষাভিত্তিক রাজ্য বা প্রদেশ গঠন বিষয়ক কমিশনের নিকট আম্বেদকরের প্রস্তাব মূলক বিবৃতি। যেখানে তিনি বোম্বে পৌর এলাকাকে মহারাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত রাখার পক্ষে তার যুক্তি মালা উপস্থিত করেছেন। যদিও তিনি ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছেন—তবুও এর ফলে জনগণের মধ্যে পৃথক জাতি সত্তার ধারণা যে জন্মাতে পারে তার প্রসঙ্গেও সতর্ক করেছেন।

1950 □ The Buddha and the Future of his Religion **বুদ্ধ ও তাঁর ধর্মমতের ভবিষ্যৎ** বিষয়ক প্রবন্ধটি রচিত হয়, কলকাতা থেকে প্রকাশিত মহাবোধি পত্রিকার ১৯৫০ সালের বৈশাখী সংখ্যার জন্য।

এই প্রসঙ্গে আম্বেদকরের লেখা বুদ্ধও তার ধম্ম (The Buddha and His Dhamma) শিরোনামের গ্রন্থটির কথা বলা দরকার। তার মৃত্যুর পর ১৯৫৭ সালে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। বুদ্ধের জীবন ও তার শিক্ষা বিষয়ক এ গ্রন্থে আম্বেদকর কেবল ভক্তিবাদীর চোখে নয় যুক্তিবাদীর দৃষ্টিতেই বুদ্ধকে বিচার ও গ্রহণ করেছেন।

1951 □ The Rise and Fall of the Hindu Woman—who is Responsible ? : **হিন্দু নারীদের উত্থান ও পতন এবং পতনের জন্য কারা দায়ী** বিষয় নিবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয় কলকাতার মহাবোধি পত্রিকার ১৯৫১ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায়। ২১-১-১৯৫০ তারিখে 'ইভস্ উইকলি' তে আম্বেদকরকে নিয়ে যে সব বিষয় লেখা হয়েছে—তার প্রত্যুত্তর দিতেই লেখাটির সূচনা। একাজের জন্য আম্বেদকরকে সমস্যার গভীরে প্রবেশ করতে হয়। শেষাংশে তিনি এ প্রসঙ্গে বুদ্ধের নির্দেশিত পথের কথাও উল্লেখ করেছেন।

CENTRAL LIBRARY

রচনাবলীতে সংকলিত অন্যান্য রচনা

১৯৭৯ থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত মহারাষ্ট্র সরকার প্রকাশিত মোট ১০ খণ্ড রচনাবলীর মধ্যে সংকলিত আরো কয়েকটি বিশিষ্ট রচনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে রাখা হল, যা আগে আলোচিত হয়নি।

প্রথম খণ্ড : এখানে সংকলিত বিষয়গুলি—(1) Dr. Ambedkar in the Bombay Legistature (বোম্বে বিধান সভায় ড. আম্বেদ করের বিভিন্ন ভাষণ)। (2) Dr. Ambedkar with the Simon Comission (Indian Statutory comission) (সাইমন কমিশনে ড. আম্বেদকর)। (3) Dr Ambedkar at the Round table Conferences. (গোল টেবিল বৈঠকে আম্বেদকর)

১৯২৭ সাল থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত বোম্বাই আইন সভা, সাইমন কমিশন, লোথিয়ান কমিটির সদস্য হিসাবে বিভিন্ন বিষয়ে প্রদত্ত তাঁর ভাষণে সমৃদ্ধ ধারাবিবরণী এই বইয়ে বর্ণিত। এ ছাড়া গোল টেবিল বৈঠকের সদস্য হিসাবেও তাঁর ভাষণ এতে আছে, যেখানে নিম্নশ্রেণীর মানুষের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ ও সামাজিক রীতিনীতির বিরুদ্ধে তার সুস্পষ্ট বক্তব্য আছে, যার প্রতিকারের জন্য রাজনৈতিক অধিকার, আসন সংরক্ষণ, পৃথক নির্বাচন ইত্যাদি দাবিও তিনি করেন। যদিও সরকার তা গ্রাহ্য করে নি। যার ফলস্বরূপ সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সৃষ্টি এবং গান্ধীজীর অনশন। অবশেষে পুণা চুক্তিতে আপস-রফা। পৃথক নির্বাচনের পরিবর্তে যুক্ত নির্বাচনের সিদ্ধান্ত। ড. আম্বেদকর আলোচ্য বইতে বলেছেন, ন্যায় বিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত আন্তরিক মনোভাবই একটি জাতিকে একত্রিত রাখতে পারে—কেবল আইন দিয়ে যা কখনো হয় না।

তৃতীয় খণ্ড : এই খণ্ডে এমন কতকগুলো রচনা সংকলিত হয়েছে—যা পূর্বে কোথাও প্রকাশিত হয়নি। এমনকি আশংকা ছিলো এসব রচনা হয়তো ধ্বংস হয়ে গেছে। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে এমন আরো অনেক বিষয়ে যে সম্পর্কে আলোচনা করবার বা সন্দর্ভ রচনার পরিকল্পনা তিনি নিয়েছিলেন। তবে তার জীবন কালে তা তিনি সম্পূর্ণ করে যেতে পারেননি। এখণ্ডের মূল আলোচ্য (১) "হিন্দু ধর্মের দর্শন" The Philosopy of Hindusim ও প্রসঙ্গক্রমে আরো কিছু বিষয়। হিন্দু

CENTRAL LIBRARY

ধর্ম বিষয়ে তার আলোচনায় এখানে ভক্তিবাদীর মনোভাব নয়, যুক্তি-বাদীর দৃষ্টিই প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর মতে প্রকৃত ধর্ম কোন সমাজে বিভেদও বিদ্বেষ ছড়ায় না ; বরঞ্চ মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টির জন্য পটভূমিকা তৈরি করে। যা হিন্দু ধর্ম হারিয়েছে। ফলে অন্ধ ধর্মীয় অনুশাসনে ক্ষতবিক্ষত জাতি তার জাতীয় সংহতির ভিত্তি দৃঢ়মূল করতে পারছেনা।

এইখণ্ডে সংযোজিত আলোচনা ও আলোচনার খসড়া পরিকল্পনা গুলির উপশিরোনাম গুলি হল—

(২) হিন্দু সমাজ-ব্যবস্থা প্রয়োজনীয় নীতি (৩) হিন্দু সমাজ ব্যবস্থা-বিশিষ্ট লক্ষণ (৪) হিন্দু ধর্মের প্রতীক (৫) প্রাচীন ভারতের পুনঃপ্রকাশ (৬) আর্য সমাজ-ব্যবস্থার প্রাচীন যুগ (৭) অপসৃয় মান পুরোহিততন্ত্র (৮) সমাজ সংস্কারক ও তাঁদের ভাগ্য (৯) বৌদ্ধ ধর্মের পতন ও ক্ষয় (১০) ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সাহিত্য (১১) ব্রাহ্মণ্য ধর্মের জয় (১২) মনুস্মৃতি বা প্রতি বিপ্লবের নীতি (১৩) কৃষ্ণ ও গীতা—প্রতি বিপ্লবের দার্শনিক রক্ষাকবচ (১৪) বিরাট পর্ব ও উদ্যোগ পর্বের বিশ্লেষণ (১৫) ব্রাহ্মণ বনাম ক্ষত্রিয় (১৬) শূদ্র ও প্রতি বিপ্লব (১৭) স্ত্রীজাতি ও প্রতি বিপ্লব (১৮) বুদ্ধ অথবা কার্ল মার্কস

(১৯) বিভিন্ন গ্রন্থ রচনার পরিকল্পনা।

চতুর্থ খণ্ড □ Riddles in Hinduism :An Exposition to Enlighten the Masses. **হিন্দু ধর্মের প্রহেলিকা** শিরোনামের আলোচনা মূলক গ্রন্থটিই চতুর্থ খণ্ডে সংকলিত। ২৭টি অধ্যায় নিয়ে গ্রন্থটি প্রথমে সংহত ছিলো। রচনাবলীতে সংযুক্ত করায় সময় তার সঙ্গে আরো কিছু যুক্ত করে মোট সংখ্যা হয়েছে—৩২ টি। এখানে লেখক—'হিন্দু ধর্মের বিধান যে সনাতন, অভ্রান্ত, সমস্ত সমালোচনার উর্ধ্বে, তা মানুষের বিচার বুদ্ধি দিয়ে পরীক্ষা না করেই অন্ধভাবে মানতে হবে—' এই সব অবৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের প্রতি তিনি চরম সমালোচনা মূলক প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। প্রাচীন গ্রন্থাদিথেকে তার যুক্তির সমর্থনে তিনি আহরণ করেছেন—বিভিন্ন ঘটনা, চরিত্র, শ্বাশ্বত (?) বাণী—এবং আপন প্রজ্ঞা ও উপলব্ধির শানিত অস্ত্রে তীব্র তির্যক আক্রমণ হেনেছেন। বলেছেন মানুষের প্রয়োজনে ধর্মের সৃষ্টি ধর্মের জন্য মানুষের সৃষ্টি হয়নি।

পঞ্চম খণ্ড □ এই খণ্ডে মূলতঃ বিধৃত হয়েছে তাঁর **অস্পৃশ্যতা** বিষয়ক লেখাগুলি। প্রথম রচনাটি Untouchables or the Children of

Iudian Ghetto."। এই গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে ভারতের নিগৃহীত মানুষের উপর উচ্চবর্ণের মানুষের যুগ যুগ ব্যাপী অত্যাচার ও নিপীড়নের ইতিহাস। প্রসঙ্গক্রমে ইহুদিদের উপর অবিচার ও অত্যাচারের কথাও এসেছে। অন্যান্য রচনায় বলা হয়েছে—জন্মগত কারণে একবার যে অস্পৃশ্য চিরকালই সে অস্পৃশ্য—এই ধারণায় সমস্ত সমাজ প্রভাবিত। এছাড়া অস্পৃশ্যদের সমস্যা, তার প্রতিকারের প্রকৃত উপায়—অত্যাচারী হিন্দুদের সামাজিক অবস্থান ও তাদের মানসিক পরিবর্তন ইত্যাদি বিষয়ে লেখকের বক্তব্য এখানে সংকলিত হয়েছে।

দশম খন্ড ঃ বৃটিশ ভারতে ভাইসরয়ের Executive Conucil এর শ্রম-সদস্য হিসাবে তথা শ্রম মন্ত্রী থাকার সময় ড. আম্বেদকরের আইন সভার ভিতরে ও বাইরের যেসব ভাষণাদি প্রদান করেন—প্রদত্ত সেই সম্ভাষণ গুলিই এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। নারী শ্রমিক সহ শ্রমিকদের কল্যাণ, তাদের সামাজিক নিরাপত্তা, শিল্পের প্রসার ইত্যাদির জন্য নানাবিধ আইন প্রণয়ন করে নারী শ্রমিকসহ শ্রমিক ও শিল্প জগতে বহু পরিবর্তন তিনি এসময়-সাধন করেন। বেকার সমস্যা, বন্যা—নিয়ন্ত্রণ, জলসেচ, জলনিষ্কাসন ইত্যাদি সমস্যাও তাঁর আলোচিত প্রবন্ধে উৎকীর্ণ। যার সমাধানের চেষ্টার মধ্যে ড. আম্বেদকরের দেশাত্মবোধক প্রাণের উজ্জ্বল স্বাক্ষর বর্তমান।

এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না—যে ড. আম্বেদকর শ্রম বিভাগের দায়িত্বে থাকার সময়ে ও পরবর্তীকালে তাঁর চেষ্টা ও উদ্যোগে বেশ কয়েকটি শ্রমিক-কল্যাণ মূলক বিল পাশ হয়। যার ফলে নিম্নে উল্লেখিত আইনগত সুবিধাগুলি শ্রমিকশ্রেণী লাভ করে।

(১) চাকুরীরতা গর্ভবতী মেয়েদের জন্য ৪৬ সপ্তাহের ছুটি।
(২) কয়লা শ্রমিকদের শিক্ষা, গৃহ নির্মাণসহ অন্যান্য বিষয়ে সাহায্য।
(৩) Employment Exchange ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা।
(৪) শিল্প ও কারখানা শ্রমিকদের ৮ ঘণ্টা কাজের স্বীকৃতি ও স-বেতন ছুটির ব্যবস্থা।
(৫) Trade Union—অধিকার স্বীকৃতি।
(৬) শ্রমিকের মৃত্যুর পর বা আহত হলে পরিবারকে এককালীন অনুদানের ব্যবস্থা।
(৭) শ্রমিকদের ন্যূনতম বেতন স্থিরীকরণ—ইত্যাদি।

CENTRAL LIBRARY

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত
ড. আম্বেদকর শতবর্ষ সেমিনার—১৯৯২

আম্বেদকর শতবর্ষের আলোকে কেন্দ্রের ভি. পি. সিং সরকার সারা দেশে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণের প্রস্তুতি করেন। নরসিংহ রাও সরকারও তার সূত্র ধরে অনেক কিছু করছেন। যদিও কতটা করা প্রয়োজন ছিলো—কতটা করা হয়েছে ইত্যাদি বির্তকে নাগিয়েও বলতে পারি সারা দেশে বিষয়টি আলোড়ন তুলেছে। এজন্য রেডিও, টি. ভি. র প্রচার সহ বিভিন্ন রাজ্য সরকারের নানা প্রচেষ্টাও যুক্ত হয়েছে। এ উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকার নানা স্তরে অনেক প্রোগ্রাম করেছেন। বেসরকারী উদ্যোগে ও নানা অনুষ্ঠান হয়েছে। বিশেষ করে নানাস্তরের কর্মচারী মহলে আম্বেদকর চর্চার একটা প্রবাহ সৃষ্টি হয়েছে।

আমরা সে-সব সমীক্ষার মধ্যে না গিয়ে, কেবল ভারতের ঐতিহ্যশালী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-আয়োজিত ১৯৯২ সালে ৩০ ও ৩১ শে মার্চ,-এর আলোচনাচক্রটির একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন এখানে প্রকাশ করছি। যার মাধ্যমে, পশ্চিমবঙ্গের বুদ্ধিজীবীরা বিষয়টিকে কিভাবে দেখছেন, তার সামান্য প্রতি ফলন পাঠকেরা পাবেন। যাকে অবশ্যই শিশির বিন্দুতে সূর্যের প্রতিফলনের সঙ্গেই মাত্র তুলনা করা যায়।

বিনীত—ঐকতান সম্পাদক

ভারতরত্ন ড. বি. আর. আম্বেদকরের জন্মশতবর্ষে 'অ্যাসোসিয়েশন অব ইণ্ডিয়ান ইউনিভার্সিটিস-এর সহযোগিতায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গত ৩০ ও ৩১ শে মার্চ, ১৯৯২, আয়োজন করে এক বিশেষ আলোচনা চক্রের। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শতবর্ষ ভবনে অনুষ্ঠিত এই দুই দিন ব্যাপী সেমিনারে **ড. আম্বেদকরের সমাজ দর্শন** বিষয়ে আলোচনা করেন বিশিষ্ট অধ্যাপক, রাজনীতিক, সমাজসেবক, বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ্, সমাজ বিজ্ঞানীসহ বিশিষ্ট প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ।

অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. রথীন্দ্র নারায়ণ বসু। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তফসিলী ও আদিবাসী কল্যাণ বিভাগের মন্ত্রী শ্রী দীনেশ চন্দ্র ডাকুয়া এবং প্রধান বক্তা হিসাবে মূল বক্তব্য উপস্থিত করেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী শ্রী কান্তি বিশ্বাস। সভা পরিচালনা করেন সহ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপিকা ভারতী রায়। এছাড়া বক্তব্য রাখেন সেমিনারের সংচালক অধ্যাপক সন্তোষকুমার সরকার এবং অনুষ্ঠানের যুগ্ম আহ্বায়ক ডেভেলপমেণ্ট অ্যাণ্ড প্ল্যানিং অফিসার ড. মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় ও ডেপুটি রেজিষ্ট্রার নীতীশ বিশ্বাস। অনুষ্ঠানকে শুভেচ্ছা জানিয়ে ও সাফল্য কামনা

করে বার্তা পাঠান পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল অধ্যাপক সৈয়দ নরুল হাসান ও মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় জ্যোতি বসু। সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিবন্ধক ড. তপন কুমার মুখার্জী এবং রাজ্যের তফসিলী ও আদিবাসী দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী উপেন কিস্কুও সম্মানীয় সম্মানীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধনী ভাষণে ড. রথীন্দ্রনারায়ণ বসু বলেন বাল্যকাল থেকেই ড. আম্বেদকর সামাজিক লাঞ্ছনা ও অবিচারের শিকার হয়েছিলেন। নিম্নবর্ণে জন্মের 'অপরাধে' তিনি 'উচ্চবর্ণের জন্য সংরক্ষিত' সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হন। উচ্চশিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও তথাকথিত বর্ণহিন্দুরা ড. আম্বেদকরকে উপযুক্ত সম্মান জানাতে কুণ্ঠিত ছিল। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, হিন্দু সমাজের সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকারক উপাদান হল অস্পৃশ্যতা। অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাঁর সামনে অনেক বিঘ্ন এসেছিল। অধ্যাপক বসু মন্তব্য করেন, 'আম্বেদকর তাঁর সময়ের চেয়ে অনেক অগ্রবর্তী ছিলেন। যেমন থাকেন প্রত্যেক অগ্রগামী মহাপুরুষেরা।' আম্বেদকরকে তিনি ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও জাতীয় নেতা হিসেবে অভিহিত করেন।

প্রধান অতিথি মাননীয় মন্ত্রী শ্রী দীনেশচন্দ্র ডাকুয়া বলেন, জাতের পরিচয়ের জন্য আম্বেদকরকে সারাজীবন যন্ত্রণা সইতে হয়েছে। এর মধ্যেই তিনি বেড়ে উঠেছেন এবং পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য সংগ্রাম করেছেন। তাঁর সময় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন। যদিও তথাকথিত নীচু জাতের মানুষের সংগ্রামী নেতা হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিলেন তিনি। শ্রী ডাকুয়া বলেন, আম্বেদকরের কাজ শেষ হয় নি। সমাজে বর্ণপ্রথার বেড়া ভাঙ্গার শক্ত কাজ তিনি শুরু করেছিলেন। কিন্তু তা সম্ভবত ভাঙ্গতে পারেন নি। কিন্তু আঘাতে আঘাতে কিছুটা দুর্বল করেছেন। তিনি বলেন, তফসিলী জাতি-উপজাতির মানুষদের জমির অধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত করা না গেলে ; সামাজিক মর্যাদা দেওয়া যাবে না। সমগ্র দেশ ও জাতির প্রগতির জন্য এই পিছিয়ে পড়া মানুষদের এগিয়ে আনতে হবে। শ্রী ডাকুয়া বলেন, ভারতের বিশেষ পরিস্থিতিতে শ্রেণী এবং জাত পাতের বৈষম্য ভাঙ্গার লড়াই আমাদের এক যোগে করতে হবে।

আলোচনাচক্রের প্রধান বক্তা, প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী শ্রী কান্তি বিশ্বাস বলেন, আম্বেদকরের সমাজ দর্শন নিয়ে সঠিক গবেষণা হলে সমাজ উপকৃত হবে। হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করে আম্বেদকর তাঁর মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তার বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ণ না করেই অনেকে তাঁর সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করেছেন। এটা এক ধরনের অবিচার। তাই আম্বেদকর সম্পর্কে আরও পড়াশোনা দরকার, গবেষণা দরকার। আম্বেদকর ব্রাহ্মণ-বিরোধী ছিলেন না, ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী ছিলেন। শ্রীবিশ্বাস বলেন, আম্বেদকরকে সংবিধানের জনক বলে সংবিধানের যাবতীয় অসম্পূর্ণতার দায়ভার তাঁরউপর চাপিয়েদেবার চেষ্টা অন্যায়। কংগ্রেস ও গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক, কখনোই মধুর ছিল না। তিনি বলেন শ্রমিক

আন্দোলন ও সমাজতন্ত্র সম্পর্কে তাঁর মনোভাব, নেহরু সরকারের নীতি সম্পর্কে তাঁর সমালোচনা ইত্যাদি বিষয়েরও বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন দরকার।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহউপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপিকা ভারতী রায় বলেন, আম্বেদকর পিছিয়ে পড়া মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করেছেন। এই সংগ্রাম আমাদের অনুপ্রাণিত করে। নারীদের জন্য তিনিই ছিলেন অগ্রণী যোদ্ধা যিনি হিন্দুকোড বিল উত্থাপনা করেন। এবং বিল পাশ না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেন।

৩১শে মার্চ, ১৯৯২ দ্বিতীয় দিনের আলোচনাচক্র শুরু হয় বেলা ১১টায়। শতবার্ষিকী হলের গাম্ভীর্যের সঙ্গে আম্বেদকরের সুন্দর প্রতিকৃতির দ্বারা সজ্জিত এই আলোচনাচক্রে সভাপতিত্ব করেন রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদালয়ের উপাচার্য ড. পবিত্র সরকার ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য (অর্থ) ড. সুনীল কুমার লাহিড়ী। সেমিনারের বিশিষ্ট বক্তাদের মধ্যে ছিলেন ভারত-সরকারের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ড. প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, অধ্যাপক বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য পঃ বঙ্গের প্রাক্তন স্পীকার কংগ্রেস নেতা অপূর্বলাল মজুমদার, সাংবাদিক অধ্যাপক গৌতম চট্টোপাধ্যায়, বৈজ্ঞানিক ড. দীনেশচন্দ্র বিশ্বাস, সাংসদ ড. অসীম বালা, বিশিষ্ট আম্বেদকর বিশেষজ্ঞ ড. অনিলরঞ্জন বিশ্বাস, সমাজ বিজ্ঞানী, অধ্যাপক স্বপন প্রামাণিক ও বিধায়ক অধ্যাপক দেবেশ দাস। বক্তারা বি. আর. আম্বেদকরের সমাজ চিন্তা নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, অসম্পূর্ণ মূল্যায়নের ওপর ভিত্তি করে মতামত প্রকাশ করা বিজ্ঞান ভিত্তিক নয়।

অধ্যাপক বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য আম্বেদকরকে চিহ্নিত করেন নিপীড়িত মানুষের মুখপাত্র রূপে, তিনি আম্বেদকরকে পাঁচটি দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন যথা—(১) সামাজিক সংস্কার, (২) জাত-পাত, (৩) অস্পৃশ্যতা, (৪) অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ ও (৫) বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শন। তাঁর মতে, আম্বেদকরের কাছে অস্পৃশ্যতা ছিল জাতির পক্ষে সর্বাপেক্ষা বড় শত্রু। বর্ণ বৈষম্যের সংকীর্ণতা থেকেই আসে অস্পৃশ্যতা। এই প্রেক্ষাপট থেকে আম্বেদকরকে মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা আছে বলে ড. ভট্টাচার্য মন্তব্য করেন। হিন্দুত্ববাদের এই অস্পৃশ্যতার নিবারণের উপায় আম্বেদকর অনেকাংশে খুঁজে পেয়েছিলেন বৌদ্ধ-ধর্মের মধ্যে।

প্রাক্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র আম্বেদকরের সমাজ-দর্শনের চারটি দিকের কথা বলেন, যথা—জাতিভেদ বিরোধী সংগ্রাম, সংবিধান রচনা, সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা এবং বৌদ্ধ দর্শনে আকর্ষণ। গার্ডিনারকে উদ্ধৃত করে ড. চন্দ্র বলেন সারা পৃথিবীর সর্বত্র মানুষের মধ্য থেকেই বিচ্ছিন্নতার ধারণার উৎপত্তি হয়। আম্বেদকর ইতিহাসে ব্যক্তি মানুষের উপর বেশী জোর দিয়েছিলেন। সমতা, সৌভ্রাতৃত্ব ও স্বাধীনতা ভিত্তিক সমাজ স্থাপনই ছিল আম্বেদকরের জীবনের

একমাত্র স্বপ্ন। আম্বেদকর সারা ভারতে একই সামাজিক আইন প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী ছিলেন।

পঃবঃ বিধানসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ প্রদেশ কংগ্রেস সম্পাদক অপূর্বলাল মজুমদার বলেন ভারতে 6000 জাতের মধ্যে 1750 টি তফসীলি জাতি ও 1750টি আদিবাসী সম্প্রদায় আছে। তিনি বলেন, এমনকি মার্কসও বলেছেন ভারতে শ্রেণীর পরিবর্তন আছে, কিন্তু জাতের কোন পরিবর্তন নেই। আম্বেদকরের নিজের রাজ্য মহারাষ্ট্রে তাঁর নেতৃত্বে স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী জাতের শক্ত দেওয়াল ভাঙার জন্য সংগ্রাম করেন। শ্রীমজুমদার সংবাদপত্রের উদাহরণ দিয়ে দেখান যে আম্বেদকরের সংগ্রাম সত্ত্বেও. এমনকি অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল পশ্চিমবঙ্গেও জাত-পাতের কালো চিহ্ন রয়ে গিয়েছে। আম্বেদকর সার্বিক ভোটাধিকারের পরিবর্তে শুধুমাত্র মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষের ভোটের পক্ষপাতী ছিলেন। ড. মজুমদার বিভিন্ন তথ্য দিয়ে প্রমাণ করেন যে চাকুরী ও শিক্ষা ক্ষেত্রে তফসিলী ও আদিবাসী সম্প্রদায় এখনও কত পিছিয়ে !

রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. পবিত্র সরকার বলেন, জাতিভেদ প্রথা দূর না হলে 'মুক্তি' আসবে না। তাঁর মতে কোন রাজনৈতিক দলই স্বীকার করেনা যে তারা জাত প্রথায় বিশ্বাসী, কিন্তু রাজনৈতিক দল শাসিত এই ভারতবর্ষে এখন ও জাত প্রথা পূর্ণ ভাবে বিরাজ করছে। এ আত্মসমালোচনা পশ্চিমবঙ্গেরও। ভারত খ্যাত বৈজ্ঞানিক ড. দীনেশ চন্দ্র বিশ্বাস বলেন আম্বেদকরের জীবনের তিনটি দিক ছিল—দেশপ্রেম, সংবিধান রচনা ও জাতিভেদ বিরোধী সংগ্রাম। তিনি বলেন আম্বেদকরের জীবন উৎসর্গীকৃত হয়েছিল—অশিক্ষা, অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদ দূরীকরণের সংগ্রামে।

প্রবীণ আম্বেদকর বিশেষজ্ঞ ড. অনিলরঞ্জন বিশ্বাস বলেন "আম্বেদকর সারাজীবন সামাজিক অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন, ড. বিশ্বাস আশা প্রকাশ করেন যে আমাদের মধ্যে একদিন গণচেতনার সৃষ্টি হবে এবং সেদিন দেশ থেকে জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা দূর হয়ে আম্বেদকরের স্বপ্ন সফল হবে।

অস্পৃশ্য 'মাহার সম্প্রদায়'-এ জন্মগ্রহণের অপরাধে আম্বেদকরকে কী ধরনের অত্যাচার, তাঁর শৈশব থেকে, সহ্য করতে হয়, তার বিবরণ উপস্থাপন করেন কালান্তর সম্পাদক অধ্যাপক গৌতম চট্টোপাধ্যায়। জাত প্রথা সম্পর্কে গান্ধীজীর চিন্তা ভাবনার সঙ্গে আম্বেদকরের চিন্তা ভাবনার পার্থক্যও তিনি তুলে ধরেন। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় মনে করেন আজও আম্বেদকরের চিন্তাধারার যে যথেষ্ট প্রাসঙ্গিকতা আছে তার প্রমাণ বিহার ও অন্যান্য স্থানে তথা কথিত নীচু বর্ণের উপর অত্যাচার।

সাংসদ ড. অসীম বালা বলেন, আম্বেদকরের দর্শন এখনও সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছায়নি। তাঁর রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মও ছিল সমাজ দর্শনের প্রেক্ষাপটে

CENTRAL LIBRARY

রচিত। বোম্বাই-এ সূতাকল ধর্মঘটই তার প্রমাণ। নির্যাতিত মানুষের-সামাজিক মুক্তিই ছিল আম্বেদকরের প্রধান বিবেচ্য বিষয়।

সমাজ বিজ্ঞানী অধ্যাপক স্বপন প্রামানিক বলেন সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে জনগণকে তিনি প্রতিবাদের কণ্ঠ দিয়েছিলেন। সংবিধানের রচয়িতা রূপে আম্বেদকর জাতি, ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী নির্বিশেষে সকলের মধ্যে সমতা ও ন্যায়ের আলো ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন।

বিধায়ক অধ্যাপক দেবেশ দাস জাত-পাত সমস্যা বিষয়ে আলোচনা করেন। ভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলির ক্রিয়াকর্মের দৃষ্টান্তের মাধ্যমে। তিনি বলেন, দেশের বর্তমান সংকটময় মুহূর্তে আম্বেদকরের চিন্তাধারার আরও বিস্তৃত ও গভীর বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

সমাপ্তি পর্বের সভাপতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সহ-উপাচার্য (অর্থ) ড. সুনীল কুমার লাহিড়ী সভাপতির ভাষণে ব্যাখা করেন কীভাবে আম্বেদকর সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন। আম্বেদকর উপলব্ধি করেছিলেন যে মানুষের আত্মিক মুক্তির একমাত্র পথ হল নীতি ও যুক্তি।

ধন্যবাদসূচক বক্তব্যে সেমিনার পরিচালনা সমিতির অন্যতম আহ্বায়ক ডেপুটী রেজিষ্ট্রার শ্রী নীতীশ বিশ্বাস বলেন আম্বেদকর ছিলেন পিছিয়ে পড়া পদানত মানুষের নেতা, তিনি আম্বেদকরের জীবন সংগ্রাম ও চিন্তা ধারার প্রচার ও কর্মধারার প্রসারের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য—উপস্থিত মাননীয় ও বিশিষ্ট শ্রোতাদের পক্ষ থেকে আলোচনা চক্রের আয়োজক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে, এর সুষ্ঠ আয়োজন, উন্নত আলোচনা ও আন্তরিক পরিবেশের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। সেমিনার উপলক্ষ্যে যে একটি সুন্দর স্মারক ফলক তৈরী করা হয়েছিল—তা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ও আগত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের হাতে অর্পন করেন—সহ উপাচার্য (অর্থ) অধ্যাপক লাহিড়ী।

—প্রতিবেদক : চঞ্চল বিশ্বাস ও শিশির মুখার্জী

মাসিক 'পথ সংকেত' পত্রিকার গ্রাহক হোন

বছরে সডাক মাত্র—৩০ টাকা।

CENTRAL LIBRARY

SPACE DONATED BY :

A WELL WISHER

CENTRAL LIBRARY

With best Compliments from :

SUPER METAL WORKS

Manufacturers of :

H. B. Wire, Black Wire & All Size of Nails

PARESHNAGAR
SEVOKE ROAD
P.O.—SILIGURI-734401
Dist : JALPAIGURI

Office—
MAHABIRSTHAN
SILIGURI

Phone : Resi : 22139 ◻ Fac : 22127

কৃষি ও কৃষিভিত্তিক শিল্পে
দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণদাদনের অগ্রণী প্রতিষ্ঠান

ওয়েষ্ট বেঙ্গল সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ল্যাণ্ড ডেভেলপমেণ্ট ব্যাংক লিঃ

হেড অফিস ঃ ২০ডি, সেক্সপীয়র সরণী, কলিকাতা-১৭
শাখা অফিস ঃ দার্জিলিং ও পুরুলিয়া
প্রতিনিধি ব্যাংক ঃ পশ্চিম বঙ্গের জেলা ও মহকুমা স্তরের সমস্ত ল্যাণ্ড ডেভেলপমেণ্ট ব্যাংক

আঞ্চলিক অফিস ঃ বর্ধমান ও শিলিগুড়ি

চাষ করা থেকে ফসল তোলা, খামার গড়া থেকে সংরক্ষণ করা, আধুনিকীকরণ থেকে নানামুখী করা—ল্যাণ্ড ডেভেলপমেণ্ট ব্যাংক সর্বক্ষেত্রেই চাষীর সাহায্যে।

ঐকতান আম্বেদকর স্মারক সংখ্যা ◻ ক-৭

CENTRAL LIBRARY

বিধি মাছ চাষের পালনায় নিষেধ

১। সকল জলাশয়েই মাছচাষ করা চলে। মাছ চাষকে পেশারূপে গণ্য করুন।

২। জলাশয়ের আগাছা মাছ চাষে ক্ষতি করে। আগাছায় পোকারা ডিম পাড়ে।

৩। ছোট জলাশয়ে মহুয়া খোল ব্যবহার করে পোকা-মাকড় মেরে ফেলুন। ছুনো মাছ জাল দিয়ে ধরে নিন।

৪। মহুয়া খোলে বিষ আছে। বিষ কেটে গেলে সার হয়।

৫। মাছ চাষে রাসায়নিক সারও ব্যবহার করুন। একবার জৈব সার পরের বার রাসায়নিক সার, এইভাবে সার দিন। এতে মাছের খাবার ভালোভাবে তৈরী হয়।

৬। পুকুরে মাঝে মাঝে চুণ দিন। চুণও একরকম রাসায়নিক সার।

৭। ৫/৬ কাঠার ছোট পুকুরে ডিম পোনার চাষ করুন। এতে লাভ সবচেয়ে বেশী। একটা ছোট পুকুরে বর্ষায় ৪ বার ও শীতে ২ বার ডিম পোনার চাষ হয়। ডিম পোনা ছাড়ার আগে সাবান ও তেলের মিশ্রণ অবশ্যই ব্যবহার করুন।

৮। মাঝারি পুকুরে ডিম পোনা বা চারা পোনার চাষ করুন। ১ বিঘার চেয়ে ছোট পুকুর এই রকম চাষের উপযুক্ত।

৯। বড় পুকুরে মিশ্র মাছ চাষ করুন। পুকুরের তিনটে স্তরেই নির্দিষ্ট সংখ্যক মাছ যেন থাকে। দেশী ও বিদেশী মাছ চাষ করুন।

১০। সব সময় ভাল জাতের মাছ ব্যবহার করুন। পরিপূরক খাদ্য খেতে দিন।

১১। মাঝে মাঝে মাছের বাড় পরীক্ষা করুন।

১২। ছোট পুকুরে শীতে শিঙ্গি বা মাগুর মাছের চাষ করুন! এতে লাভ বেশী।

১৩। রুগ্ন মাছের চিকিৎসা করান। গবেষণা সংস্থার সাহায্য নিন।

১৪। বিক্রির উপযুক্ত হলেই মাছ বিক্রি করুন। চাষকে লাভজনক করুন। পরিশ্রমকে মর্যাদা দিন।

১। জলাশয়কে পতিত রাখবেন না। নিজের তথা দেশের ক্ষতি করবেন না।

২। আগাছা হতে দেবেন না। পোকা-মাকড় জন্মাতেও দেবেন না। অসুখ ডেকে আনবেন না।

৩। মাছ চাষের পুকুরে শাল, শোল মাছ ঢুকতে দেবেন না। চুনো মাছও রাখবেন না। চাষের ক্ষতি করবেন না।

৪। মহুয়া খোলের বিষ না কেটে গেলে পুকুরে মাছ ছাড়বেন না।

৫। পুকুরের জল ও মাটি পরীক্ষা না করিয়ে রাসায়নিক সার ব্যবহার করবেন না। পুকুরে বেশী সবুজ উদ্ভিদ-কণা হতে দেবেন না।

৬। চুণ না দিয়ে মাছের রোগের জীবাণুদের বংশ বাড়িয়ে দেবেন না।

৭। ছোট পুকুরে যত ডিম পোনা ছাড়তে চান তাদের আকারে তফাৎ রাখবেন না। এক চাষে বারে বারে ডিম পোনা এক পুকুরে ছাড়বেন না। পুকুর তৈরী না করে ডিম পোনা চাষ করবেন না। ডিম পোনাকে পরিপূরক খাবার না দিয়ে মাছের প্রাকৃতিক খাবার ধ্বংস করবেন না।

৮। ছোট পুকুরে খাবার উপযোগী মাছ করার চেষ্টা করবেন না। খরচ বাড়াবেন না।

৯। বড় পুকুরে শাল, শোল থাকা স্বাভাবিক। সেখানে ৬" বা ১৫ সে.মি. কম আকারের মাছ ছাড়বেন না। ক্ষতি ডেকে আনবেন না।

১০। দুর্বল মাছ কিনে চাষের ক্ষতি করবেন না। মাছের পরিবেশ দূষিত হতে দেবেন না।

১১। একদিনে পুকুরে বার বার জাল টানবেন না।

১২। সামান্য কারিগরি জ্ঞান না নিয়ে মাছ চাষে নামবেন না। মাছের শত্রুও মানুষ সেকথা ভুলে যাবেন না।

১৩। মাছের রোগ হতে দেবেন না। হাতুড়ে দিয়ে চিকিৎসা করাবেন না।

১৪। বাজার কেমন যাচ্ছে না দেখে মাছ বেচবেন না। বিনা পয়সায় কাউকে মাছ দেবেন না। ব্যবসার ক্ষতি করবেন না।

CENTRAL LIBRARY

With best Compliments from :

Dr. Badri Vishal Jha

BH—48, Sector II, Salt Lake

সকল প্রকার সরিষার তৈল ও খৈলের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

ক্যালকাটা অয়েল সিন্ডিকেট

১নং আদ্যশ্রাদ্ধ ঘাট, কলিকাতা-৭০০ ০০৭

With best Compliments from :

Gram : Eastsocket **Phone : 26-1265, 26-9912, 27-1042,**

Eastern Energy Technology (P) Ltd.

Engineering & Construction, Export Division
And Computer Division.

26, Chittaranjan Avenue (4th Floor), **Calcutta-12**

Regd. Office : 5 & 6, Hare Street, Calcutta-700 001

With best Compliments from :

Chhabi Bekary

P. O. Rampur ❀ P. S. Sandesh Khali
Dist : North 24 Parganas

CENTRAL LIBRARY

PRODUCE □ PRESERVE □ PROSPER

Through a net work of WAREHOUSES all over the West Bengal, the WEST BENGAL STATE WAREHOUSING CORPORATION offers services for storage and preservation of Cereals, Pulses, Jaggery, Cotton, Jute and other notified commodities like Textiles, Papers, Cement, Steel, Coal, Machineries and other Merchandises of any size or weight against the losses from Pests Rodents, Birds and vegeries of weather.

WAREHOUSE RECEIPTS issued by the West Bengal State Warehousing Corporation is a NEGOTIABLE INSTRUMENT for raising loan from the Nationalised Banks.

FOR SCIENTIFIC STORAGE please contact your nearest STATE WAREHOUSE centres or the :

West Bengal State Ware Housing Corporation

(A Govt. Undertaking)

6A, Raja Subodh Mullick Square (4th floor)
Calcutta-700 013

Phone : 26-6060 / 26-6061 / 26-6062 / 26-6033

CENTRAL LIBRARY

With best Wishes from :

D. Mukherjee

B. B. Ganguly Street, Calcutta-700012

With best Compliments of :

Prof. Kshirod Bihari Kabiraj

PRODHAN

MOHAN PUR GRAM PANCHAYET

Zafar Pur P.O. Nona-Chandan Pukur.

North 24-Parganas

CENTRAL LIBRARY

WITH BEST COMPLIMENTS FROM :

ASISH KHASNAVIS

Govt. Contractor

AGRIN (INDIA)

P.O. RAHARA, BANDIPUR
North 24-Parganas

CENTRAL LIBRARY

With best Compliments from :

GARG & Co.

H. D. LAMA ROAD, DARJEELING

Phone : 3161 / 3214

With best Compliments from :

M/s. Kanai Lal Paul

JESSORE ROAD, BONGAON

North 24-Praganas

With best Compliments from :

USHA TELEHOIST LIMITED

14, Princep Street, Calcutta-72

Phone : 27-0133, 27-2203 (5 Lines) Telex-021-4456

Works at :

P. O. Chandannagar, Budge Budge Trunk Road
Dist.—24-Parganas (South) West Bengal-743352
Phone : 611-629, 611-841, 842 and 458
Pioneers in Hydraulic Equipment
Branches at Delhi, Bombay, Bangalore and Madras

With best Compliments from :

M/s. Progressive Agency

Estd—1308 B. S **Phone : Bongaon—32**

M/s. SHYAMA PADA DAW & SONS.

General Merchant ★ Commission Agent ★ Distributors

P. O. Bongaon : 24 Parganas : West Bengal : India.

Agents : Tata Oil Mills Co. Ltd. : Reform Flour Mills (P) Ltd. : Swaika Vanaspati Product Ltd.

Distributors : B. N. Elias Co. Ltd. Lakmi Ltd. Tata Chemical Co. Ltd.

Govt. Wholesalers : Wheat & Wheat Products & Rice, Sugar.

স্থাপিত—১৯৫৬ **ডায়াল : ৫০-৮৩১০**

মানিকতলার জনপ্রিয় বস্ত্র প্রতিষ্ঠান

যমুনা বস্ত্রালয়

২৬৯, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৭০০ ০০৬

CENTRAL LIBRARY

শারদীয়া সব্যসাচী সাহিত্য পত্রিকা

প্রবন্ধ ঃ বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, জাহিরুল হাসান

গল্প ঃ রামশংকর চৌধুরী, শৈলেন চৌধুরী, সুকুমার নাথ, নরেশ মণ্ডল

কবিতা ঃ কৃষ্ণ ধর, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, প্রণব চট্টোপাধ্যায়, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, শ্যামসুন্দর দে, জিয়াদ আলি, অনির্বাণ দত্ত, পার্থ রাহা, কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়, দেবাশিস চক্রবর্তী, মুকুলেশ বিশ্বাস, অশোক মিত্র, প্রদ্যোৎ চৌধুরী, অসীম চৌধুরী আরও অনেকে।

দপ্তর ঃ ৩কে, রামকৃষ্ণ নস্কর লেন, বেলেঘাটা কলিকাত-১০

ছোটদের জন্য ২৫টি মজাদার ছড়া আর ১টি কাব্য কাহিনী সংকলন

অনির্বাণ দত্তের

মোল পাখির ঘর

প্রতি পাতায় রঙিন ছবি। ছবি এঁকেছেন কমল আইচ।

দাম-১০ টাকা। এন বি এ, সহ সব দোকানেই এখন পাওয়া যাচ্ছে।

করুণা প্রকাশনী, ১৮এ, টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

বর্ণাশ্রম তথা জাত-পাত ভেদ, হিন্দু-মুসলিম খৃষ্টান ইত্যাদি ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক ভেদ, ভাষাগত বিরোধ, বর্ণগত বা গায়ের রঙ-গত বিভেদ, জাতিগত বিরোধ তথা আগ্রাসন ও যুদ্ধ, নারী-পুরুষ বৈষম্য, আঞ্চলিকতা, অপসংস্কৃতি ইত্যাদির বিরুদ্ধে সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক মাসিক পত্রিকা—'পথ সংকেত' একটি আন্দোলন। রাজরোষ, পুরোহিত-তন্ত্রসহ হাজারো প্রতিকুলতার মধ্যে পথ-সংকেত তার সীমিত ক্ষমতা ও ক্ষুদ্র কলেবরে দীর্ঘ আঠারো বছর ধরে সত্য ও ন্যায়, যুক্তি ও সুস্থবোধ জাগাবার পক্ষে জ্ঞানের আলোকবর্তিকা জেবলে রাখার সৎ প্রচেষ্টা চালিয়ে এসেছে। একটি প্রদীপ থেকে শত প্রদীপকে জবালাবার প্রয়াসে আজও সে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আসুন একে এগিয়ে নিয়ে যেতে বিপ্লবী সেনানীর ভূমিকা পালন করি।—শতফুল বিকশিত হোক।

পথ-সংকেত প্রকাশনায় মনোরঞ্জন বড়াল সম্পাদিত

আরও যে বইগুলি পাবেন ঃ

- বৈষম্যব্যাধি ও বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম।
- ডঃ ভীমরাও আম্বেদকর ঃ কর্মজীবনের কয়েকটি দিক।
- প্রসঙ্গ ঃ তফসিলীভুক্তদের সংরক্ষণ ব্যবস্থা।

প্রাপ্তিস্থান ঃ পথ-সংকেত পত্রিকা দপ্তরে

নীলিমা বিশ্বাস

৭৭/২, লেনিন সরণী (৩য় তল) কলিকাতা-১৩

CENTRAL LIBRARY

horised Dealers at Calcutta Jadavpur : Radha Rani S
ıer, Sri Guru Bhander, Pal Electrics, Maharaj Electro
mi Stores, Gol Park : T, R. Electric Co. Dhakuria : c
:tronics, Gariahat : National Radio & Engg. Co, Ballygı
ıswares Stores, H. Acharya & Sons, Rash Behari Avei
al Sankar & Co, Rainbow, Amrita Glass Stores, Da
ɔorium, Sai Guin Emporim, Bombay Stainless Steel St
wanipur : Porcelain Stores, Behala : Sarkar Stores,
a Steel Basanalay, Krishna Balaram Basanalay, Tin
ıe, Rana, Khiddirpur : Variety Palace, Moulali : Sur
ment Corpn, Pratihar, Sealdah : Satish Ch. Biswas & S
a Stores, Chandni : Dhar Bros, N. B. K. Nag &
ekananda Road : Mayer's Electric Co, Radha Rani Basaı
ıree Trading Corpn, Shyambazar : Uma Sales Empoı
[. Road : Anindita, Salt Lake : CA Mkt, J. K. Enterprise
t Apsara, J. K. Electronics AE Mkt Sinha & Sons, Mee
-104, M. L. Roy & Co, Kankurgachi : M. L. Roy & Co.
ɔ Large Number of Dealers At Different Places of V
ıgal.

CENTRAL LIBRARY

With best Compliments of :

M/s. Episons Enterprises

(Telecommunication Engineers & Order Suppliers)

Spl. in D. P. BOX, Tag Block & 3 way Switch Board Plug

MUCHI PARA, HATPUKUR

P.O. G. I. P. COLONY

HOWRAH-21

Phone : 68-5272

SPACE DONATED BY :

MAHESH KADIA

With Best Compliments of :

Phone : 37-4364

Habicon India

Architects-Engineers & Planners

BB—49, Salt Lake, Calcutta-700 064

Space Donated by :

A well wisher

Space Donated by :

A well wisher

of Lalgola, Murshidabad

With Best Compliments from :

Shyama Prosad Jhowr

LALGOLA, MURSHIDABAD

CENTRAL LIBRARY

Space Donated by :

Nilgiri Sleeper Pvt. Ltd
ROY NILGIRI, BALASORE
ORISSA

With Best Compliments of :

M/s. Shah Investment Corpn.
CENTURY MILL
Passage Road, Worli
BOMBAY

CENTRAL LIBRARY

With Best Compliments of :

ESCORTS LIMITED

(Railway Equipment Divn.,)
Plot No. 115, Sector-24
Faridabad 121005 (Hariyana)

Manufacturers of :

Double Acting Telescopic Hydraulic Shock Absorbers for Railway Coaching Stock ★ Centre Buffer Couplers ★ Electro Pneumatic Brakes for EMU Coaches and Air Brakes for Wagons and Coaching Stock ★ Shock Absorbers for All types of Automobiles ★ Heating Elements and Industrial X-Rays for Domestic and Industrial Use ★

BRANCHES

BOMBAY CALCUTTA NEW DELHI MADRAS

With best Compliments of :

ASSOCIATED ENGINEERING STORES

Ministry of Defence Govt. & Railway Contractors
Gram : Ruberlin
Phone : Off. : 20-8754, Work : 65-6319

Factory :
15, Chattulal Missir Road, Howrah-711 107

Head Office :
20, Netaji Subhas Road, Calcutta-700 001
P. B. No. 2801.

Manufacturs of :

Rubber, Spare Parts, Driving and Swimming Equipments.

CENTRAL LIBRARY

গল্পগুচ্ছ প্রকাশনীর সদ্য প্রকাশিত বই

প্রণব চট্টোপাধ্যায়ের নির্বাচিত কবিতা

মূল্য—২২ টাকা

গল্পগুচ্ছ প্রকাশনীর উল্লেখযোগ্য আরো কয়েকটি বই

পথের ছবি / হীরালাল চক্রবর্তী—১৮ টাকা. আগুনের পাখি / বারিদবরণ চক্রবর্তী—২৫ টাকা. কিছু সে কথা আছে : কাজ আছে / কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়—১০ টাকা. প্রসঙ্গ সাহিত্য / প্রণব চট্টোপাধ্যায়—১০ টাকা. স্মরণীদের সান্নিধ্যে / নন্দগোপাল সেনগুপ্ত—১৫ টাকা. এবং বিশেষ রবীন্দ্র সংকলন □ সম্পাদনা / অরিন্দম চট্টোপাধ্যায় দাম—৫০ টাকা.

পরবর্তী প্রকাশনা : নির্বাচিত গল্প সংকলন—৪০ টাকা.
নির্বাচিত প্রবন্ধ সংকলন—২৫ টাকা. আরও ভাল গল্প চাই—২৫ টাকা.

বাংলা গল্পের সেরা কাগজ
গল্পগুচ্ছের গ্রাহক হোন
সম্পাদক—অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়

গল্পগুচ্ছ প্রকাশনী

৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট কলকাতা-৭০০ ০০৯

জনা মজুমদারের প্রথম গল্প গ্রন্থ

চেনামুখের চালচিত্র

দাম—বারো টাকা

পরিবেশক—'দি ভার্সেটাইলস্', ২ বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-১৩

গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তীর শ্রেষ্ঠ রচনা

চেনামুখের গল্প

দাম—পনেরো টাকা

প্রাপ্তিস্থান—পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন। কলকাতা-৯

মুকুলেশ বিশ্বাসের প্রথম কাব্যগ্রন্থ

যুদ্ধ প্রেম প্রতীতি

দাম—সাত টাকা

পাবেন—নবজাতক প্রকাশন ও ন্যাশনাল বুক এজেন্সীতে

ঐকতান আম্বেদকর স্মারক সংখ্যা □ ক-২১

CENTRAL LIBRARY

'কলকাতা নাগরিক সম্মেলনে'র মুখপত্র

নাগরিক কথা

পড়ুন, পড়ান ও গ্রাহক হোন

৬৬, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় রোড, কলকাতা-৯

ভারতীয় গণনাট্য সংঘের পঞ্চাশতম বর্ষে

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির নিবেদন

স্মরণীয় সংগীত সংকলন

(৬টি ক্যাসটের অ্যালবাম)

[১] জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের গান

[২] ৪০ ও ৫০-এর দশকের নির্বাচিত গান

[৩] গুরুদাস পালের গান

[৪] নিবারণ পণ্ডিতের গান

[৫] ৭০ ও ৮০-এর দশকের নির্বাচিত গান

[৬] অর্কেস্ট্রায় গণসঙ্গীত ঃ সেকাল ও একাল

গ্রাহক মূল্য ঃ এককালীন একশ পঁচিশ টাকা

গ্রাহক হবার শেষ তারিখ—২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৯২

গ্রাহক কেন্দ্র ঃ

- গণনাট্য সংঘ রাজ্য দপ্তর, ৬৬, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলকাতা-৯
- গণনাট্য সংঘ কলকাতা জেলা দপ্তর, ১৩এ, ক্রীক লেন, কলকাতা-১৪
- পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ, ১৭২, লেনিন সরণি কলকাতা-১
- পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ, ১১, বি বা দী বাগ, হেমন্ত ভবন, ত্রি-তল কলকাতা১
- আজাদ হিন্দ পাঠাগার, ১২৪, রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক রোড, গড়িয়া
- ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, ১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

CENTRAL LIBRARY

শুভেচ্ছা সহ

বুকস্

প্রযত্নে ঃ তপন মজুমদার
ডি-১১, বিবেকানন্দ সুপার মার্কেট, হিলকার্ট রোড, শিলিগুড়ি -৭৩৪৪০১

যে সব প্রকাশনার প্রতিনিধি ঃ
□ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, □ বিশ্বভারতী □ নয়া প্রকাশ,
□ শিশু সাহিত্য সংসদ, □ প্রমা, □ মিত্র ঘোষ পাবলিশার্স

শুভেচ্ছাসহ

দেওলক্ষ্মী দেবী

ক্যানিং টাউন, ক্যানিং, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

জোয়ার

শারদ ঃ ১৯৯২

বিশেষ ছোটগল্প সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হচ্ছে।

যোগাযোগ ঃ অধ্যাপক পুষ্পজিৎ রায়,
রামকৃষ্ণ পল্লী, মালদহ-৭৩২১০১

গণমন প্রকাশন

৩৩এ/১এ, হরেকৃষ্ণ শেঠ লেন, কলকাতা-৫০

□ **রঙ্গমঞ্চ স্থাপত্য** / কৌশিক সান্যাল ৭৫·০০, **গণনাট্য কথা** / সজল রায় চৌধুরী ৪০·০০, □ **ছটি বাছাই একাংক** / নিখিল দাস গোপাল দাস শিবশর্মা ২৫·০০, **ছোটদের নাটক** / শ্রীজীব গোস্বামী শুভেন্দু মাইতি কার্তিক ঘোষ বাণী দাস ২০·০০, □ **মান্যবর ভুল করছেন** / বিষ্ণু বসু

ঐকতানের বইও এখানে পাবেন।

ঐকতান আম্বেদকর স্মারক সংখ্যা □ ক-২৩

CENTRAL LIBRARY

নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘের পঞ্চাশ বছর উপলক্ষে ঐকতান প্রকাশিত

ভারতে সংগঠিত প্রগতিসংস্কৃতি আন্দোলনের অর্ধশতাব্দী পূর্তি স্মারক সংকলন

(১৯৩৬—১৯৮৬)

- **দলিল** ঃ প্রগতি লেখক সংঘের দ্বিতীয় সর্বভারতীয় (কলকাতা ১৯৩৮) সম্মেলনের প্রতিবেদন, ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্রের পূর্ণ বয়ান।
- ঐ সম্মেলনের প্রতি অভিনন্দন জানিয়ে সমকালীন লেখক শিল্পীদের উদ্দেশ্যে প্রেরিত রবীন্দ্রনাথের বাণী।
- সম্মেলনে আলোচিত শিল্প সাহিত্য নন্দনতত্ত্ব, বিষয়ক প্রবন্ধ। লিখেছেন— মুলুক্‌রাজ আনন্দ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, আবদুল আলীম, নরিন্দর নাথ, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ও বুদ্ধদেব বসু।
- **স্মৃতিচারণ ও মল্যায়ন : প্রেক্ষিত বাংলা** ঃ সরোজ মুখোপাধ্যায়, হীরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, সুধী প্রধান, অরুণ মিত্র, কনক মুখোপাধ্যায়, চিন্মোহন সেহানবীশ, নেপাল মজুমদার, অনুনয় চট্টোপাধ্যায়, শোভা সেন, রেবা রায়চৌধুরী, শান্তিময় গুহ, রথীন মৈত্র, রণেশ দাশগুপ্ত, বিশ্বজিৎ ঘোষ ও ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
- **মল্যায়ন : প্রেক্ষিত ভারত** ঃ এ, পি, বিট্‌টল ; রমেশ কুমার শর্মা, নরেশ বেদ প্রমুখ। সঙ্গে হিন্দী ও উর্দুবলয়ে প্রগতি লেখক শিল্পীদের অনন্য সংগঠন **জনবাদী লেখক সংঘের** ১৯৮১ সালে গৃহীত ইস্তেহারের বঙ্গানুবাদ।
- **পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের** উদ্যোগে আয়োজিত প্রগতি লেখক সংঘের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা চক্রের পূর্ণ বয়ান। যেখানে সংযোজিত হয়েছে ভারতের প্রগতি লেখক আন্দোলনের ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার প্রসঙ্গে এ যুগের মনীষীদের আন্তরিক উচ্চারণ।
- ফটো অফসেটে মুদ্রিত বিরল চিত্রে শোভিত এক ঐতিহাসিক সংকলন।

© দাম : মাত্র কুড়ি টাকা সম্পাদক : নীতীশ বিশ্বাস

সরাসরি যোগাযোগ : মুকুলেশ বিশ্বাস ও গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী
৪/৪, ফাল্গুনী আবাসন, সল্টলেক, কলকাতা-৯১

ক-২৪ ঃ ঐকতান আম্বেদকর স্মারক সংখ্যা

CENTPAL LIBRARY

বাংলা কবিতার মানবিক বোধোদয় থেকে সাম্প্রতিক প্রত্যয় প্রতীতি প্রসঙ্গে :

বাংলা প্রগতি কবিতার নানা প্রত্যন্ত

□ মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় □ কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত □ ক্ষুদিরাম দাস □ নেপাল মজুমদার □ শঙ্খ ঘোষ □ শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় □ ক্ষেত্র গুপ্ত □ বিমল মুখোপাধ্যায় □ প্রণব চট্টোপাধ্যায় □ রবীন্দ্র গুপ্ত □ শতদ্রু চাকী □ করুণাসিন্দু দাস

ক্রোড়পত্রে বাংলাদেশ :

□ রণেশ দাশগুপ্ত □ শামসুর রাহমান □ নুরুল হুদা □ বিশ্বজিৎ ঘোষ

কবিদের আত্মকণ্ঠস্বর :

□ অরুণ মিত্র □ মণীন্দ্র রায় □ রাম বসু □ কৃষ্ণ ধর
□ নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী □ মানস রায়চৌধুরী □ অমিতাভ দাশগুপ্ত
□ শ্যামসুন্দর দে □ ইরা সরকার

সম্পাদক—নীতীশ বিশ্বাস ও মুকুলেশ বিশ্বাস

মূল্য—ত্রিশ টাকা মাত্র।

রবীন্দ্র জন্মগৃহ জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ির সামাজিক, সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক অবদান বিষয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে আলোকপাত—

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি : ঐতিহ্য ও অবদান

মূল্য—ত্রিশ টাকা মাত্র

সম্পাদক : নীতীশ বিশ্বাস গবেষণা নির্দেশক : নেপাল মজুমদার
দ্বিতীয় সংস্করণ প্রস্তুতির পথে।

খোঁজ করুন :

ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড-এর নিম্নোক্ত কাউন্টারে :

□ ২ সূর্য সেন স্ট্রীট, কলকাতা-১২ ফোন : ৩২-৪৫৭৬
□ ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, ফোন : ৩১-১৪৩২
□ ডি. ডি./৪২, সেক্টর-১, সল্টলেক, কলকাতা-৬৪, ফোন : ৩৪-৪৫৩০/৩১৬৮
□ নাচন রোড, বেনাচিটি, দুর্গাপুর-৭১৩২১৩ ফোন : ডি জি পি-২৭৬৩
□ পার্কাস রোড, বর্ধমান ৭১৩১০১
□ আর-১৩, সুপার মার্কেট, দুর্গাচক, হলদিয়া-৭২১৬০২
□ বিবেকানন্দ সুপার মার্কেট, স্টল নং ১২ ও ১৩,
□ হিল কার্ট রোড, শিলিগুড়ি-৭৩৪৪০১। দার্জিলিং।

: নীতীশ বিশ্বাস / প্রমোদবরণ বিশ্বাস। ঐকতান গবেষণা সংসদ।
পূর্বাচল। ক্লস্টার-থ্রী। জি-২। কলকাতা-৯১। ফোন : ২১-৭২৮০

ঐকতান আন্বেদকর স্মারক সংখ্যা □ ক-২৫

CENTRAL LIBRARY

নিরক্ষরতা দূরীকরণ না খুব কঠিন, না খুব
সময় সাপেক্ষ। যা দরকার তা হোল একটু বিশ্বাস
আর প্রচেষ্টা। আপনার আশে-পাশের কোন অশিক্ষিতকে
আপন করে লেখাপড়া শেখান। এতটুকুই যাতে সে রেশন
কার্ড বানাতে শিখে যায়। ভাল খারাপের পার্থক্য
বুঝতে শেখে। যাতে সে অন্ধ বিশ্বাসের কুয়াশার বাইরে
দেখতে শেখে, ছোট সুস্থ পরিবারের মানে বুঝতে শেখে।
উন্নত জীবন যাপনের সুদৃঢ় ভিত গড়তে পারে।
ব্যাস্ কেবল আপনার হাত বাড়ানোর অপেক্ষায়।

ভাটপাড়া পৌর সাক্ষরতা সমিতি

জনস্বাস্থ্য কমিটির মুখপত্র ঃ

জনস্বাস্থ্য কথা

পড়ুন ও পড়ান

দপ্তর ঃ ৬৬, এ. পি. সি. রোড, কলিকাতা-৭০০ ০০৯

শিল্পী-সৈনিক অরুণ চৌধুরীর অপরূপ গল্প গ্রন্থ

সীমানা—দাম ২০ টাকা।

গল্পের মতোই নন্দিত-শব্দে সংগ্রামী-জীবনের চিত্র-নির্ঝর

'দিনের আলোর গভীরে'

মূল্য ঃ ৫ টাকা।

খোঁজ নিন ঃ ন্যাশনাল বুক এজেন্সী সহ বড় বড় দোকানে।

CENTRAL LIBRARY

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি

থেকে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

বিবিধবিদ্যা সংগ্রহ :

★ বাঙালীর সংস্কৃতি (২য় সংস্করণ) : সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	১৫ টাকা
★ বাঙালীর ভাষা : সুকুমার সেন ও সুভদ্রকুমার সেন	১৫ টাকা
★ বাংলা গদ্যের ইতিবৃত্ত : হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	৮ টাকা
★ কলকাতা তিন শতক (২য় মুদ্রণ) : কৃষ্ণ ধর	১২ টাকা
★ ভারতের কৃষিপ্রগতি ও গ্রামীণ সমাজ : গৌতম সরকার	৮ টাকা

জীবনীগ্রন্থমালা :

★ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : সুকুমারী ভট্টাচার্য	৫ টাকা
★ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : বিজিতকুমার দত্ত	২ টাকা
★ রাজেন্দ্রলাল মিত্র : বিজিতকুমার দত্ত	৮ টাকা
★ সুশীলকুমার দে : ভবতোষ দত্ত	৩ টাকা
★ সুকুমার : লীলা মজুমদার	১৪ টাকা
★ বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় : সরোজ দত্ত	১০ টাকা

সংকলন গ্রন্থ :

★ সুকুমার পরিক্রমা : পবিত্র সরকার সম্পাদিত	৩০ টাকা
★ প্রেমচন্দ গল্প সংগ্রহ	৪৫ টাকা
★ সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা সংগ্রহ	৫০ টাকা

মুখপত্র :

★ আকাদেমি পত্রিকা ১ : অন্নদাশঙ্কর রায় সম্পাদিত	১০ টাকা
★ আকাদেমি পত্রিকা ২ : অন্নদাশঙ্কর রায় সম্পাদিত	১০ টাকা
★ আকাদেমি পত্রিকা ৩ : অন্নদাশঙ্কর রায় সম্পাদিত	১০ টাকা
★ আকাদেমি পত্রিকা ৪ : অন্নদাশঙ্কর রায় সম্পাদিত	১০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান : আকাদেমি দপ্তর, কলকাতা তথ্য কেন্দ্র,

১/১ আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-৭০০ ০২০

ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হল কাউণ্টার, কলেজ স্কোয়ার, কল-৭০০ ০৭৩

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

দে বুক স্টোর, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

আকাদেমি গ্রন্থাগার, ১১৮ হেমচন্দ্র নস্কর রোড, বেলেঘাটা, কল-৭০০ ০১০

আই সি এ ৩৪২৭/১২

CENTRAL LIBRARY

"……ভারতের হিন্দু বৌদ্ধ জৈন মুসলমান শিখ পার্সি খৃষ্টানকে এক বিরাট চিত্তক্ষেত্রে সত্যসাধনার যজ্ঞে সমবেত করাই ভারতীয় বিদ্যায়তনের প্রধান কাজ। ছাত্রদিগকে কেবল ইংরেজি মুখস্থ করানো, অঙ্ক কষানো, সায়ান্স শেখানো নহে। লইবার জন্য অঞ্জলিকে বাঁধিতে হয়, দিবার জন্যও : দশ আঙুল ফাঁক করিয়া দেওয়াও যায় না, লওয়াও যায় না। ভারতের চিত্তকে একত্র সন্নিবিষ্ট করিলে তবে আমরা সত্যভাবে লইতেই পারিব, দিতেও পারিব।"

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই. সি. এ—৩৪২৭/৯২

CENTRAL LIBRARY

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা
মৎস্যচাষী উন্নয়ন সংস্থা

মহাশয়া/মহাশয়া

আপনি নিশ্চয় অবগত আছেন যে, এই সংস্থা দীর্ঘ ৮ বৎসর আপনাদের সেবায় নিয়োজিত। যদিও সরাসরি মৎস্যচাষী এবং জলাশয় মালিকদের সঙ্গে সম্পর্ক এই সংস্থার, কিন্তু একটু এগিয়ে চিন্তা করলে দেখা যাবে আমরা বঙ্গবাসী সকলেই এই সংস্থার সাহায্য পাচ্ছি। আমরা বাঙালী রোজ দুবেলা খাবার থালায় একটি মাছের টুকরো পেলে ভীষণ আনন্দ পাই। এই আনন্দ দানের মূলে রয়েছেন কিন্তু মৎস্যচাষী ভায়েরা ও চাষযোগ্য জলাশয় মালিকেরা। আবার তাদের চাষ সংক্রান্ত সবরকম সমস্যার সমাধানে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে এই সংস্থা। আপনি যদি মনে করেন সাহায্যের প্রয়োজন তবে আপনার বাসস্থান যে Block Office-এর অন্তর্গত সেই Office-এর **মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ আধিকারিকের** সঙ্গে যোগাযোগ করুন অথবা FFDA, Alipore-এ যোগাযোগ করুন।

এই সংস্থা আপনাকে অন্তর্দেশীয় মৎস্যচাষ প্রকল্পধীনে উন্নত এবং বৈজ্ঞানিক প্রথায় মৎস্য চাষের প্রশিক্ষণ দেবার জন্য প্রস্তুত। আপনিও এই প্রশিক্ষণ নিয়ে আপনার পুকুরে চাষ করে অধিক ফলন পেতে পারেন। প্রশিক্ষণ কালীন প্রতিদিন ১৫ টাকা হিসাবে (১৫ দিনের জন্য) ভাতা পাবেন। এখন হয়ত ভাবছেন চাষের খরচ কোথা থেকে আসবে, এটা কিন্তু চিন্তার বিষয় নয়। কারণ আপনার পুকুরে যদি ১০ কাটা বা ১৫ শতক কিংবা তার বেশী হয় তবে আপনি এই সংস্থার সব সুযোগ পাবার অধিকারী হবেন এবং বাকী টাকা সহজ সুদ সহ শোধ করতে হবে। ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে এই অনুদান পেতে পারেন। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের জন্য D. R. D. A. এর মিলিত উদ্যোগে প্রকল্প ব্যয়ের অনুদান দেওয়া হয়। বর্তমানে চারটি স্কীম চালু আছে। যার প্রথমটি বাদে আর তিনটিতেই মাটি কাটার খরচ ধরা আছে। ১ ফুট থেকে ৩ ফুট পর্যন্ত মাটি কাটা যেতে পারে। আরো বিশদ ভাবে জানতে হলে সংশ্লিষ্ট ব্লক অফিস কিংবা F. F. D. A-এর আলিপুর অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন। আপনার যদি সামান্যতম ইচ্ছা, সময় এবং সুযোগ থাকে তবে নিজের অর্থনৈতিক উন্নতির স্বার্থে এবং জাতির অত্যন্ত প্রয়োজনীয় খাদ্য যোগান ও অর্থনীতির স্বার্থে মাছ চাষ আপনার অবশ্যই করণীয়।

ধন্যবাদান্তে

শ্রীসন্তোষ কুমার চক্রবর্তী

মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা মৎস্যচাষী উন্নয়ণ সংস্থা

CENTRAL LIBRARY

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে গড়ে তুলুন দূষণমুক্ত পৃথিবী

বিভিন্ন ধরনের পরিবেশ দূষণ বর্তমান যুগে আমাদের সামনে কঠিন সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এই পরিস্থিতি কিন্তু একদিনে তৈরি হয়নি। প্রাকৃতিক নিয়মগুলিকে অগ্রাহ্য করে মানুষ আধুনিক জীবনের ক্রমবর্ধমান ও জটিল চাহিদার সামাল দিতে নানাভাবে প্রকৃতির কাজে হস্তক্ষেপ করেছে। উন্নততর জীবনযাত্রার প্রয়োজনে মাটি, জল, অরণ্য ও খনিজ সম্পদকে অবাধে মানুষ ব্যবহার করেছে, অতিব্যবহারের ফলে যে ক্ষতি তা পূরণের ব্যবস্থা না করেই। ফলশ্রুতি হিসাবে এই গ্রহে আমাদের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন।

অবাধ বৃক্ষচ্ছেদন কলকারখানার বর্জ্য-পদার্থ ঢেলে নদীর নির্মল স্রোতকে রুদ্ধ করা, যানবাহন ও কারখানা থেকে নিঃসৃত বিষাক্ত গ্যাস এবং ধোঁয়া ও কর্কশ উচ্চগ্রামের শব্দ আমাদের পরিবেশ দূষণের শিকার করে তুলেছে।

কিন্তু আমরা কি সম্ভাব্য এই বিপদ সম্বন্ধে অবহিত ?

যদি এই অবস্থা চলতে থাকে তাহলে অচিরেই পৃথিবী থেকে অরণ্য লুপ্ত হয়ে যাবে, খরা এবং বন্যার কবলে পড়বে পৃথিবী, প্রাণী ও উদ্ভিদজগতের অসংখ্য প্রজাতি চিরদিনের মত বিলুপ্ত হবে, আমাদের এই সুন্দর গ্রহের বাতাস হয়ে পড়বে নিশ্বাস নেবার অযোগ্য এবং এ সমস্তই ঘটবে আমাদের অপরিণামদর্শিতা, লোভ ও প্রাকৃতিক সম্পদের ক্রমবর্ধমান চাহিদার জন্য।

উন্নয়নমূলক কাজকর্ম আমাদের চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু তা করতে হবে প্রাকৃতিক ভারসাম্যের হানি না ঘটিয়ে নিষেধমূলক আইনের যথাযথ প্রয়োগ এবং আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে আমরা এই বিপদের মোকাবিলা করতে পারি।

পরিবেশ সংরক্ষণের কাজে ব্রতী হতে হবে আমাদের সকলকেই। প্রস্তুত হতে হবে দূষণমুক্ত পৃথিবী গড়ার উদ্দেশ্যে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের জন্য।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই, সি, এ—০৪২৭।৯২

ক-৩০ □ ঐকতান আম্বেদকর স্মারক সংখ্যা

CENTRAL LIBRARY

আপনার পারিবারিক ও ব্যক্তিগত স্বার্থে বিবাহ রেজিস্ট্রেশন প্রয়োজন

পরিবারের প্রত্যেকটি বিবাহ অবশ্যই রেজিস্ট্রী করান দরকার।
কারণ অধুনা ব্যবহারিক জীবনের প্রতিক্ষেত্রে বিবাহ প্রমাণ পত্র একান্ত প্রয়োজন।

আপনাকে বিবাহ রেজিস্ট্রেশন কিভাবে সাহায্য করতে পারে—তা দেখুন :—

(১) বর্তমান দুর্মূল্যের দিনে রেজিস্ট্রী বিবাহে খরচ অতি সামান্য।

(২) ইহা চিরাচরিত হীন পণ-প্রথা নিবারণে সাহায্য করে।

(৩) সম্পত্তি সংক্রান্ত দাবী নিষ্পত্তিকরণে বিবাহ সার্টিফিকেট এক অতি মূল্যবান দলিল।

(৪) পাশপোর্ট সংক্রান্ত ব্যাপারে ইহা বিশেষ প্রয়োজনীয়।

(৫) বহুবিবাহ এবং শিশু-বিবাহের মত প্রাচীন সামাজিক কুপ্রথা-দূরীকরণে রেজিস্ট্রী বিবাহের গুরুত্ব অপরিসীম।

(৬) রেজিস্ট্রী বিবাহ দাম্পত্যজীবনে অধিক নিরাপত্তার আশ্বাস দেয়।

এ ব্যাপারে বিশদ বিবরণের জন্য নিকটস্থ **সাবরেজিস্ট্রী অফিসে** অথবা **কলিকাতায় মহাকরণের ৫নং ব্লকের নীচ তলায়, রেজিস্ট্রার জেনারেল অফ্ বার্থস, ডেথস্ এ্যান্ড ম্যারেজেসের** অফিসে যোগাযোগ করুন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই·ঁসি· এ·—৩৪২৭/৯২

ঐকতান আম্বেদকর স্মারক সংখ্যা □ ক-৩১

CENTRAL LIBRARY

উৎসবে
বাংলার ঐতিহ্যকে
সমৃদ্ধ করুন

তন্তুশ্রী, তন্তুজ এবং **মঞ্জুষা**—

বাংলার তাঁত এবং হস্তশিল্পের এক অপরূপ সংকলন।
আর চর্মজ-র জুতোর দোকানে দেখতে পাবেন
নিপুন শিল্পের নিদর্শন—
বেছে নিন যেটি আপনার মনের মত।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই-সি-এ—৩৪২৭/৯২

CENTRAL LIBRARY

WITH BEST COMPLIMENTS FROM :

★
★ ★

Phone :: TA—276

ARUN KUMAR DHARA

ENGINEER & GOVT. CONTRACTOR

P. O. & VILL. TARAKESWAR
DIST. HOOGLY

Space donated by :

Phone : 74-0081

Paritosh Ghosh

CIVIL ENGINEERS & GOVERNMENT CONTRACTORS

117/B, Monoharpukur Road, Calcutta-26

With best Compliments from :

Haldi Ram Bhujiawala

7, Jagmohan Mullick Lane, Calcutta-7

Branch :

Braborun Road, V. I. P. Road

CENTRAL LIBRARY

With best Compliments from ;

M/s. Rabindra Medical Hall

A/2-13 Netaji Market, MALDAH

With best Compliments from :

Giridhari Enterprise

Authorised Dealer of Godrej Products, Khaitan Products, Relaxon Products, Polar Fans, Glory Fans, Cinni Fans, Sonny Fans/ Crompton Fans, Bajaj Fans and etc.

School Road, P.O.—Bangaon

North 24-Parganas

আজও বাংলার ঐতিহ্যমণ্ডিত রেশম ও মসলিন
বস্ত্র সম্ভারের এক চিরন্তন সৃষ্টি

রেশম শিল্পী

(খাদি ও গ্রামোদ্যোগ কমিশন অনুমোদিত)

পশ্চিমবঙ্গ রেশম শিল্পী সমবায় মহাসংঘ লিঃ

১২/১, হেয়ার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০১

দূরভাষ : ২৮-২৮৩৩

With best Compliments form

Resi : 92-2320

P. M. Enterprise

Electrical Engineers & Contractors

Regd. Office :

61, Surya Sen Street, Calcutta-700 009

Site Offiee :

27, Dixon Lane, Calcutta-700 014

ছোট-বড় প্লটে জমি, বাড়ি সল্টলেক লাগোয়া কৃষ্ণপুরে
কেনার জন্য যোগাযোগ করুন নীচের ঠিকানায়।

POLLEN PROPERTIES
Krishnapur (Ghosh para)
Calcutta-59
Phone : 59-1548

With best Compliments of :

LEDO TEA COMPANY LIMITED
Manufacturer of Best Quality CTC Tea

HEAD OFFICE :
3-B, Lal Bazar Street
Sir R. N. M. House
Calcutta-700 001
Phones : 20-6686, 6449

GARDEN :
Ledo Tea Estate
P. O, Ledo
Dist. Tinsukia, Assam
Phone : Ledo-31

With best Wishes :

Phone : 27-5362 (5 to 7 p.m.)

M/s. EMKAY ENTERPRISES
Electrical & Telephone Wiring, Repairing Maintenance
Servicings Intercum System Telephone Contractor
and Govt. Order Suppliers
Godown : 24, Chowringhee Road (J. N. Road)
Office : 4A, Dr. Biresh Guha St , Calcutta-17

With best compliments from :

ASSOCIATED CONTRACTORS
(Govt. Contractors & General Order Suppliers)
1st Floor, Vivekananda Super Market,
Siliguri-734401

CENTRAL LIBRARY

SPACE DONATED BY :

Tarafdar-Bhattacharjee Construction Enterprise.

BUILDERS CONTRACTORS & SUPPLIERS

Specialist in R.C.C. Tanks, Roads Bridges, Water Treatment Plants etc.

REGD: OFFICE

GAIT ROAD, KRISHNAGAR, NADIA

CONSULTANT :

Dr. S. K. BHATTACHARYYA

B. Sc, B. CE., M. E, Ph-D. M.I.E.

Branch-Office : **C/o. Ashim Biswas**

65/13. Banerjeepara Road.

Calcutta—700 041

CENTRAL LIBRARY

Space donated by :

Arambag Contractor's Associations

Arambag, Hoogly

With best Compliments from :

KANOI ESTATE Pvt. Ltd.

CALCUTTA-700 001

CENTRAL LIBRARY

With best Compliments from :

EAST INDIA PHARMACEUTICAL WORKS LIMITED

CALCUTTA-700 071

With best Compliments from :

Daga Auto Service Private Limited

Regd. Office : 7 Ashutosh Mukherjee Road, Calcutta-20

Service Stations at :

Phone : 75-1698

BHOWANIPUR

7, Ashutosh Mukherjee Road,
Calcutta-700 020

Phone : 37-8351

SALT LAKE

C—I, Saltlake, Sector-II
Calcutta-700 091

SHAMBAZAR

69, Jatindra Mohan Avenue, Calcutta-700 005
Phone : 54-3811

CENTRAL LIBRARY

SPACE DONATED BY :

Phone : JAL-308

M/s. JOY ENTERPRISE

CLASS—I CONTRACTOR OF C.P.W.D. (B & R) and P.W.D.
(R & B) GOVT. OF W.B. and ENGINEER

PANDAPARA ★ JALPAIGURI

Space donated by :

Mr. JATINDRANATH GHOSH
63A/1B, P. G. H. Road, Jadavpur
Calcutta-32

With Best Compliments from :

PREMIER HOSPITAL & RESEARCH CENTRE
86/4, Tapsia Road (South) Calcutta-700 046

Phone : Office : 40-3209, 40-2226, 40-3072, 40-0330, 47-5260
Proposed Multi Speciality Hospital in Progress.

SHAPE UP **Phone : 37-7241**

THE ONE-STOP HEALTH PARLOUR
[*OPEN TO ALL*]
Beauty Parlour, Aerobic Exercise, Yoga, Indoor Gym, Steam-Bath, Body Massage, Self Depence (For Ladies Only), Physiotherapy

Salt Lake, Calcutta—64, Block—AB-130, Sector 1

With best Compliments from :

P. N. SAMAL
Authorised Plumber—Corporation of Calcutta, Builder,
Tubewell Contractor and General Order Suppliers.
10, Meiddleton Row, Calcutta-700 071

With best Compliments from :

GANESH ELECTRIC CO.

(Mechanical, Electrical Engineers and Govt Approved Contractor)

Office : **BABUPARA, P.O.—SILIGURI**
Dist—Darjeeling (North Bengal)

With Best Compliments From :

CHARTERED ENGINEERING CORPORATION

(Govt Lincesed Electrical Contractor and General Order Suppliers)

Office : Room No—13 (1st Floor)
Vivekananda Super Market
Hillcart Road, Siliguri-734 401

মুকুলেশ বিশ্বাসের কাব্যগ্রন্থ

- যুদ্ধ প্রেম প্রতীতি
- বোধিবৃক্ষের নিচে
- কৃষ্ণচূড়া অহংকারে

পড়ুন ও সংগ্রহ করুন

CENTRAL LIBRARY

॥ শ্রীকৃতান গবেষণা সংসদ : ১৯৯২—১৯৯৩ ॥

উপদেষ্টক ও উপাচার্য—সহ-উপাচার্য : কৃষ্ণনাথ চট্টোপাধ্যায়, পবিত্র সরকার, রমেন পোদ্দার, সন্তোষ সরকার, সুনীলকুমার লাহিড়ী ☐ **গবেষক :** নিশীথরঞ্জন রায়, মহাদেব প্রসাদ সাহা, সুধী প্রধান, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। **অধ্যাপক :** অজিত কুমার ঘোষ, অরুণ মুখোপাধ্যায়, অরুণ বসু, কুমার রায় জ্যোতির্ময় ঘোষ, নিমাইচাঁদ বড়াল, নির্মল দাস, নবকুমার নন্দী, ধীরেন্দ্র দেবনাথ, প্রবীর রায়চৌধুরী, বিশ্বনাথ সেন, যশোবন্ত রায়, রবীন্দু গুপ্ত, শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, শোভন সোম, শিশিরকণা ধরচৌধুরী, সুনীল দত্ত, স্বপন প্রামানিক, সত্যব্রত রায়চৌধুরী, সন্ধ্যা মৈত্র, ক্ষুদিরাম দাস। **শিক্ষাবিদ :** অনিল বসাক, চিত্তরঞ্জন ব্যানার্জী, ভবেশ মৈত্র, মধুসূদন চ্যাটার্জী, শুভংকর চক্রবর্তী, স্মরজিৎ চক্রবর্তী। ☐ **সাংস্কৃতিক সংগঠক :** অনিল সরকার, অলোক মজুমদার, অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়, কেদার ভট্টাচার্য, ভাতোষ রায়, পল্লব সেনগুপ্ত, রণেশ দাশগুপ্ত, শিশির সেন, শ্যামসুন্দর দে, শ্যামল সেনগুপ্ত, সুনীল মজুমদার। ☐ **বিধায়ক ও সাংসদ :** অসীম বালা, দীপক চন্দ, নকুল দাস, ননী মালাকার নয়ন সরকার, বিমল মিস্ত্রী, সুদর্শন রায়চৌধুরী। ☐ **সাংবাদিক, সাহিত্যিক, সম্পাদক :** অশোক ব্যানার্জী, অরুণ মিত্র, অরুণ দাশগুপ্ত, কল্পতরু সেনগুপ্ত, কিরণশংকর সেনগুপ্ত, কৃষ্ণ ধর, জিয়াদ আলি, নৃপেন বসু, প্রণব চট্টোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন বড়াল, ক্ষীরোদ কবিরাজ। ☐ **প্রকাশনা বিশেষজ্ঞ :** জগদিন্দ্র ভৌমিক, নন্দলাল চট্টোপাধ্যায়, নৃপেন সাহা, বরুণ সরকার, বিষ্ণু মজুমদার, সুবিমল লাহিড়ী সমীর মৈত্র। ☐ **মুখ্য নির্দেশক :** নেপাল মজুমদার। ☐ **বিভাগীয় নির্দেশক :** অজয় ঘোষ, অসিতানন্দ রায়, অলোক ভৌমিক, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, ওঙ্কারসাধন অধিকারী, করুণাসিন্ধু দাস, নবনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, তাপস চট্টোপাধ্যায়, দর্শন চৌধুরী, দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাত দত্ত, পার্থপ্রতীম দেব, পিনাকী মুখার্জী, বিমল মুখোপাধ্যায়, বিষ্ণু বসু, মনোজ মিত্র, মৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্তী, রমেন্দ্র বর্মন, রামকৃষ্ণ সাহা, শিশির মুখার্জী, সত্যবতী গিরি, সন্তোষকুমার মুখার্জী, শতদ্রু চাকী, সোমনাথ চক্রবর্তী, সুদীপ্তি বন্দ্যোপাধ্যায়। ☐ **সভাপতি :** অনুনয় চট্টোপাধ্যায়। ☐ **সহ-সভাপতি :** অরুণ বিশ্বাস, অনিমা বিশ্বাস, ইন্দ্রজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণ চন্দ, কৃষ্ণা গুহ, কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়, দীপঙ্কর সেনগুপ্ত, হিরণ্ময় বিশ্বাস, নারদ চন্দ্রবিশ্বাস, পরিমল ঘোষ, পরেশ পাল, সুবোধ বিশ্বাস, ধীরেন বিশ্বাস, মণীষা রায়, মিহির দাশগুপ্ত, ডা. মৃনাল বিশ্বাস, রঞ্জিৎ বিশ্বাস, সুধাংশুবিমল দাস, পি সি রায়, মিলন গাঙ্গুলী, ডা. শান্তি রঞ্জন সরকার, শিখা দাসগুপ্ত। ☐ **পৃষ্ঠপোষক :** অলকানন্দ ভৌমিক, অমর চক্রবর্তী, অনিল মুখার্জী, উত্তম সরকার, কমল মজুমদার, কল্যাণ বসু, ক্ষীরোদ পাণ্ডে, অবিনাশ মিস্ত্রী, রাখালচন্দ্র পাল, প্রফুল্ল কুমার দে, বিজয় বণিক, বিমল বিশ্বাস, বঙ্কিম বিশ্বাস, বিনয় ভদ্র, মলিন ঘোষ, নরেন্দ্র নাথ মণ্ডল, বিকাশ পোদ্দার, অধিপ চৌধুরী, স্বপ্না দত্ত, সমরেন্দ্র জানা।

★ পদাধিকারীর ক্ষেত্রে প্রাক্তন ও বর্তমান।

CENTRAL LIBRARY

ঐকতান পরিচালন-উপসমিতি

□ **অঙ্কন ঃ** বরুণ রাণা (আহ্বায়ক) অনল বিশ্বাস, আশিস সানা, কুন্তল ভক্ত, পপি বিশ্বাস (ঝুমা), নারায়ণ বিশ্বাস, প্রমোদ বিশ্বাস (সংযোজক)।

জনসংযোগ ঃ অনিমেশ গায়েন, (আহ্বায়ক) অসিত চক্রবর্তী, ইন্দ্রজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোক রায়, কার্তিক মান্না, কুশল মৈত্র, গোপা চক্রবর্তী, মুস্তাকুর রহমান, জয়ন্ত রায় জ্যোতির্ময় সোম, ঝর্ণা বাগচী, শীতল কুমার, সুজিত সরকার, সুনীতি বিশ্বাস, সমর দাস। সংযোজক—মুকুলেশ বিশ্বাস।

□ **আর্টওয়ার্ক ঃ** নির্মাল্য নাগ (মুখ্য শিল্প নির্দেশক) অসীম বসু, অনির্বাণ দত্ত, অজিত মণ্ডল, শ্যামল চক্রবর্তী, কমল আইচ, অতনু বসু, প্রদীপ ঘোষ, সুগত সেন, তাপসী কর্মকার, সমীর দেবশর্মা (আহ্বায়ক)

□ **পাণ্ডুলিপি ঃ** নিমাই বিশ্বাস (আহবায়ক) মহীতোষ গায়েন, অনুপম ব্যানার্জী, প্রভাস বর্মন, বঙ্কিম মণ্ডল, নন্দিনী মৈত্র, শোভন মণ্ডল, সুশান্ত মজুমদার। —সংযোজক গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী।

□ **মুদ্রণ ঃ** তপন মজুমদার,(আহ্বায়ক), ব্রহ্মানন্দ মাঝি, উত্তম সামন্ত, সুব্রত বিশ্বাস, , মৌসুমী পাল, প্রদীপ দত্ত, নিপা ভট্টাচার্য, লিলিদত্ত, শচীন সরকার, তাপস পাহাড়ী, বরীন্দ্র ভট্টাচার্য, ঈশ্বর দত্ত, সংযোজক—কল্যাণ রায় ও সলিল সরকার।

□ **প্রচার ঃ** অনুপম সেন (আহ্বায়ক), শ্যামল চক্রবর্তী, সুধীর মণ্ডল, প্রতুলেশ বিশ্বাস, টোটন রায়, তাপস হালদার, সোমনাথ সিনহা, স্বপন নন্দী, সংযোজক—সপ্তর্ষি গুপ্ত পলাশ মণ্ডল।

□ **যোগাযোগ ঃ** বিশ্বভূষণ মল্লিক (আহ্বায়ক), সুচিরাম মণ্ডল, কাজল বিশ্বাস, সাজন ওঝা, ইন্দ্রজিৎ জোদ্দার, আব্দুল বাসেদ, স্বপন চট্টোপাধ্যায়, সুব্রত মণ্ডল, প্রসেনজিৎ ভট্টাচার্য, সঞ্জয় চক্রবর্তী, নির্মল সাহা, দেবজ্যোতি সোম, দেবব্রত বিশ্বাস, অপরেশ বিশ্বাস, বিপ্লব ঘোষ মিশ্র,সংযোজক—কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়।

□ **সেমিনার সভা অনুষ্ঠান ঃ** রতন পাড়ুই (আহ্বায়ক), সুচিত্রিতা ঘোষ, আবীর ভট্টাচার্য, আলোক রোহন চট্টোপাধ্যায়, ইন্দ্রাণী রায়, রুমা ঘোষ, সুরেন মুখার্জী, সুজিত দাশগুপ্ত, সংযোজক—মুকুলেশ বিশ্বাস ও জ্যোতি দত্ত।

□ **বিপণন ঃ** প্রভাত বিশ্বাস, (আহ্বায়ক) আজিজুল হক, উপেন বর্মন, তরুণ জানা, পরিতোষ বিশ্বাস, গৌতম গুহ, বসন্ত দে, মদন মণ্ডল, সুখেন বিশ্বাস, পরিতোষ সরকার, সংযোজক ঃ হিমাদ্রি বিশ্বাস, বিরাট সেন।

□ **ক্ষেত্র-সমীক্ষা ঃ** সবিতা চৌধুরী, (আহ্বায়ক) সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় গোপাল বিশ্বাস, মোজাম্মেল হক, গৌতম বিশ্বাস, তাপস দাস, তাপস বাগচী, হরষিত বিশ্বাস, শশাঙ্ক হাজরা, সংযোজক ঃ সন্দীপ বিশ্বাস।

□ **সংগঠন ঃ** মৃণাল সাউ, (আহ্বায়ক), মন্দিরা ঘোষাল, দুলাল সরকার, অলোক ভট্টাচার্য, সিদ্ধেন্দু শতপতী, রাহুল চৌধুরী, কালিপ্রসাদ ভট্টাচার্য, স্বাতী দাশগুপ্ত, সংযোজক ঃ মুকুলেশ বিশ্বাস।

□ **অর্থ ঃ** প্রমোদ বিশ্বাস, (সংযোজক) অমর ঘোষ, সমীর বিশ্বাস, (হিসাব পরীক্ষক) বীথিকা বিশ্বাস, (কোষাধ্যক্ষ) আশিস সানা, বরুণ রানা।

ঐকতান প্রতিনিধি ও আঞ্চলিক উপসমিতি

□ **আকাশবাণী ঃ** অনিল বারুরী, অমল মণ্ডল, বিনয় ঘোষ, মণীন্দ্র রায়, সৈয়দ কওসর জামাল, সুধাংশু দেবনাথ, সুবীর মণ্ডল (আহ্বায়ক)। □ **রবীন্দ্র ভারতী** □ জোড়াসাঁকো ঃ অ. সোমনাথ সিংহ, (নাটক) অ. ইন্দাণী ঘোষ (রবীন্দ্র সঙ্গীত), ড. গৌতম নাগ (সঙ্গীত), ও ইন্দ্রজিৎ বিশ্বাস কুন্তল ভক্ত নীপা ভট্টাচার্য (ছাত্রসংসদ) – বিটি রোড ঃ সন্দীপ বিশ্বাস (বয়স্ক শিক্ষা) প্রীতি দেমজুমদার, রতন বারুই (বাংলা) ও মৃগাঙ্ক ঘোষ (সংসদ)। □ **কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়** □ কলেজ স্ট্রীট ॥ জগদীশ বসাক (চীপ ষ্টোর) গিরীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (রেজিষ্ট্রাস অফিস) ইন্দুভূষণ মণ্ডল (ছাত্র সংসদ)। রবীন ভট্টাচার্য (ইউজি কাউন্সিল)। চঞ্চল বিশ্বাস (এস-সি এস-টি সেল)। বাসুদেব মোষেল (বাংলা বিভাগ), পার্থসারথি চৌধুরী (কর্মী সংসদ)। □ রাজাবাজার ঃ অ. সলিল বিশ্বাস, (ফিজিক্স) বালিগঞ্জ ঃ সান্তনু রায়চৌধুরী, (ইতিহাস) □ আলিপুর ঃ শশাঙ্কশেখর গাঙ্গুলী (অফিস) উমাদাস (এম ফিল—শিক্ষা)। □ **উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ঃ** ড. পুলিন দাস (বাংলা) দিলীপ চৌধুরী (গ্রন্থাগার)। □ **বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় ঃ** অধ্যাপক অশোক বসু (গ্রন্থাগার বিজ্ঞান)। □ **যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ঃ** কামাল উজ্জমান (উপাচার্য-দপ্তর), ও কৃষ্ণপদ মজুমদার (গ্রন্থাগার বিজ্ঞান)। □ **বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ঃ** অরুণমজুমদার (প্রকাশন বিভাগ)। জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় (দিল্লী), সুজাতা শীল (সমাজতত্ত্ব) রমেন বিশ্বাস (রাষ্ট্র বিজ্ঞান)। **ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঃ** অঞ্জলি বিশ্বাস, নারায়ণ বিশ্বাস, বিশ্বজিৎ ঘোষ। □ **কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় ঃ** অধ্যাপক দর্শন চৌধুরী, ও শতঞ্জীব রাহা (বাংলা), বিকাশ সরকার ও বিশ্বনাথ চক্রবর্তী (উদ্ভিদ বিজ্ঞান) **এল-আই-সি** দিলীপদাস ৭ নং ব্রাঞ্চ, চন্দ্র শেখর নাগ (গ্রন্থাগার)। উদয়ণ হষ্টেল □ তপন মণ্ডল, ভবতোষ মণ্ডল। **রাণীরাসমনি হষ্টেল ঃ** শম্পা বিশ্বাস, শুভ্রা চৌধুরী, মালতি বিশ্বাস বৈশালী মৃধা, চৈতালী বারুরী। **সেণ্ট ডেভিড ঃ** আশিস শানা, সুজয় সরকার। **সিধুকানু হষ্টেল ঃ** গোবিন্দ গোলদার, বিপুল মণ্ডল, সুদীপ্ত বাগচী, নির্মল বিশ্বাস। **স্টুডেণ্টস হেলথ হোম ঃ** দুর্গা দাস পাল, বিশ্বজিৎ মাইতি, কবীর মুখার্জী। □ **শিলিগুড়ি** সুভাষ বাগচী, বীরেন চন্দ, উজ্জল চৌধুরী, মানবেন্দ্র সাহা, চঞ্চল চক্রবর্তী, নমিতা ঘোষ, দিলীপ দাস, মনি ঢালি, সন্দীপ দাস। (বসুমতী) □ **বগুলা ঃ** অনুপ বিশ্বাস (ছাত্র) মুকুন্দ বিশ্বাস, বঙ্কিম কিশোর মণ্ডল। অমৃত দাস, ভবেশ বাগচী। **বেতাই কলেজ ঃ** অধ্যক্ষ মঙ্গল মৌলিক ও অনাথবন্ধু মণ্ডল (ইতিহাস) □ **বীরভূম ঃ** চন্দ্রমোহন সিংহ। **শিবপুর বি ই কলেজ** □ সুব্রত রায় (ম্যাকানিক্যাল)। **হাওড়া** □ নৃপুর বসু, পূরবী গোস্বামী, প্রমথ বিশ্বাস (আন্দুল)। □ **বারুইপুর কলেজ ঃ** অধ্যক্ষ সি-সি-মণ্ডল, সুনন্দা বিশ্বাস (ইংরেজী)।

CENTRAL LIBRARY

□ **শিবপুর দীনবন্ধু কলেজ :** অ. অরুণাভ ঘোষ (রাষ্ট্রবিজ্ঞান) □ **কৃষ্ণ নগর :** নারায়ণ বসু (জেলা তথ্য সংস্কৃতি আধিকারিক)। □ **মালদা কলেজ :** পুষ্পজিৎ রায় (সম্পাদক-জোয়ার)। □ **বালুরঘাট কলেজ :** প্রবীর চট্টোপাধ্যায়, □ **মুর্শিদাবাদ :** স্বদেশ সরকার (লালগোলা) গোলাম সারোয়ার শেখর সাহা। **বসিরহাট টাউন লাইব্রেরী :** হিমাংশু জোদ্দার। **কমার্শিয়াল একাডেমী :** অসিত হালদার □ **বেলঘরিয়া** সমীর মণ্ডল □ **বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ** (BLA) **:** গৌতম গোস্বামী। □ **বনগাঁ হেলেঞ্চা** অনুপ গোলদার □ **নেতাজীনগর কলেজ :** অ. দিলীপ বাসু রায়। **চিত্তরঞ্জন কলেজ :** সমর ঘোষ। □ **হেরম্বচন্দ্র কলেজ :** প্রদীপ দত্ত (গ্রন্থাগার)। □ **সোনারপুর কলেজ :** অধ্যক্ষ সুবোধ চৌধুরী। □ **যাদবপুর :** গোপাল মণ্ডল, শাশ্বতী দত্ত। □ **বিদ্যাসাগর কলেজ :** অ. প্রথমা মণ্ডল **:** □ **রাণীগঞ্জ :** শুভ্রা দত্ত, মনোজ দত্ত। **মেদিনীপুর** তাপস ঘোষ □ **ডি-ভি-সি** চিত্তমণ্ডল, বিশ্বজিৎ দাসঠাকুর। □ **ঠাকুর নগর :** তপন কুমার রায়, হাইস্কুল **:** রমেন অধীকারী, বালিকা বিদ্যালয় **:** হাসিবালা □ রামচন্দ্রপুর **:** নিশিকান্ত রায়। □ **মধ্যমগ্রাম** উৎপল রায় (এ পি সি বিদ্যাআয়তন)। নিউবারাক পুর **:** পি সি রায় অনুকুল বিশ্বাস। **পলতা :** তাপসকুমার বাগচী। শৈলেন দাস। সলিল চৌধুরী। **কোন্নগর**—রবীন্দ্র ভট্টাচার্য। □ **টাকি :** অসমঞ্জ ভট্টাচার্য □ **বাকুড়া :** সুনীল ঘটক। **কোচবিহার :** বিজয় দেব (রাজার হাট)। □ **কোনিং :** ডা. মনোরঞ্জন মণ্ডল। □ **নহাটা :** গৌতম সরকার। **মেডিকেল কলেজ :** কমলেশ বালা, অজয় সরকার। **বেলেঘাটা :** মনীষা বিশ্বাস। **প্রীতম** ঘোষ।

পঃ বঃ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ রাজ্য দপ্তরে □ (১৭২ লেনিন সরণি। কল-১৩) **শান্তি মুখার্জী** □ জেলা দপ্তরে (সি-৩১-এ, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা-৭) **চন্দ্রশেখর নাগ** □ উত্তর পূর্ব দপ্তরে (৬৬ এ পিসি রোড, কল—৯) **সুব্রত ব্যানার্জী**। □ উত্তর-পশ্চিম দপ্তরে (১৩ বি গোপী মোহন দত্ত লেন, কল-৩) **প্রনব মোদক**। □ **গ্রুপ থিয়েটার দপ্তর** সলিল সরকার—৬৬ আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড। **পথসংকেত দপ্তর**—নীলিমা বিশ্বাস। ৭৭/২, লেনিন সরণী (তেতলা) কল—১৩, **:** পি-সি-রায় ও নারায়ণ বিশ্বাস (প্রতি সোম বৃহস্পতি সন্ধ্যা ৬টা—৮টা)।

ছাত্র ছাত্রীরা ঐকতানের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে পত্রিকা পাবেন বিশেষ কমিশনে।

CENTRAL LIBRARY

UNIVERSITY OF KALYANI

List of University Publications

TITLE	Sole Selling Distributors	PRICE
BANGLA VIDYA CHARCHA By Dr. N. R. Sen Prof. in Bengali	M/S. JIJNASA 1/A, College Row Calcutta	Rs. 12/-
CHARJA GEETIR CHHANDA PARICHAYA By Dr. N. R. Sen, Prof. in Bengali	-do-	Rs. 16/-
BANGLA PRABANDHA SAMKALAN (Pratham Khanda) Edited By Dr. N. R. Sen, Prof. in Bengali	-do-	Rs. 25/-
MILTON'S SAMSON AGONISTES By Prabir Sircar, Reader in English	-do-	Rs. 20/-
BANGLA SAHITYE POURANIK NATAK By Dr. R. N. Banerjee, Reader in Bengali	-do-	Rs. 16/-
GAUDIYA VAISHNAV DARSANER BHUMIKA By Dr. S. S. Gangopadhyay Lecturer in Bengali	M/S. DEY BOOK STORE Shyamacharan Dey Street, Calcutta.	Rs. 12/-
THE ARTISTS AND THE CITY By Shri T. Chattopadhyay Reader in English	M/S. SARAT BOOK HOUSE Shyamacharan Dey Street, Calcutt	Rs. 10/-
ASPECTS OF HUMAN FERTILITY By Sri P. K. Chatterjee Prof. in Economics	M/S. K. P. BAGCHI & CO. B. B. Ganguli Steet Calcutta.	Rs 75/-

ঐকতান : আম্বেদকর স্মারক সংখ্যা

CENTRAL LIBRARY

With Best Compliments From :

Sree Biswanath Rice Mill

P. O.—GUSKARA

Dist—BURDOWN (W. B.)

WITH BEST COMPLIMENTS FROM :

Moongipa Roadways

119, COTTON STREET

CALCUTTA-700 007

CENTRAL LIBRARY

Important Publications of the Calcutta University

1. Hand Book of the C. U.—Rs. 15/-
2. Anchalik Bangla Bhasar Avidhan—
   Dr. Asit Kumar Bandopadhyay—Rs. 100/-
3. The Science of Sulba—Dr. B. B. Dutta—Rs. 40/-
4. Ekaler Prabanda Sanchayan—C, U.—Rs. 35/-
5. Ekaler Kabita Sanchayan—C. U.—Rs. 25/-
6. Bankim Smarak Sankha—Dr. Ujjal Kr. Majumdar—Rs. 55/
7. Sakta Padavali Amarendra Nath Ray—Rs. 35/-
8. Studies in Indian Antiquities
   —H. C. Raychaudhury—Rs. 55/
9. (The Santals Insurrection - 1855-57
   —Kali Kinkar Dutta—Rs. 20/
10. Vaishnab Padavali—(Chayan)—C. U.—Rs. 30/-
11. Agrian System of Ancient India—U. N. Ghosal—Rs. 15/-
12. Ekaler Chhota Galpa Sanchayan—C. U.—Rs. 25/-
13. Ekaler Samalochana Sanchayan—C. U.—Rs. 20/-
14. Kavi Kankan Chandi—Srikumar Banerjee—Rs. 60/-
15. Indian Feudalism—Shri Ram Saran Sarma—Rs. 35/-

For other details please get in touch with
MANAGER PUBLICATION DEPARTMENT

CALCUTTA UNIVERSITY

48, HAZRA ROAD, CALCUTTA-19

All the publications will be available at the Calcutta Universit
Sales Counter
College Street Campus, Calcutta-700 073

CENTRAL LIBRARY

AIKATAN GAVESHANA PATRA Rg. No. 44086/87(RN
(A Bengali Research Journal) Price – Rs. 15

61h Year, 3rd & 4th Issue July—December—1992

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা

গবেষণা মূলক বাংলা গ্রন্থ

● কবি মুকুন্দের অভয়ামঙ্গল—৬০·০০ সম্পাদনা ডঃ দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যা ● বাংলাভাষার ব্যাকরন ও তার ক্রমবিকাশ—৮০·০০ ডঃ নির্মল দা ● বাংলা লোকসাহিত্যে রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গ—১৩০·০০ ডঃ গৌরী ভট্টাচা ● রোমাণ্টিকতা ও বাংলাকাব্যে রোমাণ্টিক ধারার বিবর্তন—৮৫·০০ ডঃ ভান ভূষণ জানা ● বেতার নাটক রচনারীতি—৩০·০০ ডঃ সূর্য সরকার ● রবীন্দ্রনাথে দৃষ্টিতে মৃত্যু—৪০·০০ ডঃ ধীরেন্দ্র দেবনাথ ● চিত্রভাবন—৩০·০০ ডঃ শোভ সোম ● কথা ও সুর—২৫·০০ ধূর্জটী প্রসাদ মুখোপাধ্যায় ● গীতার্থ চিন্ত —৪০·০০ অধ্যাপক চক্রধর আচার্য ● পট দীপ ধ্বনি—৫০·০০ অধ্যাপক অম ঘোষ ● বিশ্ব জিজ্ঞাসা—২০·০০ ডঃ হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা (২৪শ বর্ষ) ১০·০০

Rabindra Bharati University News-Vol-1—No-1 & 2,

বিভাগীয় পত্রিকা ঃ—বাংলা—১০·০০ □ ইংরাজী—২০·০০ □ দর্শন—১০·০০ □ চিত্রাঙ্কন—১০·০০ □ অর্থনীতি—১০·০০ □ সংস্কৃত—২৫·০০.

প্রাপ্তিস্থান ঃ

বিক্রয় কেন্দ্র ঃ
মরকত কুঞ্জ
৫৬এ, বি. টি রোড
কলিকাতা-৭০০০৫০

বিক্রয় কেন্দ্র ঃ
মহর্ষি ভবন
৬/৪, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন
কলিকাতা-৭০০০০৭

Edited and Published by NITISH BISWAS, 77/2, Lenin Sarar (2nd floor) Calcutta-700 013, Printed by him from G.R.] Printers, 25, Panchanantala Road, Calcutta-48 & Ghosh Printin Works, 19 H/H, Goyabagan Street, Calcutta-700 006